মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান

কাজী মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ্

গ্রন্থকার পরিচিতি

লক্ষীপুর জেলা সদর থানা হাসন্দী কাজী বাড়ীতে ১৯১৯ সালে ১লা এপ্রিল। পিতৃ ও মাতৃবংশ প্রাচীনপন্থী আলেম ও ধর্মীয় পরিবার। পিতা মরহুম কাজী মোহাম্মদ মুসলিম ছিলেন একাধারে আলেম, ধর্মীয় শিক্ষক এবং সুফী সাধক ব্যক্তি। বাল্যকালের শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয় শুদ্ধাচার ও নীতি-নিষ্ঠতা পরিবেশে। বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বেই আরবী -ফারসি উর্দূ ভাষার মাধ্যমে জনাব সাখাওয়াতের নৈতিক জীবন শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যয়ন করে কলিকাতা ইসলামিয়া সরকারী কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে অর্থনীতি শাস্ত্রে 'ডিস্‌টিংশন' নিয়ে ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রচনা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত। কলকাতায় "ছাত্রশক্তি" নামে একটি স্বল্পকালস্থায়ী মাসিকীর সম্পাদনাও তিনি করেছেন। বিভিন্ন সরকারী পদ ছাড়া তিনি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এবং টিসিবি-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা "আনকটাডের" কনসালট্যান্টরূপেও কাজ করেন। দেশে-বিদেশে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর কর্মজীবনকালে আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক এবং শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়ন সমস্যার ওপর প্রণীত তাঁর অনেক নিবন্ধ ও গবেষণা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের শিল্প বাণিজ্যনীতি নির্ধারণী গবেষণা প্রকল্প টি-আই-পি এবং ইউএস এ-এর পক্ষে বাংলাদেশ প্রাইভেট সেক্টর উন্নয়নের ওপরও তাঁর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমল এবং যুক্তরাষ্ট্র এ তিন প্রশাসননীতির তুলনাভিত্তিক রচিত প্রশাসন সংস্কারের ওপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ১৯৫৯ সালে দৈনিক ডন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে তৎকালীন সামরিক প্রশাসনিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং পুনর্গঠিত প্রশাসননীতি প্রণয়নেও প্রতিফলিত হয়েছিল। আরো পরে ১৯৬৭ সালে জাতীয় প্রশাসনিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট-নীপা-কর্তৃক ট্রেনিং রেফারেন্স মেটেরিয়ালরূপে পুনমুদ্রণ ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল।

জনাব সাখাওয়াতউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর আন্তর্জাতিক সেবাসংস্থা লায়ন্‌স ইন্টারন্যাশনালের সদস্য, ঢাকা লায়ন্‌স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ লায়ন্‌স-এর জোন চেয়ারম্যান, ডেপুটি জেলা গভর্ণর ছিলেন।

মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান

(ব্রিটিশযুগ - পাকিস্তানযুগ - বাংলাদেশযুগ)
১৯৩২ - ১৯৯৪

কাজী মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম – ঢাকা

www.pathagar.com

মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান

কাজী মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ

প্রকাশক

ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল

জুলাই '৯৭

কভার ডিজাইন

অহিদ চৌধুরী

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণে

নিঝুম এ্যাড

আল-ফাতেহ্ শপিং সেন্টার (৩য় তলা)

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোনঃ ৬২১৭৭৬

মূল্য: ১২৫.০০

Manab Charitrer Baishister Bichitra Upakhayan

By: Kazi Md. Sakhawatullah

Published By: Munawwar Ahmad, Chairman

Bangladesh Co-operative Book Society Ltd.

Chittagong, Dhaka, Bangladesh.

Price: Tk: 125.00

$ 5.00

ISBN: 984-493-023-5

www.pathagar.com

পূর্বাভাষ

ঢাকার একটি বিদেশী মিশন। একজন আগন্তুক রিসেপ্‌সনিস্ট মহিলাকে জনৈক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রিসেপ্‌সনিস্ট জানালেন যে ঐ কর্মকর্তা বদলী হয়ে জার্মানী চলে গেছেন। আগন্তুক ফিরে যেতে উদ্যত হতেই মহিলা বললেনঃ না না, তা হয় না। আমার উপর নির্দেশ আছে কোন আগন্তুক মিশনের কোন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে সেই কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকলে আমি যেন তাঁর স্থলবর্তী অথবা পরবর্তী কর্মকর্তাকে জানাই এবং তাঁর সম্মতি ছাড়া আগন্তুককে যেন ফেরৎ যেতে না দিই।

❖❖ ❖❖ ❖❖

আমাদের দেশে বারবার ধর্ণা দিয়েও সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎলাভ দুরূহ ও দুর্লভ, আর এখানে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ব্যর্থ ফেরৎ যাওয়া অসম্ভব।

কী বিচিত্র জাতীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য! (উপাখ্যান - ২.৫)

www.pathagar.com

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

প্রকাশকের কথা

মাস কয়েক আগে, আমাদের ঢাকা শাখার ম্যানেজার তোফাজ্জল হোসেন সাহেব, আমাকে এই লেখকের "না-বলা সত্য বচন এবং না-শোনা সত্য কথন" বইটি পাঠান। কাজী মোহাম্মদ সাখাওয়াতউল্লাহ সাহেব বইটি আমাকে উপহার দেন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি'র সভাপতি সুবাদে। সমিতির জন্মলগ্নে চট্টগ্রাম কার্য্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে, বর্তমানেও সম্পৃক্ত থাকার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। এই বইটিতে তিনি উন্মোচন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যা এ পর্য্যন্ত অন্য কেউ করেন নি। পারিবারিক আনাগোনা এবং হৃদ্যতা থাকার কারণে, অকুতোভয়ে তিনি তুলে ধরেছেন মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানের দোষত্রুটি, গুণাগুণ, তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা এবং দেশবাসীর প্রতি অনাবিল ভালবাসার কথা। উপমহাদেশ এর রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীর বিশ্লেষণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সাথে আমার মতের অমিল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখনীর আবেদন আমায় বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর সাথে যোগাযোগ করি এবং এই পুস্তক "মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান" সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা জানাই।

আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, লেখক, সাংবাদিক, গুণী জ্ঞানী আছেন যাঁরা অনেক সময় নিজ স্বার্থহানি রোধকল্পে সত্য তথ্য এবং যথার্থ তত্ত্ব পরিবেশনে বিমুখ থাকেন। এঁদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার জন্য এবং সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে অব্যক্ত অলিখিত তথ্যাবলী পরিবেশনের জন্য লেখকের সদিচ্ছা পরিলক্ষিত। পাঠক সমাজ তাঁর লিখিত "না-বলা সত্য বচন এবং না-শোনা সত্য কথন" আগ্রহভরে গ্রহণ করলে, এ ধরনের বই

www.pathagar.com

আরও লিখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে এই বই "মানব চরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান"

১৯৩২ থেকে ১৯৯৪ সন পর্য্যন্ত সক্রিয় কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি মানবচরিত্র নিয়ে যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই তুলে ধরেছেন এই বইটিতে। এই বাষট্টি বৎসরে আমাদের সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে মন মানসিকতার যে রূপান্তর ঘটেছে জীবনের মূল্যবোধে, তারই চিত্র অংকন করেছেন লেখক, পাঠক সমাজের জন্য। এগুলো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে আনাগোনার ফলস্বরূপ তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি।

এই পুস্তক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। জাতির বিবেককে, এই বই, অন্তত কিছুটা হলেও নাড়া দিতে পারবে বলে আমাদের ধারণা। এই প্রয়াসে সমিতির পরিচালকবৃন্দ বিশেষ করে প্রকাশনার দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত বন্ধুবর মোহাম্মদ নূর উল্লাহ'র সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম।

৭ই জুলাই '৯৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচী পত্র

প্রথম স্তবক

ব্যক্তিচরিত্র বৈশিষ্ট্যর উপাখ্যান

	ক্রমিক উপাখ্যান	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
		মুখপত্র	
১ম পরিচ্ছেদ	১.১.১.৩	কিশোর মনে সামাজিক অনাচারের অনপনেয় স্মৃতি	
	১.৪ ক	বাল্য জীবন স্মৃতি ও আত্মচেতনা	
২য় পরিচ্ছেদ	২.৪	ব্যক্তিচরিত্রে উন্নতি-অবনতির শুভ অশুভ প্রতিফলন	
	২.৫	ব্যক্তিচরিত্র জাতীয় চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ	
	২.৬	নীতিকথা প্রচারে এবং অনুশীলনের মাঝে অসঙ্গতি	
	২.৭-২.৮	প্রশাসনের ছায়াতলেই দুর্নীতি প্রসার লাভ করে থাকে	
৩য় পরিচ্ছেদ	৩.৯-৩.১৮	রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের উচ্চস্তরে ব্যক্তিচরিত্রে বৈচিত্র্য	
৪র্থ পরিচ্ছেদ	৪.১৯-৪.২৪	আইনের ছায়াতলে বিচারের প্রহসন - দিনে বিচারক রাতে অপরাধী	
৫ম পরিচ্ছেদ	৫.২৫-৫.২৭	সরকারী চাকুরীতে ব্যক্তি প্রতিভার বিড়ম্বনা	
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	৬.২৮-৬.২৯	উচ্চপদ অধিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত আচরণই তাঁর উচ্চ মর্যাদার মাপকাঠি	
৭ম পরিচ্ছেদ	৭.৩০-৭.৩২	আদর্শ এবং বিশ্বাসে ভিন্নমত পোষণকারীর চরিত্রনিষ্ঠার স্বীকৃতি বিরল মানবিক গুণ	
৮ম পরিচ্ছেদ	৮.৩৩-৮.৩৬	চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নির্ভীক ন্যায়বিচার	

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তবক

সামাজিক ও রাজনৈতিক/প্রশাসনিক অঙ্গনে বৈচিত্র্য

	ক্রমিক উপাখ্যান	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
৯ম পরিচ্ছেদ	৯.৩৭	ইতিহাসের অলিখিত উপকরণ "শিল্পাচার্য" খেতাব ও খ্যাতির গোড়ার কথা	
	৯.৩৮	ভাষা আন্দোলনে শ্রেণীস্বার্থ এবং রাজনৈতিক কোন্দলে জাতীয় স্বার্থ হারিয়ে যাওয়ার অজানা কথা	
	৯.৩৯	ভেতো বাঙ্গালী কী করে গম খেতে অভ্যস্থ হলো?	
১০ম পরিচ্ছেদ	১০.৪০-১০.৪২	স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রশাসনে নৈতিক অবনতি	
১১শ পরিচ্ছেদ	১১.৪৩-১১.৪৪	ক্ষমতার উৎসের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আহরণের কৌশলমাত্র	
১২শ পরিচ্ছেদ		সমসাময়িক প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ আলেখ্য	
	১২.৪৫-১২.৪৭	হিতৈষী আমলাতন্ত্রে জনকল্যাণকর স্বেচ্ছাচারিতা	
	১২.৪৮	জাতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার জাতির মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে	
	১২.৪৯	আদর্শ প্রচার এবং তার অনুশীলনের মাঝে অসঙ্গতি	

www.pathagar.com

	১২.৫০	সমাজ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব
	১২.৫১	জ্ঞানের ভূবনে জ্ঞাত জ্ঞান অজ্ঞাত জ্ঞানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর
	১২.৫২	মানব সৃষ্টিধারা প্রবহমানে কন্যা সন্তানের অবদান
	১২.৫৩	অপ্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ও সামাজিক তথ্য চিত্র
	১২.৫৪	ব্ল্যাশফেমী বনাম মুরতাদ বা স্বধর্মত্যাগ

তৃতীয় স্তবক

অনধিকার চর্চা

	ক্রমিক উপাখ্যান	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	১২.৫৫	অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা	
	১২.৫৬	জাতির জনকের মৃত্যুবার্ষিকী, ছবি ঝুলানো/নামানো	
	১২.৫৭	সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সরকার পদ্ধতি- একটি পর্যালোচনা	
	১২.৫৮	নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা	
	১২.৫৯	স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন	
	১২.৬০	দক্ষ প্রশাসনের উপাদান (ACR)	
	১২.৬১	প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ প্রক্রিয়ার নমুনা চিত্র	
	১২.৬২	জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ আন্দোলন	

www.pathagar.com

মুখপত্র

আমার কর্মজীবনকালে বিভিন্ন স্তরের মানবচরিত্রে যে যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি তারই অভিজ্ঞতার কিছু বাস্তব ঘটনা নিয়ে এই বইখানি রচিত। সুতরাং আমার বহুরূপী (Varied) কর্ম পরিবেশের কিছুটা পরিচিতি দেয়া প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি। দীর্ঘ কর্মজীবন বিভিন্ন অসদৃশ (dissimilar) পরিমণ্ডলে বিভক্ত। যেমন- সাংবাদিকতা, বৃটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সরকার, আধাসরকারী ও শিল্প বাণিজ্য সংস্থা, বিদেশী সরকার, সর্বশেষে জাতিসংঘ সমেত সাতটি ভিন্ন পরিবেশে কর্মজীবনের সাথে ছাত্র জীবন ও অবসর জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা মিলিয়ে সক্রিয় কর্মজীবনের বিস্তৃতিকাল প্রায় ষাট বৎসর (১৯৩২-১৯৯৪), ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ কর্মকাল ৪৮ বৎসর। সচরাচর এমন কাটাছেঁড়া কর্মজীবন খুব বেশী দেখা যায় না।

জীবনে অনেক ঘাটের পানি খেয়েছি। কর্মজীবনে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে কখনো ধাক্কা খেয়ে জখম হয়েছি আবার পাল্টা ধাক্কা দেয়ার সুযোগ পেয়ে তা ছাড়িনি। চিত্র বিচিত্র বিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করি প্রধানতঃ সরকারী কর্মক্ষেত্রে। কাজেই চিন্তাধারায় স্বাধীনতা থাকলেও উহা কার্যেরূপায়নে স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। উপরন্তু, আমার ললাট লিখনে ছিল ঊর্ধ্বতন সহকর্মীর সাথে মতভেদ, সংঘাত ও হয়রানি; অবশ্য পরিশেষে বিজয়। কষ্টার্জিত সে বিজয় ছিল উপভোগ্য এবং গর্বের বস্তু। এমন বন্ধুর (rugged) কর্মক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে সমজদার ন্যায়নিষ্ঠ আন্তরিক উপরওয়ালাও পেয়েছিলাম। স্বদেশীয় চাকুরীক্ষেত্রেই এমন ঝটিকা সঙ্কুল পরিবেশ ছিল বেশী। বিদেশী ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র ছিল বেশ অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে অধস্তন সহকর্মীগণ হতে

www.pathagar.com

পেতাম সার্বিক আনুগত্য, সহযোগিতা ও ভালবাসা। উপরওয়ালার সাথে মত বিরোধের মূলে ছিল নীতির প্রশ্নে আমার অনমনীয়তা-প্রশাসনিক ভাষায় "অবাধ্যতা"। আর কনিষ্ঠ সহকর্মীদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের পেছনে ছিল তাঁদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায় আচরণ এবং তাঁদের কর্মনিষ্ঠার স্বীকৃতি। ললাট লিখনের পাশাপাশি আমার চরিত্রে রয়েছে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য, আত্মরক্ষাকল্পে যার কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সবাইর ন্যায় আমিও এগিয়ে পথ চলি তবে চিহ্নিত পথে বিচরণ না করে এঁকেবেঁকে একটু থমকে আশে পাশে তাকিয়ে চলি, পেছনেও তাকাই এবং ফেলে আসা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় কিছু তথ্যবস্তুও সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে থাকি এবং অজানা সত্য খুঁজি ও অব্যক্ত সত্য প্রকাশ করি। ফলে আমার দূরত্ব অতিক্রম হয় তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে। তবে আশেপাশের পরিবেশ ও মানুষকে আমার জানা হয় নিবিড়ভাবে। যাঁদের সাথে জানা শোনা হয় প্রয়োজন শেষে তাঁরা আমাকে ভুলে গেলেও আমি তাঁদের স্মরণে রাখি। কাজেই আমি অনেককে চিনি ও জানি যাঁরা পরে আমাকে স্মরণ করতে বা চিনতে পারেন না। এ ধরনের মুছে যাওয়া বা ভুলে থাকা ছোটখাটো অথচ মানবচরিত্র বুঝবার সমসায়িক পরিবেশ জানবার উপযোগী কিছু উপাখ্যান সত্যান্বেষী কৌতূহলী পাঠককে উপহার দেয়ার প্রয়াসেই আমার এ রচনা। ললাটলিখনেরও কিছু কিছু প্রতিফলন পরিলক্ষিত হবে বিবৃত উপাখ্যানের কোন কোন ঘটনায়।

বিদ্যা, জ্ঞান, গুণ, সমাজে প্রতিষ্ঠা বা পদমর্যাদার নিরিখে লেখকরূপে প্রখ্যাত ও নন্দিত লেখকগণের সাথে এক সারিতে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই। এক কথায়, সাহিত্য অঙ্গনের প্রচলিত ধারা রচনার মাধ্যমে কোন অবদান রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য কর্ম। তবে একজন সংবেদনশীল, অনুসন্ধিৎসু সচেতন পর্যবেক্ষণকারীরূপে মানবচরিত্রে যে সকল বিরল ও ব্যতিক্রম

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ও অনুধাবন করেছি তা হতে লব্ধ অভিজ্ঞতার কিছু বিচিত্র ফসল সমাজের কাছে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে রেখে যেতে চাই। শিক্ষা ও কর্মজীবনে দীর্ঘকাল সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচরণকালে বিভিন্নযুগে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সুধীমহলে আমার নেপথ্য আনাগোনা, নেতৃবৃন্দের আশেপাশে ও পেছনে থেকে মেলামেশা ও সাহচর্যকালে সংগৃহিত কিছু বিচিত্র তথ্য উপকরণ সঞ্চয় করে রেখেছি। সত্যিকার সামাজিক ইতিহাস রচনায় নির্ভেজাল অকাট্য উপাদানরূপে উহা কখনো কারো কাজে লাগতে পারে, অথবা বিবৃত ঘটনার নায়ক ব্যক্তির আসল পরিচয় আবিষ্কার করতেও কারো সহায়ক হতে পারে। রাজনীতির অঙ্গনে যাঁদের বিচরণ এবং রাজনীতিকে যাঁরা দেশের মঙ্গল এবং দেশবাসীর ভাগ্যোন্নয়নের নীতিমনে করেন তেমন পাঠকগণের মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় স্তবকের 'অনধিকার চর্চা' অধ্যায় নিবেদিত রইলো। ব্যক্তিবিশেষকে হেয় প্রতিপন্ন করার ইচ্ছে নেই, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য তুলে ধরাই ইহার মূখ্য উদ্দেশ্য।

উপাখ্যানের অধিকাংশ ঘটনা কর্মজীবনকালে অভিজ্ঞতালব্ধ হলেও কিশোর এবং ছাত্রজীবনের দু'একটি কাহিনীও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিছু কিছু রচনা সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর শিরোনাম তারকা (*) চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্ণনায় স্থান, কাল ও ব্যক্তি সম্পর্কে বাস্তব ভিত্তিক ভুলত্রুটি থাকলে সহৃদয় পাঠক তথ্য ভিত্তিক প্রমাণ জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত হবে।

পাণ্ডুলিপি পাঠ, পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা ও উৎসাহবানী ব্যক্ত করার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ডঃ আল মুতি শরফউদ্দিন, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ফজলে হাসান আবেদ (ব্র্যাক), অবসর প্রাপ্ত সচিব সিরাজউদ্দিন, বিচারপতি (প্রয়াত) আবদুর রহমান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার মহাপরিচালক শাহ নাজমুল আলম,

www.pathagar.com

খোন্দকার হাবীবুর রহমান ও পূবালী ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ইমাদ আহমদ চৌধুরী। সর্বোপরি প্রশাসনিক বিশারদ ও সাহিত্যিক কাজী ফজলুর রহমান সাহেব চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ করে ভাষার উৎকর্ষ সাধন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র সংযোজন দ্বারা গ্রন্থটির গুণগত মান সমৃদ্ধ করেছেন।

-গ্রন্থকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান

প্রথম স্তবক

ব্যক্তিচরিত্র বৈশিষ্ট্যের উপাখ্যান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১ম পরিচ্ছেদ

কিশোর মনে সামাজিক অনাচারের অনপনেয় স্মৃতি

১.১ কিশোরকাল, ১২/১৩ বৎসর বয়স। সময়কাল ১৯৩২ ইং সাল। উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্দেশ্যে জন্ম গ্রাম হতে পায়ে হেঁটে পাঁচ মাইল দূরে শহরে পৌঁছাই। তখনকার কালে পায়ে হেঁটেই পল্লী অঞ্চলে পথ অতিক্রম করতে হতো। রিকশার জন্ম হয়নি। কাঁচা রাস্তায় বাস বা অন্য কোন যানবাহন চলাচল ছিল না। শহরে পৌঁছে পথ চলার শ্রান্তি ও তৃষ্ণা নিবারণের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ পুকুরের পাকা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামি, হাতমুখ ধুই, আকণ্ঠ পানি পান করে আবার সিঁড়ি বেয়ে ঘাটের ওপরে ওঠামাত্রই কর্তব্যরত পাহারাদার (চৌকিদার) রিজার্ভ পুকুরে হাতমুখ ধোয়ার অপরাধে আমাকে পার্শ্বস্থ ইউনিয়ন বোর্ড অফিস ঘরে আটকিয়ে রাখে এবং জরিমানা স্বরূপ কিছু দক্ষিণা দিলে ছেড়ে দেবে বলে ইঙ্গিত দেয়। আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে পুকুরে নামি চৌকিদার উপস্থিত ছিল, দেখেছে। সে আমাকে পুকুরে নামতে বা হাত মুখ ধুতে নিষেধ করেনি। পল্লী গাঁয়ের বালক, রিজার্ভ পুকুরে হাত মুখ ধোয়া অপরাধ তা জানতাম না। কোন সাইনবোর্ডও দেখিনি। টাকা জরিমানা দিয়ে মুক্ত হতে অস্বীকার করে উল্টো চৌকিদারকে দায়ী করলাম যে হাত মুখ ধোয়া নিষিদ্ধ হলে আমাকে নামতে বা ধুতে বাধা দিল না কেন অথবা কোন সাইনবোর্ড নেই কেন? অপরিণত বয়স্ক গ্রাম্য বালকের এমন পাল্টা অভিযোগে সে অপ্রস্তুত হলো বটে তবে আমার ওপর তার অসন্তোষ বেড়ে গেলো। আমাকে অব্যাহতি দিল না।

www.pathagar.com

দীর্ঘ সময়কাল বন্দী থাকাকালে এক পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেব আসেন, আমাকে আবদ্ধ দেখে ও সব জেনে পাহারাদারকে তিরস্কার করেন এবং আমাকে মুক্তি দেন। তবে অপরাধ করা হতে নিবৃত্ত না করা (দায়িত্ব পালনে অবহেলা) বা অপরাধ সংগঠিত হতে দেয়ার (abetment) জন্য আমার পাল্টা বিচার দাবীতে যুগপৎ অবাক ও মুগ্ধ হন।

অন্যায় বা অপরাধ যাতে না ঘটে তার নিরোধক ব্যবস্থা না করে ঘটে যাওয়ার পর সজাগ হওয়া বা কর্তব্যজ্ঞান জাগবার এমন বিচিত্র মানব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে পরবর্তী কর্মজীবনেও। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এই বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। দূর্নীতি প্রসারে এই প্রবণতা আমোঘ সহায়ক হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। 'Prevention is better than cure' নীতি বাক্যটি মুদ্রিত ফলক রূপেই থেকে গেছে। সামাজিক ও প্রশাসনিক কার্যক্ষেত্রে তা অনুধাবন করা ও পালন করার ইচ্ছা সাধারণতঃ দেখা যায় না। এই নীতিহীনতা বা দায়িত্বহীনতা একজন পাহারাদারেই সীমাবদ্ধ নহে। শিক্ষিত ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন উচ্চস্তরেও বিরাজমান।

১.২ শহরের এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে সপ্তাহের এক নির্দিষ্ট দিনে পশু বেচাকেনার হাট বসে। দূর দূরান্ত গ্রাম অঞ্চল হতে গরু-মহিষ-ছাগল প্রভৃতি পশু আসে হাটে, বেচাকেনা হয়। হাটের মালিক/ইজারাদার প্রতিটি পশু বেচাকেনার জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি (হাসিল) আদায় করে থাকে। পশুর শ্রেণীভেদে ফি আদায়ে তারতম্য ঘটে। এই ফি বৈধ দেয়। তবে হাটের সীমানার বাইরে, গ্রামে, হাটে যাওয়ার পথেও কোন কোন সময় বেচাকেনা হয় কিন্তু তার জন্য ফি আদায়ের বিধান বা অধিকার না থাকারই কথা।

www.pathagar.com

এমনি এক পশু হাটবার দিন সহপাঠি বন্ধুদের সাথে হাটের উপকণ্ঠে প্রায় ১ মাইল দূরে একটা গরুকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া অনুষ্ঠান লক্ষ্য করি। উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেলোঃ হাটে পৌঁছাবার পূর্বেই পথিমধ্যে বেচাকেনা হয়ে গেছে। গরু হাট মালিকের জনৈক প্রতিনিধি (দালাল) ফি দাবী করে। হাটে বিক্রি হয়নি বলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ফি দিতে অস্বীকার করে, অতএব বিবাদ। আইন সম্মত কিনা জানা না থাকলেও বিবেক ও যুক্তিতে ফি দাবী বৈধ নয় মনে করে দালালকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করি, ফলে অপমানিত হই। স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হয়ে হাটে গিয়ে মালিককে জানাই এবং ফি দাবী বা আদায় বৈধ হতে পারে না বলে মত ব্যক্ত করি। একজন বালকের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে মালিক আমাকে অপদস্থ করেন। তরুণ বয়স, বিবেক পক্ক না হলেও আপোষহীন। প্রশাসনের স্থানীয় সর্বোচ্চ কর্মকর্তা সার্কেল অফিসারের গোচরিভূত করে বিচার দাবী করি। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিদ্যালয়গামী একটি বালকের এমন ধরনের সামাজিক অনাচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিকার দাবী সচরাচর ব্যতিক্রমধর্মী বলে তিনি যুগপৎ উৎসুক ও মুগ্ধ হন। মালিককে ডেকে জানিয়ে দিলেন হাটের সীমানার বাইরে অন্য যে কোন স্থানে পশু বেচাকেনার জন্য ফি আদায় অবৈধ, সুতরাং ভবিষ্যতে যেন ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের সৎসাহসের সমর্থনের পরিবর্তে দুর্ব্যবহারের জন্য তিরস্কারও করলেন। মালিক ভুল বুঝুতে পারেন, দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। একটি অনাচার বন্ধ হলো।

১.৩ একটি প্রচলিত সামাজিক অন্যায় রহিত হওয়ায় সন্তোষ লাভ করলাম। বৃটিশ শাসনামলের উক্ত রাজপুরুষের ন্যায়বিচারসুলভ চরিত্রের প্রতি আমি এবং আমার নীতিজ্ঞানের প্রতি তিনি আমরা উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। উৎসাহিত হয়ে পরবর্তী সময়কালে আরও কিছু কিছু সামাজিক আনাচার তাঁর ক্ষমতার প্রভাব মাধ্যমে নিরসনে সচেষ্ট হয়েছি। ভালকাজে

www.pathagar.com

তাঁর সাহায্য ও উপকার ভোগ করেছি। একজন ন্যায়বান রাজকর্মচারী রূপে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে ও আমার আগামী জীবনের আদর্শরূপে কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু ইঁহারই চরিত্রে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরবর্তী কোন এক সময়ে প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা আসতে পারে ভাবতে পারিনি। দীর্ঘকাল-প্রায় বিশ বৎসর-পরে কর্মজীবন কালে এই আদর্শবান কর্মকর্তার নীতিবর্জিত ও দুর্নীতিলিপ্ত আচরণের কারণে দারুন মানসিক আঘাত পাই। ততদিনে তিনি বয়সে প্রবীণ আরও উচ্চ পদে আসীন। একটা নিয়মিত নির্দিষ্ট আর্থিক পারিতোষের বিনিময়ে আমার ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর জনৈক বন্ধুকে ব্যবসায়ে অসাদোপায় অবলম্বনে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য তিনি পরামর্শ ও চাপ দেন। আদর্শবান গুরুজন জেনে যাঁকে শ্রদ্ধা করতাম তাঁর প্রস্তাবে ও এমন অধঃপাতে আমার হতাশা ও মানসিক বেদনার গভীরতা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারিনি। যাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, অবাক ঘৃণার সাথে তাঁর ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখান করে তাঁকেও অবাক করলাম। আমাদের মধুর সম্পর্ক ছেদ করলাম।

১.৪ক বাল্যজীবন স্মৃতি ও আত্মচেতনা

মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামানো এবং উহার অভিজ্ঞতার ফসল পাঠক সমাজে তুলে ধরার একটা কৈফিয়ৎ দেয়ার আবেগ অনুভব করছি।

বাল্যকালে প্রাথমিক শিক্ষা হতে উচ্চ শিক্ষালয় অবধি শিক্ষককুলের স্নেহ ভালোবাসা এবং অনুপ্রেরণা আমাকে নির্ভীক, আত্মনির্ভরশীল ও উচ্চাভিলাষী হয়ে গড়ে ওঠতে সহায়ক হয়। এসকল নমস্য কল্যাণকামী শিক্ষকদের মধ্যে লক্ষ্মীপুর স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য কয়জন ছিলেন সময়ানুক্রমে আমার পিতা স্বয়ং, উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান আরবী শিক্ষক জনাব মৌলবী আহমদ উল্লাহ, শ্রী অনুকূল চন্দ্র ঘোষ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ রায়বাহাদুর পদ্মিনী ভূষণ রায়, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ কুরুবীলা জাকারিয়া, ডঃ ইতরাত হোসেন জুবেরী পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ও জনাব আলতাফ হোসেন পরবর্তীতে দৈনিক ইংরেজী 'ডন'

www.pathagar.com

পত্রিকার সম্পাদক। মৌলবী আহমদ উল্লাহ সাহেবের অপত্যতুল্য স্নেহ ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব আমার জীবনকে ভবিষ্যতের জীবন সংগ্রামে উদ্যোগী করে তোলে।

বাল্য ও কিশোরকালে আমার সুফী ও সাধক পিতার আধ্যাত্মিক শক্তির অনেক নিদর্শন দেখে বিমূঢ় ও চমৎকৃত হতাম এবং তাঁর অনুসৃত জীবনযাত্রা ও রহস্যময় আচরণের প্রতি একটা দুর্বার অথচ দুর্বোধ্য আকর্ষণ ও কৌতূহল অনুভব করতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মত শাস্ত্রীয় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাইনি বলে রহস্যতত্ত্বের সন্ধান লাভের আশায় সারাজীবন দিশারি খুঁজে বেড়িয়েছি। আমার পিতাই ছিলেন এই নৈর্ব্যক্তিক আলোর প্রথম দিশারি। তবে আধুনিক শিক্ষাচর্চার প্রভাবে এবং পিতার মৃত্যুজনিত তাঁর সাহচর্য হারিয়ে পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ কিশোরকালেই হারিয়ে ফেলি। অবশ্য পিতা আমার অন্তরে বিশ্বাসের যে বীজ বপন করেছিলেন তা অঙ্কুরিত হতে না পারলেও চাপা পড়ে থাকলো। পিতার মৃত্যুর পরও চাপা পড়ে থাকা আত্মিক জ্ঞানের বীজ মাঝে মাঝে আমাকে দোলা দিতে থাকে এবং বিবেকের একটা তাড়নাও অনুভব করতে থাকি। কালক্রমে উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবন কালের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারা সে আলোকের হাতছানি অব্যাহত থাকে। এ সন্ধান প্রক্রিয়ায় দু একজন মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যলাভ করি যার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি রোমাঞ্চকর তবে এখানে উল্লেখ অবান্তর। তাঁরাই আমার তত্ত্বজ্ঞানের ওস্তাদ এবং গুরু।

আমার পিতৃ ও মাতৃবংশ সুফী মতবাদী রক্ষণশীল ছিল। ৭৫-৮০ বৎসর পূর্বেকার যে যুগে আমার বাল্যশিক্ষা শুরু তখন রক্ষণশীল আলেম সমাজে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার প্রতি প্রবল বিরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। এ রকম পারিবারিক পরিবেশে আমি অধুনালুপ্ত শিক্ষাক্রম মধ্য ইংরেজী ৬ষ্ঠ শ্রেণী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী রাজকুমার পালের অনুপ্রেরণা উৎসাহ পেয়ে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি, যা পারিবারিক ও সামাজিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে। পিতৃ/মাতৃ বংশের অধিকাংশজন আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার বিপেক্ষ,

www.pathagar.com

পিতারও ইচ্ছা একই রকম তবে আমার আগ্রহকে একেবারে উপেক্ষা করতে চান না। প্রধান শিক্ষক ও আমার পিতা-দুইজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও প্রাচীন সংস্কৃতবাদী ব্যক্তির মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব আরো বিস্ময়কর। রাজকুমার মহাশয় যুক্তি দেখালেন যে ছেলে বৃত্তি পেয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় উন্নতি করবে। খোদা প্রদত্ত তার মেধাকে কাজে লাগানো উচিৎ। আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষায় বয়সের কোন সীমা রেখা নেই বা বাধা নেই, আধুনিক শিক্ষা সমাপনের পরেও সে তা অর্জন করতে পারবে। কত আধুনিক শিক্ষিতজনকে অধিক বয়সে শাস্ত্রীয় শিক্ষায় গভীর জ্ঞানার্জন করতে দেখেছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পিতা তাঁর ওস্তাদ এবং আমার নানাজান-তখনকার যুগের অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন উদার চিন্তাবিদ আলেম হজরত মৌলবী ইবরাহীম সাহেবের পরামর্শ চাইলেন। নানাজান আমার কাছে জানতে চাইলেন-বংশের অধিকাংশই আরবী শিক্ষিত আলেম, ধর্মীয় শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতা, সেই বংশের সন্তান আমি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষা অর্জন করতে চাই?

উত্তরে নিবেদন করলাম: সবাই ধর্মীয় শিক্ষাদান করছেন যার আওতা ও পরিসর ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে নৈতিকপথে পরিচালনার প্রয়োজনীয়তায় তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না বা স্থান পায় না। সংসার, ধর্ম ও কর্মজীবনে মানুষকে ন্যায়নীতির পথে পরিচালনার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পাশে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। ধর্মের সাথে সাথে মানুষকে মানবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে নিজকে উপযোগী করে নিতে চাই। নানাজান সন্তুষ্ট হয়ে রায় দিলেন, "তাই হোক, সে আমাদের "ওলদ" অর্থাৎ অন্তরের গুপ্ত রহস্যের ধারক এবং চিন্তাধারার বাহক, আধুনিক শিক্ষা অর্জন করেও বংশের মূল চিন্তাধারা ও আদর্শকে তার নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ফলপ্রসূ করে সত্যিকার সুসন্তান বা "ওলদের" প্রমাণ দেবে বলে বিশ্বাস নিয়ে আশীর্বাদ করছি।"

লাইনচ্যুত হয়ে ইংরেজী বা বিজাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করেও নানাজানের বিশ্বাস ও উক্তি তাঁর এবং পিতার আশীর্বাদ আমার অন্তরে স্থায়ী শিকড় গেঁড়ে

www.pathagar.com

থাকলো। আমার অজান্তে একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঐ রহস্যময় লক্ষ্যের দিকে ঠেলে চলেছে। এই সতর্ক উপলব্ধি ও বিবেকবোধ আমার জাগতিক জীবন ধারা, কর্মক্ষেত্রের জটিলতা ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতার মাঝে পূর্বোক্ত রহস্যতত্ত্ব অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় নিজেরই অজান্তে মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্য অবলোকনে ও অনুধাবনে আকৃষ্ট এবং উহা হতে শিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এই আংশিক লক্ষ্যভ্রষ্টের প্রায়শ্চিত্ত রূপেই আমার অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল সজাগ সচেতন চিন্তাশীল পাঠকের কাছে বিচার বিবেচনার জন্য বিতরণ করলাম।

www.pathagar.com

২য় পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিচরিত্রে উন্নতি-অবনতির শুভ-অশুভ প্রতিফলন

২.৪ আমরা প্রথম স্বাধীনতা লাভ করি ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির মাধ্যমে, ৫০ বছর পূর্বে। সে স্বাধীনতা ছিল অপর আর একজন স্বার্থপর অংশীদারের নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা আসে পাকিস্তান ভেঙ্গে, সে অংশীদারের নিয়ন্ত্রণ ছিন্ন করে, ২৫ বছর পূর্বে। তাত্ত্বিক মতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক মান স্বাভাবিকভাবে পরাধীনকালের মান অপেক্ষা উন্নততর হওয়াই অভিপ্রেত ছিল। তা কি হয়েছে। ৫০ বছর পূর্বে মানবীয়গুণের মাপকাঠিতে যে মানুষ ছিল এখন সে মানুষ নেই, আমার মত অনেকেই তেমন আর নেই। দ্বিতীয়বার স্বাধীন হবার পরে ব্যক্তি মানুষের মানবিক অবক্ষয় হয়েছে আরো বেশী। তখন যেমন সৎ মানুষ ছিল এখনও আছে। পার্থক্য শুধু সংখ্যায় এবং চরিত্রের নির্মলতায়। তখন সততা ছিল জন্মগত, স্বভাবজাত ও শিক্ষাজাত। সুতরাং সৎ মানুষ ছিল সহজাত ও স্বাভাবিক, বিবেকবান। প্রতিকূলতাও ছিল তবে তা ব্যাপক ছিল না। অতএব ভাল ও সৎ থাকা সহজতর ছিল। ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক অবনতি থাকলেও সমষ্টিগতভাবে সামাজিক চরিত্রে মোটামুটি নৈতিকতা ছিল। মানব ইতিহাসের সর্বকালেই ন্যায় নীতি ও মানবতার পাশাপাশি অল্পবিস্তর অন্যায় দুর্নীতিও ছিল। তবে অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতি সামাজিক ঘৃণা ও প্রতিবাদ প্রতিরোধও ছিল। কিন্তু বর্তমান স্বাধীন পরিবেশে অন্যায় অবিচারের প্রতি সার্বিক সামাজিক ঘৃণা নেই, প্রতিবাদও নেই। প্রথম স্বাধীনতার ২৫ বছরকালে এবং দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর বর্তমানে যেটুকু সততা আছে তা

www.pathagar.com

সঙ্কুচিত, যে মুষ্টিমেয় সৎ লোক আছেন তাঁরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। ৫০ বছর পূর্বেকার মানব চরিত্র ও নির্মল আত্মার পরিবেশ ফিরে পাওয়ার ভরসা পাইনে। প্রথম দেশ বিভাগপূর্ব এবং স্বাধীনতা পূর্বকালের তুলনায় দুর্নীতির ব্যাপ্তি ও দুর্নীতিবাজ মানুষের সংখ্যা স্বাধীনতা উত্তরকালে বেড়ে গেছে, ন্যায় নীতি ও সৎ মানুষের সংখ্যা কমে গেছে এবং ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। ফলে যাকে আমি সততা ও দুর্নীতি আখ্যা দিচ্ছি কেউ কেউ তাতে আপত্তিও করতে পারেন। প্রাগুক্ত মন্তব্যের সমর্থনে একটিমাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হতে পারে মনে করি। যেমন, সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং বয়সে প্রবীণ হয়ে থাকেন সুতরাং বিবেকবান এবং অপরের আদর্শস্থানীয় হওয়াই অভিপ্রেত। অথচ স্বাধীনতার পর স্বাধীন দেশের একজন সচিব আপন বন্ধুর অনুকূলে মন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে সরকারীভাবে নির্জলা মিথ্যা নির্দেশ জারি করতে দ্বিধা করেননি। অথচ স্বাধীনতাপূর্ব পরিবেশে একজন সচিবের পক্ষে এহেন গর্হিত কাজ করা কল্পনাতীত ছিল। (উপাখ্যান ১০.৪০) ব্যক্তিচরিত্রে অবক্ষয়ের চাইতে সমষ্টিগত জাতীয় চরিত্রে অধঃপতন মারাত্মক। এই অধঃপতন আসে মূলতঃ শিক্ষার মানে অবনতি এবং শিক্ষার প্রলেপে কুশিক্ষা প্রসারের ফলে। সব চাইতে মারাত্মক হলো শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক অবনতি ও অনাচার। যে শিক্ষা মানুষের মনকে বিকশিত করে মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদা বোধের জন্ম দেয়, বিবেককে নীতি ও সততার দিকে এগিয়ে নেয় সে শিক্ষা বিবেককে বন্ধক রেখে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে দেয় না। এ সত্যকথন এখনকার পরিবেশে অবাস্তব হয়ে পড়েছে। তখন শিক্ষার্থিগণ শিক্ষালাভ করতো বিদ্যালয়ে। এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেই, তাই বিদ্যার্থীকে শিক্ষা-ব্যবসায়ী প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পরীক্ষা পাস ও সার্টিফিকেট লাভের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতির পাঠ নিতে হয়। জাতির মাঝে এখন আর শিক্ষা নেই, আছে ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট, যার অর্থ শিক্ষা নয়। ৪০-৫০ বছর পূর্বে বাল্যশিক্ষা পাঠ্য বইতে যে সকল নীতিকথা লিখিত ও শেখানো হতো এখন

www.pathagar.com

পাঠ্য বইতে তা নেই। যেমন, সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা বলা মহাপাপ, পিতামাতা, শিক্ষক ও গুরুজনে ভক্তি করিবে, পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ মনে করিবে, উহা না বলিয়া গ্রহণ করিলে চুরি গণ্য হয়ে থাকে, চৌর্যবৃত্তি মহাপাপ, ইত্যাদি। পাঠশালায় কোমলমতি বালক বালিকাগণ দল বেঁধে গানের সুরে সমস্বরে এ সকল নীতিকথা আবৃত্তি করতো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোমল অন্তরে সে বিশ্বাস দানা বেঁধে যেতো। আজকাল বাল্যশিক্ষা পাঠ্যবইতে ঐ সকল নীতিকথা নেই। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা অর্থাৎ নকল, অপরের রচনা চুরি প্রভৃতি এখনকার শিক্ষার বাহন। ৪০-৪৫ বছর পূর্বেকার পরিচিত শিক্ষা আজকাল নেই।

সমাজের এ নিম্নমুখী ধাবমান ধস ঠেকাবার মানুষ নেই। তেমন মেধা নিয়ে কেউ জন্ম নিলেও বর্তমান পঙ্কিল আবর্তে তার বিকাশের আশা নেই। এই স্রোত ঠেকাতে পারতো অধিকসংখ্যক চরিত্রবান শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজপতি এবং তেমন চরিত্রের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও জন কল্যাণমুখী নির্মল প্রশাসন। কিন্তু উল্লিখিত শিক্ষার পরিবেশে ও শিক্ষার মানে শিক্ষাপ্রাপ্ত তেমন জনপ্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ও সৎ প্রশাসনের জন্য তেমন মানুষ পাওয়া যাবে কোথায়? জনৈক বিদগ্ধ সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতালব্ধ রচনায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জনপ্রতিনিধি পরিষদ সদস্য হিসাবে অনেকে সুযোগ পেলেই কিছু বানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। তিনি নিজে এককালে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ছিলেন সুতরাং তাঁর অভিমত অকাট্য সত্য অভিজ্ঞতাপ্রসূত। সে পরিস্থিতি পরবর্তীতে আরো নোংরা এবং অনেকটা দস্তুর মাফিক হয়ে পড়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধু মানুষ সাধারণতঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন না। সুতরাং ভাল মানুষ নির্বাচিত হন না বলে সুযোগ গ্রহণে লোভ পরিহারের প্রশ্নই ওঠে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচন বিজয়ের প্রধান উপকরণ হয়ে থাকে অর্থব্যয়, স্বার্থজড়িত শ্রেণীর সমর্থন, সততা বা সমাজহিতৈষণা নয়। সৎ এবং

www.pathagar.com

সত্যিকার জনদরদী ব্যক্তির নির্বাচনে জয়লাভের নজির বিরল, অর্থ এবং বাহুবলই সম্বল। অর্থসম্বল ছাড়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া অবাস্তব বিলাসিতা। অর্থব্যয় না করে নির্বাচনে জয় হওয়া যায় না। ঘরের ভাত খেয়ে আপন পকেটের পয়সা খরচ করে বিনা পারিশ্রমিকে কেউ কোন মানবদরদী সৎ প্রার্থীর জন্য নির্বাচনী প্রচারণা করেনি, করে না। যিনি মনেপ্রাণে, কথায় ও কাজে এবং অর্থ উপার্জনে ও অর্থ ব্যয়ে সৎব্যক্তি, তিনি সাধারণতঃ নির্বাচনে প্রার্থী হন না। কারণ, হয় নির্বাচনে ব্যয়ের জন্য তাঁর প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ নেই অথবা সৎভাবে উপার্জিত অর্থ পরিজনের প্রতিপালন ও সন্তানের শিক্ষার জন্য না রেখে নির্বাচনে (অপ) ব্যয় করেন না। নির্বাচনে যান সেই ব্যক্তি যাঁর অবৈধ উপায়ে অর্জিত পর্যাপ্ত অর্থ আছে, অথবা নিজের অর্থ নেই এমন ব্যক্তি ধার কর্জ করে নির্বাচনে জয়ী হবার পর ক্ষমতা বা জনপ্রতিনিধিত্বের প্রভাব প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যয় করা অর্থ সুদে আসলে আদায় করার বাসনা রাখেন। কাজেই সুযোগ পেলে কিছু বানাবার লোভ সংবরণ করবেন কি করে? তা না হলে নির্বাচনে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেন কি 'ছদকায়ে জারিয়ার' পুণ্য লাভের আশায়? কাজেই সৎ ও স্বার্থত্যাগী জনদরদী ব্যক্তি নির্বাচনে আকৃষ্ট হওয়ার এবং নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, যদিও কিছু ব্যতিক্রম সকল সময় সকল ক্ষেত্রেই থাকে।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নিয়েই প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ঐ কয়জন প্রতিনিধির ব্যক্তিচরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে সরকারের সমষ্টিগত চরিত্র বৈশিষ্ট্যে। স্বভাবতঃ সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রম এবং প্রতিনিধিগণের ব্যক্তিগত আচরণ সমগ্র জাতীয় চরিত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার যারা পরিচালনা করেন (মন্ত্রিপরিষদ) তাঁরা মানুষ, অতএব ভুলত্রুটির ঊর্ধে নন। সুতরাং সরকারও সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত (infallible) হতে পারে না। সংসদীয় পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের ভূমিকা পরস্পর

www.pathagar.com

পরিপূরক হবার কথা। বিরোধী দল বিকল্প সরকার রূপে গঠনমূলক সমালোচনা এবং সঠিক নীতি প্রণয়নে সরকারের সহযোগিতা করবে, এটাই অভিপ্রেত। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনীতিতে নীতির চর্চা নেই এবং সততার অনুশীলন নেই। ফলে গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে ছিদ্রান্বেষণ ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চলে। এ ধরনের নীতি বিবর্জিত রাজনৈতিক তৎপরতা নস্যাৎ করার জন্য জনকল্যাণকামী সরকারের আপন স্বার্থেই গঠনমূলক সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ইচ্ছা থাকলে সরকার নিজেই আত্মসমালোচনা ও আত্মসমীক্ষা চালাতে পারেন।

মানুষ নিজেকে নিজে দেখতে পায় না, তাই আয়না ব্যবহার করে। জনগণের নির্বাচিত সরকার কাঠামোর মাঝেই আত্মসমালোচনার আয়নার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহগণ একনায়ক হলেও বদান্য, স্বেচ্ছাচারী শাসক (benevolent despot) রাজসভায় বিদূষক রাখতেন। আস্থায় ও মর্যাদায় বিদূষক রাজমন্ত্রী সমতুল্য হতেন। বাহ্যতঃ ভাঁড় (Jester) হলেও ইহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান ও নিপুণ পর্যবেক্ষক হতেন এবং চতুর রসিকতা, হেঁয়ালি ও আনন্দ পরিবেশন ছলে রাষ্ট্রীয় কার্যকরণে ভুলত্রুটি, রাজপুরুষ ও মন্ত্রিগণের কৃত অন্যায় ও নিন্দনীয় আচরণ এবং দুর্নীতি তুলে ধরতেন। বিদূষক নির্লোভ চরিত্রের মানুষ হতেন। রাজ্য পরিচালনায় অন্যায় ও দুর্নীতি নিরসনে সহায়তা করাই ছিল সে যুগের বিদূষকের ভূমিকা। আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে বিদূষকের স্থান নেই। ন্যায়পাল (Ombudsman) প্রথাকে বিদূষকের আধুনিক সংস্করণ মনে করা যেতে পারে। যদিও অম্বুধসম্যানের কার্যকরণে ভাঁড়ামি প্রয়োগের বিধি নেই। যা হোক, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে বর্তমান যুগের রাষ্ট্রনীতিতেও আপন কার্যক্রম যথাসম্ভব অভ্রান্ত রাখার উদ্দেশ্যে সেটা কেমন চলছে তা যাচাই (self evaluation) করার নীতি গ্রহণ করা যায়, নীতি না বলে একে রীতি বলা যায়। নীতিনির্ধারণী উচ্চতম স্তরে (সরকার প্রধান ও মন্ত্রিপরিষদ) নিয়মিত পড়াশোনা এবং

www.pathagar.com

সর্বস্তরের জনমত সংগ্রহ ও সংকলন করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সমীক্ষা (assessment) ও যাচাই করা যায়। পিআইডি অনুসৃত প্রচলিত পন্থা যথেষ্ট ও নিখুঁত নয়। সাময়িক পত্র পত্রিকায় সরকারের অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রম অথবা নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রতিনিয়ত আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রশংসা কিংবা বিরূপ সমালোচনা এবং অজানা তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ থাকে। যা প্রচলিত প্রশাসনিক রুটিন নিয়মে সচরাচর নীতি নির্ধারণী স্তরে বা মন্ত্রীবর্গের গোচরে পৌঁছে না। দলমত নির্বিশেষে সকল সংবাদপত্র পাঠে বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারেন। সরকারী তথ্য সরবরাহের একক চ্যানেলের ওপর নির্ভর না করে নিজেরাই সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণে নির্দেশ দিতে পারেন। যে মন্ত্রী পড়াশোনার মাধ্যমে দেশের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং আপন মন্ত্রণালয়ের করণীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন ক্ষমতা প্রয়োগকারী বা নীতিবাস্তবায়নকারী আমলাতন্ত্র সে মন্ত্রীকে সমীহ করে এবং কর্তব্য পালনে সচেতন থাকে।

যা হোক, ব্যক্ত হতাশার পরেও মানবচরিত্রে অবক্ষয় এবং দূর্নীতির বিস্তৃতি সত্ত্বেও সমাজে সুজনের সংখ্যা একেবারে শূন্যে নামেনি। যতদিন তা শূন্যের কোঠায় না পৌঁছায় ততদিন মানবসমাজ ও দেশ টিকে থাকবে, এ আশ্বাস বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন। সুতরাং সমাজের নিম্নমুখী ধস ঠেকাবার সময় এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। অবশ্য তা ঠেকাবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চরিত্রবান শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজপতির অবর্তমানে চরিত্রবান জনপ্রতিনিধিত্বশীল কল্যাণকামী সরকারই একমাত্র ভরশা। এতকাল তেমন সরকার ও পরিবেশ ছিল না। পরিবর্তিত বর্তমান পরিবেশ সে লক্ষ্যে অনুকূল। জনগণ এ সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে সুতরাং এ সরকারের পেছনে জনসমর্থন রয়েছে, শুভেচ্ছা, উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও আশা আকাঙ্খা রয়েছে। প্রস্তাবিত পন্থায় বিদ্যমান সমস্যা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে

www.pathagar.com

অর্জিত ও লব্ধ জ্ঞান নিয়ে এ সরকার নীতি ও আদর্শ দিয়ে প্রশাসন যন্ত্রকে উজ্জীবিত করার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। যার শুভ প্রভাব প্রতিফলিত হবে জনপ্রতিনিধিগণের আচরণ ও চরিত্রে, শিক্ষানীতি ও শিক্ষাঙ্গনে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয় চরিত্রের সর্বক্ষেত্রে। ফলে ধীরে ধীরে সমাজের নিম্নমুখী ধাবমান স্রোত প্রতিহত হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ব্যক্তি চরিত্র জাতীয় চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ

২.৫ কোন একটি জাতির একজন দায়িত্ববান সদস্যের চারিত্রিক আচরণ ঐ জাতির জাতীয় চরিত্রের প্রতীক এবং বিশ্বের দরবারে নেতৃস্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে মূল্যবান অবদান রাখে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখেছি। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দেশব্যাপী বন্যায় ঘরবাড়ী ও ফসলের ব্যাপক ধ্বংস এবং যাতায়াত ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়। ফলে দেশে খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সয়াবীন তৈল বন্যাত্রাণ সাহায্যরূপে অনুদান দেয়। ইহার পূর্বে সয়াবীন তৈল এতদঞ্চলে অপরিচিত ও অজানা ছিল। ভোজ্যবস্তু হিসাবে সর্বপ্রথম পরিচিত হয়। সরকারের পক্ষে অনুদান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায় আমার ওপর। সে উপলক্ষে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র মিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে পরিচয় এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও অন্যান্য স্থানে একত্রে ভ্রমণের সুযোগ হয়। পরে তা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

মেলামেশার সময়কালে আমার অলক্ষ্যেই ভদ্রলোক যে আমাকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং আমার একটা জীবনরেখা রচনা করে রাখেন তা উপলব্ধি করতে পারি দীর্ঘদিন পরে। প্রথম পরিচয় ও অন্তরঙ্গতার পরে বেশ কিছুকাল যোগাযোগ ছিল না। একবার ইচ্ছা হলো খোঁজখবর নিই। একদিন শাহবাগ হোটেলে তৎকালে অবস্থিত (বর্তমানে পি. জি. হাসপাতাল ভবন) মিশন অফিসে উপস্থিত হই। আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলে রিসেপসানিস্ট মহিলা জানালেন যে, সেই ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্বে বদলী হয়ে ষ্টুটগার্ট (জার্মানী) চলে গেছেন। 'তাহলে আমি যাই'- বলে ফিরবার উদ্যোগ নিতেই মহিলা অনুরোধের সুরে বললেন না না, তা হয় না, আপনি বসুন। আমার ওপর নির্দেশ আছে যে কোন আগন্তুক মিশনের কোন কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে সে কর্মকর্তা উপস্থিত না থাকলে আমি যেন হয় তাঁর স্থলবর্তী

www.pathagar.com

অথবা পরবর্তী কর্মকর্তাকে জানাই এবং তাঁর সম্মতি ছাড়া আগন্তুককে ফেরৎ যেতে যেন না দিই- বলে intercom এর মাধ্যমে অপর প্রান্তের আর একজন মহিলাকে বললেন যে জনৈক (আমার নাম) অমুকের (মিশনের কর্মকর্তা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তাঁকে কি বলে বিদায় করি? আমি যুগপৎ অবাক বিস্মিত এবং পুলকিত বোধ করলাম। আমাদের দেশে বারে বারে ধর্ণা দিয়ে সরকারী কর্মকর্তার সাক্ষাৎলাভ যেমন দুরূহ ও দুর্লভ, আর এখানে সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ব্যর্থ ফেরৎ যাওয়া তেমন অসম্ভব। এমন চরিত্রের জাতি বা এমন নীতিনিষ্ঠ সরকারকে আমার জানতেই হবে। তাই বসে পড়লাম অতি উৎসুক আগ্রহে।

টেলিকমের অপরপ্রান্ত হতে আমাকে সাক্ষাৎ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হলো। মিনিট কয়েক পরে আমাকে পৌঁছায়ে দিতে সংকেত আসলো। রিসেপশানিস্ট মহিলা পথ দেখিয়ে নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সেক্রেটারী অপর মহিলার হাতে আমাকে সোপর্দ করে আপন আসনে ফিরে গেলেন। এ মহিলা বোতাম চেপে কক্ষের ভিতরে মনিবকে আমার উপস্থিতি জানিয়ে দিলো। দরজা খুলে গেলো। সৌম্যমূর্তির এক প্রৌঢ়ব্যক্তি বামহাত দরজার হাতলে রেখে ডানহাত বাড়িয়ে আমার হাত আকর্ষণ করে ভিতরে নিয়ে গেলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন, আমার বসবার চেয়ারখানা দেখিয়ে টেবিল ঘুরে আপন আসন গ্রহণ করলেন। একটা সিগারেট এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে ঠিক হয়ে বসলেন। প্রথমেই জানতে চাইলেন কেন 'অমুকের' সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। জানালাম-সয়াবীন অনুদানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমকালে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয়। দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। তাই পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা নবায়ন (renew the acquaintance)। সাক্ষাতের পালা এখানেই শেষ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তা হলো না। আমি কি করি, আমার কর্তব্য কর্মসূচী কি, বন্যার মোকাবেলায় সরকারের কর্মসূচী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও কফি পানের মাধ্যমে কিছু

www.pathagar.com

সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মনে হলো তিনি যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। হঠাৎ পার্শ্বে একটা কার্ডবাক্স খুলে কতগুলো কার্ড দ্রুত শাফল করে একখানা বের করে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন,এইতো দেখতে পাচ্ছি আপনার নাম। কার্ডখানা আমার সামনে আগায়ে ধরলেন, লেখা রয়েছে আমার নাম ও পদবী। কিছু নিচে লেখা-If this gentleman ever comes to see me, please see him, আর কিছু না। নিচে তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম স্বাক্ষর। আমার বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। অনেক কথাবার্তার পর জানতে চাইলেন আমি তাঁদের মিশনের জন্য কাজ করতে সম্মত আছি কি না। প্রতি উত্তরে না ভেবেই বললাম, বিবেচনা করে দেখতে পারি। ১৫-১৬ পৃষ্ঠার একটা ফরম দিলেন, পূরণ করে পরে কোন এক সময় যেন ফেরৎ দেই। বলাবাহুল্য, কিছুদিন পরে আমি নিয়োগপত্র পেলাম। ১০-১১ বৎসরের সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে নতুন কর্মজগতে প্রবেশ করলাম। দীর্ঘ দশ বৎসর আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছি। দুনিয়ায় এই জাতির নেতৃত্ব অর্জনের গোপন রহস্য জেনে চমৎকৃত হয়েছি, আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করেছি। তাদের অর্থে ও সমর্থনে আমার দেশের অনেক ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক অবদান রাখবার সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তী পর্যায়ে দু'একটি উল্লেখ করবার ইচ্ছা রাখি।

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে অপর দুটি ছোট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই যার একটি আমাদের জাতীয় চরিত্রের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য, অপরটি উহার বিরল বৈশিষ্ট্যের নমুনা নিদর্শন রূপে বিবেচিত হতে পারে।

দুজন সম্ভ্রান্ত মহিলা–একজন প্রসূতিতন্ত্রের অবসপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, অপরজন জনৈক অবসরপ্রাপ্ত উর্ধতন কর্মকর্তার সহধর্মিনী–পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জনৈক মহাপরিচালকের সাথে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের ইচ্ছায় মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে মহাপরিচালককে অনুপস্থিত পান, যিনি নিজেই সময় নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মহিলাদ্বয় ফাঁপরে পড়লেন। দৈবক্রমে তখনই স্বয়ং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন

www.pathagar.com

ঘটে। অপেক্ষারত মহিলাদ্বয়কে চিনতে পেরে তাঁর কক্ষে ডেকে নিলেন, আগমন ও অপেক্ষার কারণ জেনে নিজেই মহাপরিচালককে তাঁর বাসভবনে যোগাযোগ করেন, মহিলাদ্বয়কে সাক্ষাৎদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং দপ্তরে হাজির হয়ে যথাকর্তব্য পালনে নির্দেশ দেন। বলাবাহুল্য, অগত্যা তিনি কর্তব্যপালন করতে বাধ্য হন। জানা গেল মহাপরিচালক সাহেব না কি সর্দিজনিত অসুস্থতার জন্য দপ্তরে আসেন নি, আসবার ইচ্ছাও ছিল না। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন কর্মকর্তাকে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে না পারা অস্বাভাবিক নয়। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পৃক্ত সবাইকে তা অবহিত করা নিয়মানুবর্তিতা ও শিষ্ঠাচার এবং কর্তাব্যক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সাক্ষাতের দিন ও সময় মহাপরিচালক নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর অপারগতাও সাক্ষাৎপ্রার্থীকে জানিয়ে দেয়া সামাজিক কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। যে কর্মকর্তা আপন দায়িত্বকর্মে উদাসীন এবং আপন পদমর্যাদার মূল্য সম্পর্কে সচেতন নন তিনিই অমন লজ্জাকর আচরণ দেখাতে পারেন। অবশ্য কিছু কিছু সুখকর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন–

একবার বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী ডাঃ এম এন হুদা গ্রন্থকারকে রীতিমাফিক সাক্ষাৎদানের দিন ও সময় দিলেন। নির্ধারিত দিন ও সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে অপ্রত্যাশিতভাবে রাষ্ট্রপতির দরবারে মন্ত্রীর ডাক পড়ে। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। পরবর্তী অন্য একদিন অথবা ঐ দিনেই সাক্ষাৎপ্রার্থীর আপত্তি না থাকলে বিলম্বে সাক্ষাৎ হতে পারে বলে তাঁকে জানিয়ে দিতে সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন এবং সাক্ষাৎপ্রার্থী অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক থাকলে চা নাস্তা আপ্যায়নে যেন তুষ্ট রাখা হয় জানিয়ে মন্ত্রী চলে গেলেন।

পরিতাপের বিষয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃত পরিস্থিতিই আমাদের দেশে সরকারী মহলে নিয়মানুবর্তিতার সচরাচর দৃশ্য আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঘটনা উহার বিরল ব্যতিক্রম। ইহা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের বিবেক, চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও আপন পদমর্যাদার সচেতনতার ওপর।

www.pathagar.com

নীতিকথা প্রচারে ও অনুশীলনে অসঙ্গতি

২.৬ বৃটিশ ভারত বিভাগপূর্ব বৎসরগুলোতে পাকিস্তান দাবী আন্দোলনকালে কলিকাতার দৈনিক আজাদ পত্রিকা ছিল মুসলিম রাজনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতির মুখপত্র। পত্রিকাটির স্বত্ত্বাধিকারী সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আকরাম খান। তবে সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত সর্বজনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবর রহমান খান, মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রমূখ সাহিত্যিক সাংবাদিকগণই প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি সম্পাদনা ও পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করতেন। তৎকালীন সাহিত্য সাংবাদিক পরিমণ্ডলে এঁরা বুলবুল সম্পাদক হাবীবউল্লাহ বাহার, আবুল মনসুর আহমদ, সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দিন, কবি মোজাম্মেল হক সাহেবানদের সাথে একগোষ্ঠিভুক্ত কনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তাঁদের অনেকেই মুসলিম সামাজিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু নিয়েও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, প্রবন্ধ রচনা করতেন এবং আজাদে প্রকাশ করতেন। পড়ে আমি মুগ্ধ হতাম ও তাঁদের শ্রদ্ধা করতাম। জনাব নাসিরউদ্দিন ছাড়া অপর সকলের সাথে আমার অন্তরঙ্গ শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক ছিল।

রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যে উভয় গ্রুপের সকলের সমদৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণায় মতপার্থক্য ছিল। আজাদ পত্রিকার আবুল কালাম শামসউদ্দিন গয়রহের কাহারো কাহারো রচনায় ব্যক্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতামত এবং ব্যক্তিগত আচরণের মাঝে অসঙ্গতি ও পরিপন্থী কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আমি দারুণ মনঃপীড়া পেতাম। কারণ, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনায় এঁদের অবদানে মুগ্ধ হতাম, অনুসরণ এবং শ্রদ্ধা করতাম। যাঁকে শ্রদ্ধা করা হয় তাঁর মাঝে অনভিপ্রেত আচরণ দেখে ঘৃণা করা যায় না অথচ সমর্থনও করা যায় না, ফলে মনোবেদনা গভীর হয়। আমার অবস্থা তাই। ব্যাপারটি খুলে বলা যাক।

www.pathagar.com

আজাদের সম্পাদকীয় বিভাগের উল্লিখিত তিনজনের কেউই আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করতেন না, নামাজ রোজা করতেন না, পোষাক পরিচ্ছদও ইসলামিক ভাবাপন্ন ছিল না, সকলেই ধুতি পরতেন। আপত্তি করার কিছু ছিল না। কারণ, ধর্মবিশ্বাস ও অনুশীলন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতীক, বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু যখন দেখতাম যাতে বিশ্বাস করেন না, অনুশীলন করেন না তার মাহাত্ম প্রকাশ করে ও পক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতামত রচনা করে পাঠকগণকে তা অনুসরণে উপদেশ দিচ্ছেন তখন আমার কাছে তা কপটতা বলে মনে হতো। রমজান আগমনের প্রাক্কালে রমজানের মর্যাদা, রোজাপালনে ও তারাবী নামাজের পূণ্য ও স্বর্গীয় প্রসাদলাভের বাণী শুনিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন, যা আমার কাছে ধর্মের মর্মবাণী প্রচারের পরিবর্তে বিবেক বিক্রী মনে হতো। পক্ষান্তরে হাবীবউল্লাহ বাহার, আবুল মনসুর আহমদ অথবা মোজাম্মেল হক সাহেবানদের কখনও ধুতি পরতে দেখিনি। আচকান পায়জামা সচরাচর ব্যবহার করতেন অথচ ধর্মীয় নীতিকথা খয়রাত করতেন না, বরঞ্চ কথায় ও কাজে তাঁরা ছিলেন সামঞ্জস্য রক্ষায় অবিচল। যা সত্য এবং যা বিশ্বাস করতেন অপ্রিয় হলেও অকপটে প্রকাশ করতেন। যা বিশ্বাস করতেন না তা বলতে দ্বিধা করতেন না। মাওলানা আকরাম খান অবসর নেয়ার পর আবুল কালাম শামসউদ্দিন আজাদের সম্পাদক পদে নিয়োগ লাভ করেন। ২৩ নং ক্রিমেটোরিয়াম ষ্ট্রীটে বাহার সাহেবের পারিবারিক বাসভবনে নবনিযুক্ত সম্পাদকের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপরোল্লিখিত সুধীবৃন্দ ছাড়াও আরও অনেক সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী ও সাংবাদিকের সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আবুল মনসুর সাহেব লিখনে যেমন স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গ ও রসাত্মক ভাষা ব্যবহার করতেন, আলোচনায়ও রসিকতা করতেন, যার মধ্যে মূল্যবান অর্থপূর্ণ কটাক্ষ থাকতো। আদর্শে বিশ্বাস ও উহার রূপায়নে অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে মনসুর সাহেবের প্রদত্ত অভিনন্দন ভাষণ ছিল

www.pathagar.com

এরূপ–বিখ্যাত মুসলিম দৈনিকের সম্পাদক নিয়োগে শামসউদ্দিন যোগ্যতারই স্বীকৃতি পেয়েছেন, সে জন্য অভিনন্দন দেয়া ও পাওয়া স্বাভাবিক। তাই বন্ধুরূপে সমবেত সকল গুণগ্রাহীদের ন্যায় আমিও আনন্দিত। তবে আমার আনন্দের একটা ভিন্নতর কারণ আছে, আমার আনন্দের মাত্রাও সবাইর চাইতে বেশী। আমি জানতে পেরেছি আমার বন্ধু নাকি একটি নতুন আচকান বানিয়েছেন এবং একটি মুসলিম দৈনিক সম্পাদকের মর্যাদা রক্ষাকল্পে জীবনে এই প্রথম ইসলামী পোষাক আচকান পরিধান করবেন। আমার জন্য ইহা বাড়তি আনন্দের বিষয়, কারণ পোষাক পরিচ্ছদে বাহার সাহেব আর আমি এতদিন সংখ্যালঘু ছিলাম, এখন আর একজন সাথী পেলাম ইত্যাদি।

মন্তব্যটি সকলেই উপভোগ করলেন সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন রূঢ় সত্যটির তাৎপর্যও উপলব্ধি করলেন। উল্লিখিত সাংবাদিকগণকে দেশবিভাগের পর পাকিস্তান আমলে আর ধুতি পরতে দেখিনি। স্থানকাল ভেদে পাত্রের পরিচ্ছদে পরিবর্তন হলেও ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিবর্তন হয়েছে কি না বুঝবার বা জানবার সুযোগ হয়নি। পেশাগত কারণে এঁদের সাথে বিভাগপূর্ব অন্তরঙ্গতা বজায় রাখতে পারিনি। ৫০ বছর পরে এখন পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। আদর্শ বা নীতির স্বীকৃতি আর অনুশীলনের মাঝে অসঙ্গতি বর্তমানে সুধীমহলে অধিকতর ব্যাপক হয়ে পড়েছে। ফলে ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও কপটতা ভেজাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রশাসনের ছায়াতলেই দূর্নীতি প্রসার লাভ করে থাকে

২.৭ সময়কাল ১৯৫৩-৫৪। তুলাবুনন (কটন মিল) কলগুলি অধিকাংশই ছিল সুতা উৎপাদনকারী। সীমিত সংখ্যক বস্ত্র উৎপাদনকারী মিলগুলির মধ্যে কালীগঞ্জ মুসলিম কটন মিল স্থাপনের (১৯৫৪) পূর্বে নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত একমাত্র ঢাকেশ্বরী মিলই মিহি সুতা ও পাতলা সুতী শাড়ী ও ধুতি প্রভৃতি উচ্চমানের সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদন করতো, যার চাহিদা ছিল খুব বেশী। মিল মালিক বসু পরিবার প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো। বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল যে উপার্জিত বিপুল মুনাফার অর্থ পুরোপুরি দেশের বাইরে ভারতে চলে যেতো এবং তা সরকারের জ্ঞাতসারেই হতো। নগদ সম্পদ পাচারের পন্থা ছিল অবৈধ এবং অভিনব। ঢাকেশ্বরী গ্রুপ মিলের রেজিষ্টার্ড অফিস ও প্রধান কার্যালয় দেশবিভাগের পূর্ব হতেই কলকাতায় অবস্থিত ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর ইহা আপন দেশে অর্থাৎ ঢাকায় স্থানান্তরিত করার কোন সরকারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কি না জানা নেই, মালিকেরও ইচ্ছা ছিল না। কাজেই যথাস্থানে বহাল থাকলো। রেজিষ্টার্ড অফিস কলকাতায় থাকা বিধায় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, উৎপাদন, বিতরণ সংক্রান্ত ব্যবসায়িক নীতি নির্ধারণী যাবতীয় কার্যক্রম ও আর্থিক লেনদেন কলকাতা অফিসেই নির্বাহ হতো। মিলে উৎপাদন, কার্যক্রম পরিচালনা এবং শ্রমিক কর্মচারীর বেতন প্রদান সংক্রান্ত স্থানীয় লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় সীমিত পরিমাণ অর্থের তহবিল ও ব্যাঙ্ক একাউন্ট ঢাকায় থাকতো। বস্ত্র ও সুতার চাহিদা উৎপাদনের তুলনায় অত্যধিক থাকায় বিতরণের জন্য কোটা নীতি প্রচলিত ছিল। মিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অঙ্কের ফিস এবং মোটা অঙ্কের সালামী আদায়ের বিনিময়ে এলাকাভিত্তিক কোটা হোলডার নিয়োগ করতো। এই অর্থ কলকাতাস্থ প্রধান কার্যালয়ে জমা দেওয়ার বিধি ছিল। অনুমোদিত ও বৈধ পন্থায় ইহা সম্ভব ছিল না। সুতরাং দেশত্যাগী ও পরবর্তীতে ভারতীয় নাগরিকগণ এবং কিছু দ্বৈত

www.pathagar.com

পাশপোর্টধারী পূর্ব পাকিস্তানী নাগরিক কোটা প্রার্থীর নামে কলকাতা অফিসে অর্থ জমা দিত, ঢাকা এসে জমা দেওয়া অর্থ আদায় করে কাগজপত্র হস্তান্তর করতো। স্থানীয় কোটা হোল্ডার সেই কাগজপত্রের ভিত্তিতে বস্ত্রকল হতে সুতা বা বস্ত্র গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রকৃত বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিতরণ/বিক্রয় করতো। ব্যবসা খুবই লাভজনক ছিল। কোটা প্রার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকার কারণে ভারতীয় নাগরিক মধ্যবর্তী ব্যক্তি কোটা প্রার্থীগণের নিকট হতে মিলের নির্ধারিত মূল্যের (invoice price) যতসম্ভব অতিরিক্ত কমিশন বা প্রিমিয়াম আদায় করতো। এভাবে আদায়কৃত সমুদয় অর্থও অবৈধ পন্থায় (হুণ্ডী) ভারতে চলে যেতো। বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে ব্যবসা বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাচারের এই প্রতিষ্ঠিত পন্থা আজও বিদ্যমান।

ঢাকেশ্বরী মিল মালিক পরিবার এখানকার অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ উল্লিখিত পন্থায় পাচার করে পশ্চিম বঙ্গের আসানসোলে একের পর এক করে দুটি বস্ত্রকল স্থাপন করেছে যা করতে বেশ কয়েক বৎসর সময় লেগেছে। তাও পাকিস্তান সরকারের অজানা ছিল না। কোটা হোল্ডারদের দীর্ঘ তালিকায় অধিকাংশ ছিল ভারতীয় এবং পূর্ব পাকিস্তানী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক, যাদের অনেকেই বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিল না। কিছু সংখ্যক স্থানীয় বেনামী কোটা হোল্ডার ছিল যাদেরও বস্ত্র বা সুতার কোন ব্যবসা ছিল না, দোকান বা স্থায়ী ঠিকানাও ছিল না। ইহাদের মধ্যে ছিলেন উচ্চ মধ্য নিম্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কিম্বা তাঁদের পোষ্য, সরকারী মহলে আনাগোনাকারী প্রভাবশালী সমাজপতি, আইন পরিষদ ও স্থানীয় সংস্থার সদস্য। শেষোক্ত কোটা হোল্ডার গোষ্ঠি আইন প্রয়োগকারী ও প্রশাসন মহল এবং মিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ধাক্কা নিরোধক (shock absorbing) বাফারের কাজ করতো। যার কারণে দেশের অর্জিত অর্থ নির্বিঘ্নে পাচার হয়ে ভিন্নদেশে সম্পদ ও সম্পত্তি গড়ে ওঠতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালে আদমজী পাটকলে ঘটিত দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানকালে উক্ত বে-আইনী দেশদ্রোহী পন্থায় সম্পদ লুটের গোপন কৌশল ও তথ্য তুলে ধরার ফলে সুতা ও বস্ত্র বন্টনের কোটা প্রথা বাতিল করে সরকারের তত্ত্বাবধানে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ (ক) ধারার অধীনে গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক কেন্দ্রের সরাসরি শাসন প্রচলিত ছিল। এক বৎসর পর ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার এবং পুনঃমন্ত্রীসভা গঠনের পর পরই পূর্বোল্লিখিত মধ্যস্বত্বভোগী মহলের আশীর্বাদে নতুন পদ্ধতি বানচাল হয়ে যায় এবং পুরাতন পদ্ধতি পুনঃপ্রচলিত হয়। ১৯৬৫ সালের ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধকাল পর্যন্ত একই নিয়মে দেশের অর্থ ও সম্পদ পাচার হতে থাকে। উক্ত দুর্নীতি উদঘাটন ও কোটা প্রথা বাতিলের পক্ষে নেপথ্য অবদান রাখার কারণে গ্রন্থকারকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। এক পর্যায়ে উক্ত কোটারীর সহযোগিতায় মিল কর্তৃপক্ষ গ্রন্থকারকে নগদ মূল্যে ক্রয় করবার জন্য বিপুল অর্থের এক সোনার ফাঁদ পেতে ব্যর্থ হয়। তবে ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে দুর্ভোগ ও অপবাদ হতে রেহাই পাইনি। ঐ সময় গ্রন্থকার নারায়ণগঞ্জে বেসরকারী সরবরাহের (সিভিল সাপ্লাইজ) কন্ট্রোলার রূপে কর্মরত ছিলেন।

২.৮ ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধশেষে শত্রু সম্পত্তি ঘোষিত সুতা ও বস্ত্র কলগুলির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের (ইপিআইডিসি) উপর ন্যস্ত হয়। আমি ঢাকেশ্বরী ঢাকা কটন মিল গ্রুপের এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত হই। যুদ্ধকালীন সময় মালিকগণ দেশত্যাগের প্রাক্কালে নগদ অর্থ ও বহনযোগ্য অন্যান্য মূল্যবান সকল সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যায়। যুদ্ধশেষে মিল চালু করতে যেয়ে প্রত্যেকটি মিল আর্থিক সংকটে পড়ে। নগদ মূলধনের অভাবে কাঁচাতুলা খরিদ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ এবং শ্রমিক কর্মচারীর বেতন প্রদানের কোন উপায় ছিল না। ইপিআইডিসি কোন মূলধন দিবে না। মিলের নিজস্ব সম্পদ দিয়েই

www.pathagar.com

মিল চালাবার নির্দেশ। নগদ অর্থ তহবিল ছাড়া অন্য কিছু পরিসম্পদ (asset) আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে যেয়ে আমি ২/৩টি ব্যাপারে যুগপৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়ে পড়ি। তন্মধ্যে একটি ছিল মিলগুলিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যানবাহনের বহর এবং অপরটি মিলগুলি সরকারী তত্ত্বাবধানে আসার পর পরই আয়কর ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্তব্যজ্ঞানের আকস্মিক উন্মেষ ও ৭-১০ বৎসরের বকেয়া কর আদায়ের তৎপরতা।

ঢাকা কটন মিলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহুসংখ্যক যানবাহন রয়েছে দেখতে পাই। যার মধ্যে দৈনন্দিন ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয় ট্রাক, লরি, ভ্যান, ট্রাকটার, মাইক্রোবাস ও ষ্টাফ কার ছাড়াও বেশ কয়েকটি দামী বিলাসযানও ছিল, যেমন মারসিডিস বেন্‌জ ২২০, ক্যাডিলাক, থানডারবার্ড, শেভ্রোলেট, হিনোকনটেসা ইত্যাদি গাড়ী। সদ্য আমদানীকৃত একখানা মারসিডিস গাড়ী এজেন্ট শাহনাজ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে ছাড়পত্রের অপেক্ষায় ছিল। ইহার বোতাম চাপলে ভিতরে আসনগুলি বিছানায় রূপান্তরিত হয়ে যেতো। তখনকার দিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী ছিল বিরল অথচ এ গাড়ীগুলির প্রত্যেকটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। ঢাকা কটন মিলের তুলনায় ঢাকেশ্বরী গ্রুপের অপ্রয়োজনীয় যানবাহনের সংখ্যা ছিল কিছু কম, তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদের সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দেওয়া বেশ কয়েকটি গাড়ী পূর্ব হতেই মিল কর্তৃপক্ষের নাগালের বাহিরে ছিল। সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যাহোক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অতগুলি দামী গাড়ী কেন সংগ্রহ করা ও রাখা হতো তা ভেবে প্রথমে অনুধাবন করতে পারিনি। পুরাতন কর্মচারীগণও কেহ আমার কৌতূহল নিরসন করতে পারেন নি। সময় অতিক্রমের সাথে ধীরে ধীরে রহস্য উন্মোচিত হতে শুরু করে। ঢাকা কটন মিল অবস্থিত ছিল পোস্তগোলায় বুড়িগঙ্গা নদী তীরে আর প্রধান কার্যালয় ছিল মতিঝিলে 'আলী-কো' ভবনে। বিলাসবহুল আসবাব ও সামগ্রীতে সুসজ্জিত

www.pathagar.com

রাজকীয় সুযোগ সুবিধাময় পরিবেশে একই ইমারতে একই মালিকের অপর শিল্প ঢাকা জুট মিলের কার্যালয়ও অবস্থিত ছিল।

মিল চালু করার জন্য কাঁচা তুলা খরিদ, জ্বালানী সংগ্রহ, শ্রমিক কর্মচারীর বেতন পরিশোধ মানসে অতিরিক্ত গাড়ীগুলি বিক্রয় করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে মনস্থ করলাম। 'আলী-কো' ভবনে বিলাসময় অফিস পরিত্যাগ করে মিলের ভিতরেই এডমিনিষ্ট্রেটরের অফিস স্থানান্তরিত করলাম। ফলে মোটা অঙ্কের ভাড়া বেঁচে গেলো। নীতিগতভাবে এও স্থির করলাম যে মিলের গাড়ীর বহরের কোন গাড়ীই ব্যবহারে লাগাব না। পুরাতন ২/১ খানা বিক্রয় করে লব্ধ অর্থে একটা নতুন গাড়ী ও একখানা ষ্টাফ কার খরিদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিধিমতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ইপিআইডিসি হতে শিষ্টাচারসূচক অনুমতি নেয়া সঙ্গত মনে করলাম। অনুমতি পাওয়া সহজ মনে হলো না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কেহ কেহ ইঙ্গিতে বুঝাতে চাইলেন যে মিলের জন্য অপ্রয়োজনীয় হলেও সময় অসময়ে গাড়ী তাঁদের (করপোরেশনের) কাজে লাগতে পারে। সুতরাং বিক্রয় না করার বন্ধুসুলভ পরামর্শ দিলেন। ইতোমধ্যে প্রায়শঃ বিভিন্ন সরকারী মহল হতে সরকারী প্রয়োজনের অজুহাত এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গাড়ী চেয়ে টেলিফোনে অনুরোধ পেতে লাগলাম। এ সকল মহল গভর্ণর হাউস হতে আরম্ভ করে ইনকাম ট্যাক্স, কাষ্টমস, আবগারী, আমদানী–রফতানি, পুলিশ বিভাগ, জিলা প্রশাসন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এতদিনে বুঝলাম কেন এই গাড়ীর বহর রাখা হয়েছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মহলে সরকারী কাজের প্রয়োজনের অজুহাত দেখিয়ে গাড়ী চাওয়া হলেও আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ ও তাদের পরিবারের ব্যক্তিগত কাজেই ব্যবহৃত হতো। কিছু কিছু গাড়ী সাময়িক উপহার হিসাবে অনেকের কাছে পূর্ব হতেই ছিল। লিখিত রেকর্ডের অভাবে ঐগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

যাহোক, উল্লিখিত ব্যক্তিগত অবৈধ ব্যবহার এড়াবার উদ্দেশ্যে এবং মিল চালাবার ব্যয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্য ট্রাক, ট্রলি প্রভৃতি ছাড়া সকল যানবাহন বিক্রয় করে দিবার সংকল্প নিলাম। ইপিআইডিসির ম্যানেজম্যান্ট স্তর হতে গাড়ী বিক্রয়ের অনুমতি পেতে গড়িমসি উপলব্ধি করে ব্যাপারটি সরাসরি চেয়ারম্যানের গোচরে নেওয়ার পন্থা ঠিক করলাম। নূতন মারসিডিস বেনজ গাড়ীকে কেন্দ্র করে এ মর্মে লিখিত প্রস্তাব পাঠালাম যে এ গাড়ীখানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পক্ষে ব্যবহার করা বিলাসিতা মনে করি, মিলের অর্থ সংকট নিরসনে উহা এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাড়ী বিক্রি করে দিতে ইচ্ছা। তবে চেয়ারম্যান যদি ভিআইপি বাহনরূপে করপোরেশনের জন্য মারসিডিসখানা রাখতে চান তাহলে করপোরেশন মূল্য দিয়ে গাড়ীখানি নিলে প্রাপ্য অর্থ মিল পরিচালনায় ব্যবহার করা যায়। প্রস্তাবের উত্তরে এরকম বিলাস গাড়ী ব্যবহার চেয়ারম্যান নিজের পক্ষেও বিলাসিতা বিবেচনা করেন সুতরাং বিক্রয় করে দিয়ে মিলের আর্থিক সংকট কাটান হোক বলে নির্দেশ দেন। চেয়ারম্যান ছিলেন তখনকার কালের সিভিল সার্ভিসের লৌহমানব আখ্যায়িত জনাব শফিউল আজম। গাড়ী সরবরাহের জন্য সকল মহলের অনুরোধ উপরোধ, এমনকি পীড়াপীড়ি ও পরোক্ষ চাপ এড়াবার সপক্ষে দৃঢ় সমর্থন পেয়ে গেলাম এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাই। এক এক করে সকল গাড়ী বিক্রি করে মিল চালাবার মূলধন (working capital) সংগ্রহ করতে থাকি। মারসিডিস বেন্জ গাড়ীখানি আদমজী পাটকলের মালিক গুল মোহাম্মদ আদমজীর কাছে ক্রয়মূল্যে বিক্রয় করে দিই। অত দামী গাড়ীর জন্য অন্য খরিদদার তাৎক্ষণিক ভাবে পাওয়া যায়নি। মিলে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য একখানা নতুন টয়োটা কার ও একখানা মাইক্রোবাস খরিদ করি। বলাবাহুল্য, শফিউল আজম সাহেব চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই কর্তব্যপালনে সকল প্রতিবন্ধকতা সাহসিকতার সাথে অতিক্রম করতে পেরেছিলাম।

www.pathagar.com

ক্ষমতার উৎস ও প্রয়োগ মহলে গাড়ী উপহার ও বিনা ব্যয়ে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে সরকারী অনুগ্রহ অর্জন এবং সরকারের বিভিন্ন ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দেয়ার পরোক্ষ সমর্থন লাভের জন্যই এতগুলি গাড়ীর বহর রাখার রহস্য আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো। পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে আমি সকলের বিরাগভাজন হই। কর্তব্যনিষ্ঠ (?) সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তব্য পালনে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যানবাহনের অধিকাংশ এতদিন হয় বিনা রেজিষ্ট্রেশনে অথবা ট্যাক্স আদায় না করে চলাচল করেছে, কোন পক্ষ হতে আপত্তি ওঠেনি। এখন হতে পথেঘাটে পুলিশ অথবা নগর শুল্ক (Octroi) কর্মকর্তারা মালবাহী ট্রাক আটক করে মিলের কার্যে বাধা সৃষ্টি করে কর্তব্য পালনে অতি তৎপর হয়ে পড়েন। অবশ্য এরূপ ঘটনা খুব বেশী ঘটেনি। কারণ বেশীর ভাগ যানবাহন গ্যারেজেই রাখা হতো। ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ কর্তব্যজ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে আরম্ভ করলেন। দীর্ঘকালের বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য অ্যাসেসমেন্ট সমাপ্ত করে জরুরী নোটিশ প্রেরণ, পরে তাগিদের পর তাগিদ এবং আইনানুগ কার্যক্রমের হুমকিতে আমি অস্থির হয়ে পড়ি। অবশ্য পরোয়া করিনি। কারণ, জানতাম কর্তব্যে অবহেলার অপরাধ ঘটেছে তাঁদেরই ঘরে। তিন বৎসরের অধিককাল অ্যাসেসমেন্ট মুলতবী রাখা আইনের পরিপন্থী। আইনের বিধিমত নিয়মিত অ্যাসেসমেন্ট না করে এবং ট্যাক্স আদায়ের প্রক্রিয়া গ্রহণ না করে ট্যাক্স অনাদায় কুকর্মে সহায়তা (abetment) করেছেন তাঁরাই। এঁদের যোগসাজসে পূবর্তন মালিক ট্যাক্স না দিয়ে অপরাধ করে যুদ্ধের সময় দেশত্যাগ করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা স্থানান্তরিত হয়ে সরকারে অর্পিত হয়েছে। প্রাক্তন মালিকের কৃত অপরাধের জন্য সরকারী মালিকানাকে দায়ী করার প্রতিউত্তরে আমি সহায়তাকারী রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ট্যাক্স কর্মকর্তাগণকে পাল্টা দায়ী করি। আমার আইনসিদ্ধ লিপিবদ্ধ যুক্তি ও প্রতিউত্তরে তাঁরা নাজেহাল হন। আমি খাতাপত্র ঘেঁটে লক্ষ্য করি কখনো কখনো ইনকাম ট্যাক্স বাবত মোটা অঙ্কের নগদ অর্থ হাতে হাতে প্রদান করার রেকর্ড রয়েছে কিন্তু নিয়মিত ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে

www.pathagar.com

জমা দেওয়ার কোন প্রমাণ নেই। নিঃসন্দেহে প্রমাণ হলো যা কিছু ঘটেছে ট্যাক্স বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সজ্ঞান যোগসাজসেই। নিজেদের কালো রেকর্ড ধরা পড়ে যাওয়ায় আমার হাতে নাজেহালের ফলে কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তাগণ ধীরে ধীরে পর্দার আড়ালে সরে পড়েন। তবে সরকারের অনাদায়ী উক্ত ট্যাক্সের হিসাব কিভাবে মিলিয়েছেন এবং রেকর্ড পত্র দোরস্ত করেছেন তা জানবার সুযোগ আমার হয়নি, আমিও শত্রুতা বাড়াতে চাইনি। অতএব ঐ ব্যাপারে আর আগ্রহ দেখাইনি।

সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মাঝে সখ্যতা ও আঁতাতের ফলে উভয় পক্ষই লাভবান হয়ে থাকে। আর মাঝখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সরকার এবং ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হয় দেশ। এই নীতি চালু রয়েছে সর্বকালে। পার্থক্য শুধু সময়ের ব্যবধানে মাত্রায় ও পরিমাণে। দেশ ও জাতির গুপ্ত শত্রু এরা, নৈতিক সংজ্ঞায় বিশ্বাসঘাতক এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনে অবৈধ উপার্জনকারী (হারামখোর)।

www.pathagar.com

৩য় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক উচ্চস্তরে ব্যক্তি চরিত্রে বৈচিত্র্য

৩.৯ ক্ষণস্থায়ী কর্মকাল (short tenure) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ জ্ঞানই উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অধস্তনের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার মুখ্য কারণ হয়ে থাকে।

চাকুরী জীবনকালের এমন অন্যতম ঘটনাঃ সময়কাল ১৯৪৮ সাল। জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানী সি এস পি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের টেকসেশন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত। ভারত বিভাগপূর্ব বৃটিশ আমলে ইনি আমার উর্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন। পাকিস্তান আমলে আমাদের মধ্যে তেমন কর্ম-সম্পর্ক ছিল না। তবে পূর্বেকার অন্তরঙ্গতা বজায় ছিল বিধায় মাঝে মাঝে সৌজন্য সাক্ষাৎ হতো। একদিন তাঁর টেবিলে বড় বড় আইন বই দেখে জানতে চাইলাম ওসব তাঁর কি কাজে লাগে। উত্তরে বললেন, 'Don't you know my Minister is a veteran lawyer, he is not easily satisfied like other duffer Ministers. I must equip myself before I go for discussion'.

এই মন্ত্রী ছিলেন জনাব হামিদুল হক চৌধুরী। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা ও সমীহ করে থাকে। তাঁকে সত্যিই তখনকার কালের জাঁদরেল সি এস পিগণ যেমন সমীহ করতেন যেমন অপছন্দও করতেন। তাঁর কঠিন ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ ধীশক্তি ছিল তাঁর শত্রু। এ কারণেই মূলতঃ সিএসপিদের নেপথ্য চক্রান্তের ফলে তিনি 'এবডোর' শিকার হয়েছেন।

'এবডোর' কোন জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য হয়েছিলেন। Elected Bodies disqualification order-EBDO.

www.pathagar.com

আর অন্য duffer (গবেট) মন্ত্রী বলতে এমন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন যিনি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু আলোচনার অল্পদিনের মধ্যেই ভুলে যেতেন। মন্ত্রী বেঁচে নেই বলে নাম প্রকাশ করলাম না। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাঙলায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভায় তিনি অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একজন অভিজ্ঞ দক্ষ নির্ভরশীল কর্মকর্তার প্রয়োজন বোধ করেন। কথাবার্তা বলে নিজেই নির্বাচন যেন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আমি উপরোক্ত আইসিএস কর্মকর্তার সাথে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ময়দানে নিয়ে দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। দীর্ঘ একঘন্টা আলাপ আলোচনার পর তাঁরা মৌখিক কর্মসূচী ঠিক করলেন। কিছুদিন পরে মন্ত্রী সাহেব আলোচনার মুখ্য বিষয়গুলো স্মরণ করতে পারেননি। উপরোক্ত তীর্যক মন্তব্যে সে ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ক্রম অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে ওরকম গবেট মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কিছু কিছু বিচক্ষণ মন্ত্রী ব্যক্তিত্ব বিরাজ করতেন বলেই সরকার চালু থাকে।

৩.১০ আমার জনৈক আত্মীয় প্রধানশিক্ষক নাজিমউদ্দিন মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছায় পল্লীগ্রাম হতে রাজধানী ঢাকায় আসেন। সাথীরূপে আমাকেও নিলেন। মন্ত্রীর বাসভবনে অনেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সাথে আমরাও উপস্থিত। শাহী দরবারসম সমাবেশে কথাবার্তা, গল্প গুজব চলছে, কোন আগন্তুকের বক্তব্যই পুরোপুরি বলা হচ্ছে না। একের কথা শুনতে শুনতে অপরের দিকে দৃষ্টি ফেরান, তাঁর বক্তব্য শেষ হবার পূর্বেই মন্ত্রী সাহেব আপন কোন কৃতিত্বের উপমা বা কাহিনী উপহার দেন। কাহারো কথা শোনা শেষ না হওয়ায় উহার সুরাহাও হয় না। অতএব সাক্ষাৎপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়তেই থাকে। আমার আত্মীয়ের বক্তব্য উপস্থাপনেও সুযোগ মিলে না। ইতোমধ্যে দিনের বারোটা বাজে প্রায়। টেলিফোন বেজে ওঠে। বুঝা গেলো অপর প্রান্ত হতে মন্ত্রণালয়ের সচিব (ফজলে আহমদ করীম) কথা বলছেন। কোন এক

www.pathagar.com

বিশেষ জরুরী বিষয় ঐদিনই ঐ সময় মন্ত্রীর সাথে যৌথ আলোচনা ও বিবেচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। তাই মন্ত্রী কখন দপ্তরে পৌঁছবেন সচিব জানতে চাইলেন। উত্তরে মন্ত্রী বাহাদুর জানালেন যে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং আসা সম্ভব নয়। সচিব যা ভাল মনে করেন সিদ্ধান্ত নিয়ে যেন নির্দেশ জারী করে দেন, মন্ত্রীকে পরে জানালেই চলবে।

লক্ষ্য করলাম মন্ত্রী সাহেব প্রকৃতই কোন জরুরী ব্যাপারেই ব্যস্ত ছিলেন না। আপন ব্যক্তিজীবনের নানা প্রকার অভিজ্ঞতার গল্প কাহিনী শুনিয়ে আত্মতৃপ্তি ভোগ করছিলেন। ভেবে অবাক বিস্ময়ে অনুধাবন করলাম যে, কর্তব্যে এমন অবহেলাকারী দায়িত্বজ্ঞানহীন (গবেট) মন্ত্রীকে সচিবগণ উপেক্ষা করবেন না কেন? আরো লক্ষ্যণীয় যে, মন্ত্রী ছাড়াই যদি সচিবের সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকতো তবে পূর্ব বৈঠক স্থির করার কোন কারণ থাকার কথা তো নয়।

ইহা সত্য যে সাধারণতঃ মন্ত্রীবিশেষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অথবা যোগ্য ব্যক্তিত্বের অভাবের দরুণ সচিবের ওপর নির্ভরশীল হতে হয় কিংবা সচিব অমন মন্ত্রীকে পকেটে রাখবার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কারণ, সচরাচর প্রশাসনিক বা রাষ্ট্রনৈতিক যোগ্যতার মাপকাঠিতে মন্ত্রী নির্বাচিত হন না। মন্ত্রীত্বের মুখ্য যোগ্যতা হয়ে থাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ অথবা রাজনৈতিক সুবিধাজনক পরিস্থিতি কাজে লাগাতে পারবার পারদর্শিতা (manipulation) বা রাজনৈতিক চাতুর্য। অবশ্য যোগ্যতা থাকলে উত্তম তবে তা হয় ব্যতিক্রম।

একই ধরনের কারণে অর্থাৎ হয় আপন দায়িত্ব কর্মে সীমাবদ্ধ জ্ঞান, নয় কর্মবিমুখতা কিম্বা দীর্ঘস্থায়ী ও পুনঃ পুনঃ মিটিং আলোচনা ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপনের ফলে বর্তমানকালে কোন কোন সচিবকেও আবার অধস্তন কর্মকর্তার ওপর নির্ভর করতে হয়। বস্তুতঃ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না, বাস্তবে যুগ্ম, উপ বা সহকারী সচিবগণই ক্ষমতা কার্যকর করে থাকেন। ক্ষমতার অধিকারী এদের হাতে ক্রিড়নক, তাঁরা সই

www.pathagar.com

করেন। ফলে প্রশাসনে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং জনসাধারণের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে।

৩.১ সমাজের উঁচু পর্যায়ে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব থাকেন, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসন মহলে, যাঁরা কোন অনুষ্ঠানে তাঁদের আগমনপূর্বে সমবেত অভ্যাগতমণ্ডলীকে অপেক্ষা করতে দেখে এক প্রকার অস্বাভাবিক আত্মসন্তোষ অনুভব করে থাকেন। লোকজনকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষমান রেখে আপন প্রতিপত্তি বা গুরুত্ব যাচাই করতে ভালবাসেন। কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে থাকেন এমন উচ্চপদস্থ বা গণ্যমান্য ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এককালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান (মরহুম)। কোন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি কখনো নির্দিষ্ট সময়ে হয়েছে বলে কেহ দেখেছেন কি না আমার জানা নেই। তাঁর প্রশাসন আমলে আমি এমন অসংখ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম যেখানে তাঁর আগমনের পূর্বে সবাইকে ঘৃণালিপ্ত অধৈর্য অপেক্ষায় থাকতে হতো। একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে লায়ন্‌স্ ইন্টারনেশনালের বার্ষিক কনভেনশনে প্রধান অতিথিরূপে এক ঘন্টা বিলম্বে উপস্থিত হয়ে তিনি কোন প্রকার লৌকিক দুঃখ প্রকাশ প্রয়োজন বোধ করেন নি। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সবাইর ধৈর্য্যচ্যুতির প্রাক্‌কালে উপস্থিত হয়ে আমন্ত্রিতগণকে একমাত্র তাঁর জন্য অধীর অপেক্ষা করতে দেখে তিনি একটা নিষ্ঠুর আনন্দ (sadistic pleasure) উপভোগ করতেন। তাঁর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য মৃত ব্যক্তিকেও রেহাই দেয়নি। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পিতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা আদায়ের জন্য মৃতদেহ পূর্বঘোষিত নির্দিষ্ট সময়ে নীত হয়। গভর্ণর মোনায়েম খান জানাজায় শরীক হবেন বলে সাংবাদ পাঠান। জানাজা পড়াবার ঘোষিত সময় এবং জানাজার পর দাফনের জন্য মরদেহ টাঙ্গাইল নেওয়া

www.pathagar.com

হবে, তা গভর্ণরের জানা ছিল। এখানেও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম প্রকাশ পায়নি। গ্রীষ্মের সূর্যতাপের নিচে মৃতদেহ এবং অগণিত জন সমাবেশ অধীর প্রতিক্ষায়, সময় গড়িয়ে যায়। সবাই অতিষ্ঠ, অসন্তুষ্ট, তীর্যক মন্তব্যও শোনা যায়। প্রায় এক ঘন্টার অধিক বিলম্বে তিনি আগমন করলেন। বিলম্বের জন্য কোন অজুহাত বা অতগুলি মানুষকে ও কাফন পরিহিত লাশকে খর রৌদ্রতাপে দীর্ঘসময় ঝলসানোর জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করেননি। ক্ষমতার স্বাদ কত তিক্ত এবং ঘৃণ্য তা উপলব্ধি করার লক্ষণ তাঁর আলাপচারিতায় দেখা যায়নি।

৩.১২ বৃটিশ আমলে নোয়াখালীর ইংরেজ জেলা প্রশাসকের পত্নী মিসেস এ হুইটেকার কোলকাতার পথে ট্রেন যোগে চাঁদপুর পৌছে গোয়ালন্দ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘাটে অপেক্ষারত স্টীমারে আরোহন করতে গিয়ে প্রচণ্ড ভীড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে ষ্টীমারের সারেং (মাষ্টার) এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই এবং নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা না করে সময় নষ্ট করার দায়ে স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লিখিত অভিযোগ পাঠালেন। এস ডি ও বিধিবদ্ধ সময় তালিকা (time table) ও যাত্রী সংখ্যাসীমা লঙ্ঘন এবং বৈধ যাত্রীর মূল্যবান সময় নষ্টের অপরাধে জাহাজ কোম্পানীকে দায়ী করে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিপূরণ দানের নির্দেশ দিলেন। কোলকাতার পথে আমিও সহযাত্রী ছিলাম। অতি কষ্টে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ নিরসন অন্তে স্টীমার অনেক দেরীতে ছেড়ে দিল বটে তবে মামলার পরবর্তী ফলাফল জানবার সুযোগ হয়নি।

এ ধরনের নীতিভঙ্গ ও আইন লঙ্ঘন এখন আরও ব্যাপক এবং সর্বত্র। কিন্তু মূল্যবান সময় অপচয় বা অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভোগ করেও কেহ আপন নাগরিক অধিকার রক্ষায় প্রতিকার দাবী করার মানসিক তাগিদ অনুভব করে না। নাগরিক স্বাধীনতার অধিকারজ্ঞান জাতীয় চরিত্রে লোপ পেয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়। উহা ফিরে পাবার কোন ভরসা আছে কি?

www.pathagar.com

৩.১৩ এককালে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগে টেণ্ডার মারফত পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ আমার দায়িত্বের অন্যতম কার্যক্রম ছিল। টেণ্ডার কমিটি কর্তৃক বাছাই এবং চূড়ান্ত নির্বাচনের বিভাগীয় প্রধানের অনুমোদনের পর মন্ত্রীর অবগতি ও স্বাক্ষর গ্রহণ বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল। মন্ত্রীর স্বাক্ষরের পরেই নির্বাচিত টেণ্ডার দাতার নিয়োগ এবং বাতিল টেণ্ডারের বায়নার অর্থ ফেরৎ দেয়ার নিয়ম।

যথারীতি টেণ্ডারবাছাই ও চূড়ান্ত নির্বাচনের পর নথি মন্ত্রীর সমীপে পেশ করা হলো। দিন, সপ্তাহ, প্রায় মাস অতিবাহিত হতে চললো, নথি ফিরে আসে না। ডেপুটি সেক্রেটারী আসগর আলী শাহকে (মরহুম) জানিয়ে পরামর্শ চাইলাম। পরবর্তী কাহিনী লম্বা ও রোমাঞ্চকর, সংক্ষেপে বলি। খোঁজাখুঁজি করি, নথির পাত্তা নেই। এক পর্যায়ে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ, নথিটি তিনি পড়েছেন কি না, উহা ফেরৎ পাওয়া জরুরী বলে নিবেদন করলাম। প্রতিক্রিয়া অশুভ হলো। একজন মন্ত্রীকে কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেয়া ধৃষ্টতা এ কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অমর্যাদাকর মন্তব্য এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার করলেন লোকজনের সামনেই। ইহা ছিল আমার জন্য অপ্রত্যাশিত এবং অবমাননাকর। মুহূর্তে আত্মসম্মানজ্ঞান চাড়া দিয়ে ওঠলো, বয়সও ছিল নবীন। মন্ত্রীর উপবিষ্ট আসনের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম–ঐ আসনকে (অর্থাৎ পদমর্যাদা) সম্মান করি, তবে উহার অধিকারীকে সম্মান করা নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের ওপর। মন্ত্রী ও তাঁর অধীনস্থ একজন কর্মকর্তার মাঝে সম্পর্ক পিতাপুত্র তুল্য এবং তেমন আচরণই আমি প্রত্যাশা করি। আমার কথায় তিনি দারুণ অপমানিত বোধ করলেন, আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ক্রোধভরে আমাকে বের হয়ে যেতে বলবার উদ্যোগের সাথে সাথেই আমি যাচ্ছি, তবে আগামীকাল নথি ফেরৎ না পেলে টেণ্ডার দাতাদের জানিয়ে দেবো যে মন্ত্রী সাহেব আপনাদের চেহারা দেখবার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে নথি ধরে রেখেছেন, আপনারা তাঁর কাছে যান বলেই বের হয়ে আসি।

www.pathagar.com

রাস্তায় নেমে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। অনুভব করলাম, চাকুরী হয়ত থাকবে না। অর্থমন্ত্রী জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন আমাকে ভাল জানতেন। ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার মানসে দুজনকে অবহিত করে রাখা ভাল মনে করলাম। প্রথমে সরাসরি অর্থমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে সবেমাত্র ঘটনাটি বর্ণনা আরম্ভ করেছি। তিনি আমার পিছনে পর্দার ফাঁকে বাইরে আমার মন্ত্রীকে আসতে দেখে বললেন, তোমার মন্ত্রী আসছেন, পেছনের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হও। আমার আর কথা বলা হলো না। তথা. হতে মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিনের বাসভবনে গেলাম। ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই তিনি এবং ইউসুফ আলী চৌধুরী (মরহুম মোহন মিয়া) কথাবার্তায় রত। দেখেই বললেন, কি ব্যাপার, তোমার মন্ত্রীর সাথে মারামারি করে এসেছো না কি? আমার আক্কেল গুড়ুম। সময়ের ব্যবধান হবে ঘন্টা খানেক। জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জানলেন কি করে। মন্ত্রীই টেলিফোনে বলে দিয়েছেন। আমার মন্ত্রীর জানা ছিল এঁরা দুজন আমাকে ভাল জানেন। কাজেই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনিও আমার ন্যায় পূর্ব হতে সতর্ক হতে চলেছেন।

যাহোক, যা ঘটেছে খুলে বললাম। মোহন মিয়া রসিক লোক ছিলেন। উভয়ে বিষয়টিকে রসাত্মক মন্তব্যের সাথে উপভোগ করলেন, আমাকে আশ্বস্ত করে বিদায় দিলেন। চাকুরী অবশ্য হারাইনি তবে ভুগেছি। এই ঘটনা তখনকার কালে সচিবালয়ে ও সরকারী মহলে আমাকে বিশেষভাবে পরিচিত করে তোলে যা ভাল ও মন্দে মিশ্রিত এবং উহার উপাখ্যান লম্বা ও কৌতুকপ্রদ।

৩.১৪ টেণ্ডার নথি সংক্রান্ত ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে বিভাগীয় সচিব জনাব নিয়াজ মোহাম্মদ খান ডেকে পাঠালেন। পদমর্যাদায় সচিব আমার তিন সিঁড়ি উপরে, কাজেই সরাসরি যোগাযোগ বা ডেকে পাঠান স্বাভাবিক রীতি ছিল না। আশঙ্কা ও কৌতূহল নিয়ে হাজির হলাম। গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, মন্ত্রী বাহাদুরের সাথে তোমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছি, কী

www.pathagar.com

ব্যাপার? এক প্রকার হতভম্ব (confused) হয়ে বললাম, বুঝতে পারলাম না আপনার মন্তব্যের অর্থ। রহস্যের হাসিমুখে বললেন, মন্ত্রী তোমাকে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করেছেন। নিজেই দেখে নাও–বলে একটা নথি আমার সামনে খুলে ধরলেন। দেখলাম, আমার চাকুরীর ব্যক্তিগত নথি (personal file) । মন্ত্রীর আপন হাতের লিখন ইংরেজি ভাষায়, বাংলায় অর্থ দাঁড়ায়, এই কর্মকর্তা আমার সাথে সাক্ষাৎকালে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, তার পদাবনতি হওয়া উচিত। যা আশঙ্কা করেছিলাম তা আসন্ন ভেবে সচিবের দিকে করুণ নেত্রে তাকালাম। তিনি জানতে চাইলেন কি হয়েছে। আগাগোড়া বৃত্তান্ত শুনালাম। আমার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় খুবই সন্তুষ্ট হলেন। আশ্বাস দিয়ে বললেন, অমন সৎসাহসের সহিত কাজ করে যাও, দেখি কিভাবে তোমাকে পদাবনত করে। তবে সতর্ক করে দিচ্ছি, কখনো মন্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে না। পদমর্যাদার নীতিতে সচিব পর্যায়ের নিচের কর্মকর্তা মন্ত্রীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ চাকুরী নীতির পরিপন্থী।

পরে জানলাম এবং দেখবার সুযোগও হয়েছিল যে সচিব মন্ত্রীর নির্দেশের নিচে লিখেছেন– The Hon'ble Minister's wishes are noted. Demotion of an officer is grave punishment for which proceedings need to be drawn up, to do so charges are to be framed. Would the H. M. kindly enumerate the charges so that action could proceed as per his desire.

পরবর্তী উপাখ্যান আরও কৌতুকপ্রদ। মন্ত্রী অপরাধের তালিকা (charges) প্রণীত করেন নি বা করতে পারেন নি। সচিবালয়ে দীর্ঘদিন যাবত ইহা আলোচিত ও আলোড়িত হতো।

www.pathagar.com

৩.১৫ ১৯৫৬ সালে শের-এ-বাংলা ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর। আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী। তখনকার বিশ্ব রাজনৈতিক পটভূমিতে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বিপরীত শিবিরে অবস্থানকারী। সেই সময়কার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রসার ও সমঝোতা বৃদ্ধিকল্পে রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের একটা কর্মসূচী প্রচলিত ছিল, যা "লীডার একচেঞ্জ প্রোগ্রাম" নামে অভিহিত। আমার দায়িত্বের অন্যতম কর্মসূচী রূপে দুই পক্ষের মাঝে সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিরসন উদ্দেশ্যে শেখকে রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে নির্বাচন ও আমন্ত্রণের প্রাথমিক পর্যায়ে মন্ত্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় দূতাবাস প্রধানের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরাসরি শেখ সাহেবের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে দিন, তারিখ, সময় এবং স্থান জেনে নিই। তবে কূটনৈতিক নিয়ম কানুনের রীতিতে মন্ত্রীর সচিবালয়ে মন্ত্রীর দৈনন্দিন কার্যতালিকায় উহা লিপিবদ্ধ যথারীতি প্রোটোকলের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল। যা মন্ত্রী নিজেই তাঁর সচিব বা ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদেরকে রেকর্ড করিয়ে রাখবেন বলে আশা করা ছিল। যথাসময়ে কনসাল জেনারেলকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রীকে অনুপস্থিত পাই। ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণ কেহই সাক্ষাৎকারের বিষয় অবহিত নন বলে জানালেন। মন্ত্রী বাহাদুর কোথায় আছেন বা কখন দপ্তরে উপস্থিত হবেন তাও কেউ বলতে পারলেন না। বুঝা গেল, তিনি সাক্ষাতের সময়, তারিখ (appointment) দিয়ে ব্যক্তিগত সচিব বা কর্মকর্তাদের কাছে তা রীতিমাফিক লিপিবদ্ধ করান নি। বিদেশী কূটনীতিকের কাছে আমার জাতীয় নেতৃত্বের চরিত্রে এমন দায়িত্বহীনতার জন্য আমি লজ্জায় ম্রিয়মান ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। যে সম্ভ্রম ও আগ্রহ নিয়ে রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন তা অবজ্ঞায় পর্যবসিত হলো। শ্লেষভরে বললেন, যে ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা ও কূটনৈতিক

www.pathagar.com

আদব কায়দার মূল্য নেই সে পরিস্থিতিতে আমি আর দ্বিতীয়বার আসছি না, তোমার মন্ত্রীকেই দূতাবাসে যেয়ে সাক্ষাতকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক আগ্রহ ছিল। মার্কিন রাষ্ট্রদূতেরও আগ্রহ ছিল একজন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাকে আতিথ্যের সুযোগ দিয়ে দক্ষিণপন্থী মার্কিনী দৃষ্টিভঙ্গীতে আকৃষ্টকরণ, আর আমারও ইচ্ছা ছিল বঙ্গবন্ধুর ঈপ্সিত ভ্রমণটি বাস্তবায়িতকরণ। দুর্ভাগ্য যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং প্রশাসনিক পরিপক্কতার অভাবে এ সম্ভবনায় অনভিপ্রেত অন্তরায় ঘটে গেলো। এর পর সমস্যা দাঁড়ালো কিভাবে পুনঃ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যায়। কুটনৈতিক রীতিতে বিদেশী কুটনীতিককেই স্বাগতিক দেশের সরকারের উচ্চ পর্যায়ে যেয়ে সাক্ষাৎ করতে হয়। মন্ত্রী বা কোন উচ্চপদের কর্মকর্তাকে বিদেশী দূতাবাসে যেয়ে সরকারীভাবে সাক্ষাৎ করা প্রোটোকল বিরোধী ও মর্যাদা হানিকর। প্রথমবার সাক্ষাৎ প্রচেষ্টায় শিষ্টাচার বর্জিতভাবে উপেক্ষিত হয়ে রাষ্ট্রদূত দ্বিতীয়বার যেতে সম্মত নন এবং প্রথমবারের মত আগ্রহও রইলো না। অথচ বঙ্গবন্ধু তখনো আগ্রহী এবং একবারের অনিচ্ছাকৃত নির্দোষ ভুল সংশোধনে ইচ্ছুক। আমিও চাই তাঁর পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণটি কার্যকর হোক। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয় নেমে আসে। মীর্জা একদলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে থাকেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে ঘন ঘন মন্ত্রীসভা বদল হতে থাকে। ১৯৫৮ সালে ৩১ মার্চ গভর্ণর ফজলুল হক কেন্দ্রের চাপে আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন, আবু হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান একের পর এক অল্পদিনের জন্য মন্ত্রীত্ব গঠন করেন আবার বরখাস্ত হন। কিছুদিন পর গভর্ণর ফজলুল হকও অপসারিত হন। চীফ সেক্রেটারী হামিদ আলী ও সুলতান উদ্দিন একের পর এক গভর্ণর হন। প্রাদেশিক আইন পরিষদ ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত ও পরে প্রাণত্যাগ করেন। আইনসভা সাময়িকভাবে বাতিল ও ৯২ (ক) ধারা জারী,

www.pathagar.com

অবশেষে ৮ অক্টোবর সামরিক শাসন জারী ও জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ হন। ২০ দিন পরে আইয়ুব খান শাসনতন্ত্র বাতিল ও রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করে ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পদ অধিকার করেন। আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা বাতিলের সাথে শেখ মুজিবও মন্ত্রীত্ব হতে বাদ পড়েন। এর ৪ বৎসর পূর্বে গভর্ণর চৌধুরী খালিকুজ্জামানের উদ্যোগে জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় শেখ আর একবার মন্ত্রী হয়েছিলেন, তবে ঐ মন্ত্রীসভা মাত্র ২ মাস স্থায়ী ছিল। ঐ সময় আদমজী পাটকল, চন্দ্রঘোনা কাগজ কলে দাঙ্গার ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অপারগতার অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল ও ৯২ (ক) ধারার আওতায় সরাসরি গভর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণর নিয়োগ হন, ফজলুল হক গৃহবন্দী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সাথে বঙ্গবন্ধুও কারারুদ্ধ হন।

যাহোক, এ সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পট পরিবর্তনের মাঝেও বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের প্রস্তাব প্রক্রিয়া চালু থাকে। তবে মন্ত্রীরূপে বিষয়টি যত দ্রুত নিষ্পত্তি হতো একজন বামপন্থী রাজনৈতিক নেতার বেলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগেছে অপেক্ষাকৃত বেশী। যার ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন পরে শেখ মুজিব যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অতিথিরূপে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের আমন্ত্রণপ্রাপ্ত হন এবং যথাসময়ে ঢাকা ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রের পথে মস্কো পৌঁছান। মস্কো অবস্থানকালেই জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বৈরুতে আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ (১৯৬৩, ৫ ডিসেম্বর) পেয়ে ভগ্নমনোরথ অবস্থায় দেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধুর আর সে যাত্রা আমেরিকা যাওয়া হলো না।

৩.১৬ ১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি পরস্পর বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে। কৃষক

www.pathagar.com

প্রজাদলের প্রথম সারির অন্যতম নেতা এডভোকেট রেজা-ই করিম নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রার্থী হন। কিন্তু দলের নেতা এ কে ফজলুল হক সাহেব তাঁকে এড়িয়ে যোগ্যতায় অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় স্তরের নেতা নওয়াব পরিবারের সাহেব-এ-আলমকে মনোনয়ন দিলেন। দলের অভ্যন্তরে অধিকাংশের কাছে ইহা দুর্বোধ্য মনে হলো। মনোনয়নের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠলে হক সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করেন এবং তার জওয়াবও তিনিই দিলেন এ ভাবেঃ ব্যাঙ পকেটে রাখলে স্থির থাকে না, লাফিয়ে বের হয়ে যায়। এক জায়গায় স্থির থাকা উহার স্বভাব নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে একটা পাথরের ভারী নুড়ি যেখানে রাখবে সেখানেই পড়ে থাকবে, উহাকে না সরালে নিজে স্বাভাবিকভাবে স্থান ত্যাগ করবে না। রেজা-ই-করিম ব্যাঙ, বিশ্বাস নেই, কখন দল ত্যাগ করে টের পাওয়া যাবে না। সাহেব-এ-আলম পাথরের নুড়ির ন্যায় যেভাবে রাখবে সেভাবেই থাকবে। না তাড়ালে দল ত্যাগ করবে না।

বিচক্ষণ ও প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা এ কে ফজলুল হক রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তিনি জানতেন দলীয় রাজনীতিতে দক্ষ ও যোগ্য দল নেতার সমর্থনে অতিরিক্ত চালাক চতুর নেতাকর্মী অপেক্ষা বিশ্বস্ত ও অনুগত নির্ভরযোগ্য কর্মীই দলের শক্তি।

৩.১৭ ৫০-৬০ দশকে বিশ্ব রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক বামপন্থী এবং পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ডানপন্থী শিবিরের মাঝে বৈরিতা এবং স্নায়ুযুদ্ধ এত প্রকট ছিল যে ঐ সময়কালে ঢাকায় কোন সরকারী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অথবা সাংস্কৃতিক সমাবেশে সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিশেষ করে চীন দেশের কোন কূটনীতিক উপস্থিত থাকলে মার্কিন কূটনীতিক উপস্থিত থাকতেন না অথবা সংবর্ধনাস্থল ত্যাগ করে চলে যেতেন।

www.pathagar.com

এরকম পরিবেশে আমাদের দেশে বামপন্থী রাজনীতি এবং আমেরিকার কূটনীতির মাঝে বৈরিভাব হ্রাস ও সমঝোতা গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় এক পর্যায়ে আমি ঢাকায় পুরাতন জেলাবোর্ড অফিসের পার্শ্বের গলি কাকুরবাড়ী লেনে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের (মরহুম) বাড়ীতে অবস্থানরত মাওলানা ভাসানী সাহেবের সাথে মার্কিন দূতাবাসের কালচারাল এফেয়ার্স অফিসার মিঃ ডেভিড গার্থের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর উভয় শিবিরের মাঝে আরো ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ এবং মত বিনিময়ের সার্থকতা উপলব্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে কিছুদিন পরে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মাওলানা সাহেব কর্তৃক আহুত ও আয়োজিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে (১৯৫৭ ফেব্রুয়ারী) মিঃ ডেভিড পার্থ আনুষ্ঠানিকভাবে (formally) আমন্ত্রণ গ্রহণ করে "পাক আমেরিকান সংস্কৃতি" শিরোনামে এক ভাষণ দেন, যা বাংলা ভাষায় পুস্তিকা আকারে সম্মেলনে বিতরণ করা হয়েছিল। এশিয়ান দেশ, বিশেষত তদানিন্তন উপমহাদেশে মার্কিন বিদেশী কুটনীতিতে এই প্রথম বামপন্থী রাজনীতিক দলের আমন্ত্রণ সরকারীভাবে গৃহীত হয়। ধীরে ধীরে বরফ গলতে আরম্ভ হয়, আওয়ামী লীগ তথা বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আমেরিকানদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া (allergy) শিথিল হতে থাকে এবং সহনশীল মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করে। সময় ও সুযোগ অনুকূল পেয়ে আমি নেতৃবিনিময় (leader exchange) পোগ্রামের আওতায় বঙ্গবন্ধুর যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের প্রস্তাব করি, যা ৩.১৫ নং উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে।

৩.১৮ ১২.৪৯ উপাখ্যানে আদর্শ প্রচার ও উহার বাস্তবায়নের মাঝে অসঙ্গতি সম্পর্কে আলোচনাকালে এক পর্যায়ে প্রশাসন নিয়ে রচিত আমার এক নিবন্ধ ১৯৫৯ সালে করাচীর ডন পত্রিকার বিপ্লব বার্ষিকী বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর দেশময় প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারই একটি ক্ষুদ্র তবে স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

www.pathagar.com

ঢাকায় আদমজী কোর্টে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র মিশনে আমি চাকুরীরত। একদিন টেলিফোন অপারেটার জানালো যে সেনানিবাস সদর দপ্তর হতে কেউ কথা বলতে চান। পরক্ষণেই অপরিচিত কণ্ঠ জানালেন যে মিঃ সাখাওয়াত উল্লাহর সাথে কথা বলতে চান। আত্মপরিচয় দিয়ে সম্মতি জানালাম। অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর বললেন, আমি জি ও সি ওমরাও খান। বিশ্বাস হলো না। কারণ জিওসির সাথে আমার পরিচয় বা কর্তব্যকর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তদুপরি পদমর্যাদার নিরিখেও উহা অভাবনীয় এবং অবাস্তব মনে হলো। কেহ আমার সাথে রহস্য (joke) করছে মনে করে টেলিফোন রেখে দিলাম। আবার বেল বেজে উঠলো। একই কণ্ঠস্বর, বললেন লাইনটা কেটে গিয়েছিলো। আমি ডন পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধ পড়েছি ইত্যাদি। প্রশংসা ও অভিনন্দন মিশ্রিত মন্তব্য শেষে বললেন, আমার নিজস্ব অভিমত যোগ করে উহার প্রতি প্রেসিডেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এবার চরমভাবে বিশ্বাস করলাম, উপরন্তু রীতিমত ঘাবড়িয়েও গেলাম। কী অভিমত তিনি যোগ করবেন? পক্ষে না বিপক্ষে? দেশে সামরিক শাসন চলছে, চাকুরী করি বিদেশী সরকারের। অনাগত কোন বিপদ আশঙ্কায় সাহস সঞ্চয় করে বললাম, স্যার, আপনার অভিমত প্রকাশের পূর্বে একবার আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী, আমার কিছু কৈফিয়ৎ আছে। সম্মত হলেন, দিন তারিখ ও সময় বলে দিলেন।

নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে কুর্মিটোলা সেনাদপ্তরে ফ্লাগষ্টাফ হাউসে জেনারেল ওমরাও খানের মুখোমুখি হলাম। অফিস কক্ষে আমরা দুজন, বিষয়বস্তু নিয়ে একান্তে অতি সৌজন্যমূলক পরিবেশে আলাপ আলোচনার পর আমার আতঙ্ক কেটে গেলো। চা পানের ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বিদেশী সরকারে কাজ কর কেন? আপন দেশের সেবা করতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের দেশ গড়ার জন্য তোমার মত মানুষ চাই। তুমি দেশের জন্য কাজ করবে? বুঝলাম, জেনারেল সিভিল এডমিনিষ্ট্রেশনের জটিলতা ও বিধি নিয়মের মার

www.pathagar.com

প্যাঁচ সম্বন্ধে অবহিত নন। আমার রচনায় উহার গলদ জানতে পেরে তা দূর করতে উৎসাহিত বোধ করছেন। কিন্তু উহা যে কত দুঃসাধ্য কর্ম তা উপলব্ধি করতে পারেন নি। আমার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা ও দেশের প্রতি সদিচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, জনাব, আপনি আমাকে কি পদে বা কি কাজের মাধ্যমে দেশসেবা করার সুযোগ দিতে পারবেন? আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তা সবাই জানে কিন্তু বলতে পারে না। আমি দেশের প্রশাসনের বাইরে আছি, মতামত ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা আছে বলেই প্রশাসনের ভিতরের কথা বলতে পেরেছি। প্রশাসনের ভিতরে থাকলে কখনই বলতে পারতাম না। এ সকল গলদ দূর করতে হলে প্রচলিত পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার প্রয়োজন। তা করে নতুন নীতি নির্ধারণ করে দিলেও বাস্তবায়ন করবেন তো সেই কর্মকর্তাগণ যাঁরা ঐ সকল গলদের নায়ক। তাঁরা হলেন সচিব ও বিভাগীয় প্রধানগণ এবং সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। আমার প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন করতে আপনি আমাকে কোন বিভাগের সচিব বানাতে চাইলেও তা পারবেন না। আর ঘটনাচক্রে বানাতে পারলেও আমি বাস্তবায়ন করতে পারবো না। কারণ, প্রচলিত প্রশাসনিক যন্ত্র এমন কঠিন জালের (network) কাঠামোর ভিতরে গেঁথে সাজানো আছে যার অদলবদল সহজ নয় এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তবে পরীক্ষামূলকভাবে আমার রচনাটি প্রশাসনের সর্বস্তরে প্রচার করে মতামত আহবান করে দেখতে পারেন।

অবশেষে আমাদের দুজনের মধ্যে এ সমঝোতা হলো যে সংস্কার করতে পারে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান ও সচিবগণ। চাকুরীনীতি বিধানে আমার ন্যায় গোত্রহীন একজন বহিরাগতকে কোন বিভাগীয় প্রধান বা সচিব নিয়োগ করা যাবে না, করতে পারলেও স্থায়ী বাসিন্দারা ঠেলে বাইরে ফেলে দেবে। অতএব বাইরে থেকেই যতটুকু দেশসেবা করতে পারি করতে থাকবো, যদি তিনি সুযোগ দেন। সুতরাং আরো সমঝোতা হলো যে যখনই কোন অনীতি,

www.pathagar.com

দুর্নীতি, অনাচার চোখে পড়ে তা সরাসরি জেনারেলের গোচরে আনলে তিনি তার সৎকার করবেন। আমার ও জেনারেলের মাঝে একটা অদৃশ্য হটলাইন স্থাপিত হলো।

ইহার পর বহু ক্ষেত্রে বহু অনাচার জেনারেলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংশোধিত হয়েছে। তবে কেহ জানতে পারেনি কিভাবে প্রশাসনের আভ্যন্তরীন গলদ উপরতলায় জানাজানি হতে পারলো। অবশ্য আমার পরামর্শ মত রচনাটি প্রচার করতে যেয়ে আমলাতান্ত্রিক বেড়াজালের কারণে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং আমার কথার যথার্থতার প্রমাণ হাতে হাতে পেয়েছেন। জনসংযোগ বিভাগের ডাইরেকটরকে 'ডনে' প্রকাশিত নিবন্ধটি পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করে সমগ্র দেশে প্রশাসনের সর্বস্তরে সরকারী বিবৃতিরূপে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা পালিত হয়নি। গভর্ণর জাকির হোসেন শাসিত সিভিল সরকারের জনসংযোগ ডাইরেকটর উহা প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতির ঘোরপ্যাঁচে ঢুকিয়ে গড়িমসি করতে থাকেন এবং উহা যাতে আর বের হতে না পারে, তার পাকা ব্যবস্থা করেন। সিভিল এডমিনিষ্ট্রেশন ব্যাপারে জি ও সি এবং গভর্ণর জাকির হোসেনের মাঝে প্রায় মতভেদ হতো। কিছুকাল পরে একের পর এক উভয়েই স্থানান্তরিত হয়ে যান। জেনারেল আবদুর রহীম জি ও সি হয়ে আসেন এবং জেনারেল আজম খান আসেন গভর্ণর রূপে। এই দুজনের আমলেও পর্দার আড়ালে থেকে আমি অনেক প্রশাসনিক ও সামাজিক অনাচার নিরসন ও কিছু কিছু জনকল্যাণকর কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, যার স্মৃতি এখনো আমাকে আনন্দ দেয়। উহার কিছু নমুনা উপাখ্যানরূপে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

৪র্থ পরিচ্ছেদ

আইনের ছায়াতলে বিচারের প্রহসন/দিনে বিচারক রাতে অপরাধী

৪.১৯ সময়কাল বৃটিশ আমল। আমার উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক। তিনি বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্মীয় আচার নীতি পালনকারী একজন ধর্মভীরু, উচ্চপদের অধিকারী রাজকর্মকর্তা। তাঁর পরিবারের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর পুত্র আমার সহপাঠি বন্ধু। মাঝে মাঝে বন্ধুর বাড়ী যেতাম, ২/১ দিন ছুটি কাটাতাম। আমার এই বন্ধু কর্মজীবনে জেলা ও দায়রা জজ রূপে অবসর গ্রহণ করে কিছুদিন পূর্বে মারা গেছেন। যাহোক, গভীর রাতে গুনগুন শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতো। বাড়ীর কোন এক ঘর হতে কান্নার করুণ সুরে যেন আকুতি মিনতি শুনতে পেতাম। কে কাঁদে এবং কেন বুঝে উঠতে পারতাম না। যখনই ছুটিতে বেড়াতে যেতাম এ রহস্যময় ঘটনা ঘটতো। অবশেষে একদিন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি। আমাদের উভয়ের বয়স ১২-১৩ বৎসর। বন্ধু জানতো কার এ করুণ মধুর সুর, তবে সেও অবাক হতো ভেবে কেন এই কান্না। ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি জানালো যে বিলাপকারী ব্যক্তি তারই পূজনীয় পিতা, তবে কেন এই বিলাপ তা সে জানে না এবং তা ভেবে সেও ব্যাকুল। আমি যেন আকাশ হতে পড়লাম। সুস্থ সবল, সৌম্যমূর্তি সুপুরুষ, মমতাময়, স্নেহশীল, ক্ষমতা প্রয়োগকারী রাজবিচারকের এমনকি দুঃখ বা কারণ থাকতে পারে যে জন্য গভীর রাতে অন্ধকারে সবাইর অজ্ঞাতে অমন বিলাপ করে? এই রহস্য জানতেই হবে। বন্ধুকে চাপ দিলাম বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে। সেও জানতে চায় কিন্তু সাহস পায় না, আমাকে এগিয়ে দেয়। সুযোগ বুঝে দুজনে একদিন তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে গল্পচ্ছলে প্রশ্ন করলাম, চাচা, অন্ধকার রাতে একাকী ঘরে

www.pathagar.com

আপনি কাঁদেন কেন? মুহূর্তে তাঁর চেহারায় এক অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি ঝলসিয়ে গেলো। মনে হলো গোপন অপরাধ ধরা পড়ে গেছে, রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। যথাসম্ভব নিজকে স্বাভাবিক করে আমাদের দু বন্ধুকে দু বাহু দ্বারা আকর্ষণ করে প্রথমে আদর করলেন। পরে কোমল স্বরে জানালেন, কোর্টে বিচারকালে কতজনকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকেন, কাউকে জরিমানা করেন, কাউকে জেলে পাঠান। আবার কাউকে আরোও কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য ওপর স্তরের বিচারালয়ে (দায়রা) সোপর্দ করেন, ফলে কাহারো মৃত্যুদণ্ডও হয়ে থাকে। অথচ তিনি স্বয়ং জানেন না, যে জন্য শাস্তি দিলেন ঐ ব্যক্তি সত্যিই সেই অপরাধ করেছে কি না, তাই সর্বজ্ঞ ও ন্যায় বিচারক আল্লাহতালার উদ্দেশ্যে ক্ষমা চেয়ে আবেদন পেশ করেন। কৌতূহলী হয়ে মন্তব্য করলাম, অপরাধ করেছে কি না না জানলে শাস্তি দেন কেন? উত্তরে বললেন, আইনের নিরিখে সাক্ষী প্রমাণে অপরাধ সাব্যস্ত হলে আইনের বিধানমতে নির্দেশ দেয়াই বিচারকের কর্তব্য। কিশোর জীবনের উক্ত ঘটনা আমার মনে চিরকালের জন্য গভীর দাগ কেটে দেয়। কর্মজীবনে যখনই কোন জটিল, বিশেষ করে মানবিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত শেষে সই করার কালে ঐ ঘটনা মানসপটে ভেসে ওঠতো। অনেক ভেবেচিন্তে যথাসাধ্য আত্মপ্রত্যয় অর্জন করেই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতাম। যথাসম্ভব সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এই ঘটনা আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাতো। বিচারক তো অসংখ্য আছেন কিন্তু কয়জন এমন মানসিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী?

৪.২০ একজন আইন ব্যবসায়ীর বাহির দহলিজে বন্ধুদের সাথে আমরা গল্পে লিপ্ত। অকস্মাৎ এক নারীর আর্তচিৎকারে চমকিত হয়ে দেখি উদ্ভ্রান্ত আলুথালু কেশী এক দুঃস্থা নারী ৬-৭ বৎসর বয়সী একটি সন্তানের হাত ধরে উকিল সাহেবের বসত ঘরের সিঁড়িতে আপন মাথা আছড়াতে আছড়াতে কান্না ও অভিসম্পাতের ভাষায় বলছে, তুই আমাকে ও আমার সন্তানকে গৃহছাড়া করেছিস, খোদা যেন তোর সন্তানকে গৃহহারা ও পথের ফকির করে। বাড়ীর

www.pathagar.com

সবাই জড় হলো। উকিল সাহেবও উৎকণ্ঠিতভাবে এসে মহিলাকে সান্ত্বনা দিতে এবং ব্যাপারটি কি জানতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে পর জানা গেলো উকিল সাহেব ঐ নারীর বিপক্ষে তার মক্কেলের সপক্ষে মামলা পরিচালনা করে জিতেছেন, যার ফলে নারী আপন গৃহ হতে বিতাড়িত হয়েছে। কোন আর্থিক দায়দায়িত্বের কারণে উচ্ছেদের (ejection suit) মামলায় বিধবা নারীকে তার ভিটেবাড়ী হতে বিতাড়িত করা হয়েছে। তার আর কোন আশ্রয় নেই। তখনকারকালে দেনা বা খাজনা আদায়ের জন্য গৃহ বা বসতবাড়ি বাজেয়াপ্ত ও উচ্ছেদ হতো। গৃহহারা এই নারীকে কেহ বুঝিয়েছেন এবং সেও বুঝেছে যে ঐ উকিল সাহেবই এই জন্য দায়ী। উকিল সাহেব পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কেলের (client) পক্ষে জীবনে হয়ত অনেক মামলায় জিতেছেন, হয়ত কোন কোন মামলায় হেরেও থাকবেন, যা একজন আইনজীবীর জীবনে স্বাভাবিক। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় তিনি মর্মাহত, জিতেও মনে হলো নিষ্ঠুরভাবে পরাজিত। অনুশোচনায় আইন ব্যবসায়ের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওকালতি ছেড়ে দিলেন। দুঃস্থা নারী ও তার সন্তানকে চিরকালের জন্য আপন পরিবারে আশ্রয় দিলেন, পুনর্বাসিত করলেন। নিজেও একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে অবশিষ্ট কর্মজীবন কাটান। মামলার দাবীটা মিথ্যা ছিল এবং উকিল সাহেব তা জানতেন। ঘটনাটি তার জীবনে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

৪.২১ আমার বাল্যজীবনে অনুরূপ আর একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে চাই। উচ্ছেদের মামলায় ফরিয়াদী জিতে হাতি দ্বারা বিবাদীর বসতঘর ভেঙে হাতির পায়ের নীচে দাবিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে দেখলাম। গৃহের মালিক স্ত্রীপুত্র ও বিছানা, তৈজসপত্র নিয়ে পার্শ্বের বাগানে মাথা কুটে কাঁদছিল। এ পর্যুদস্ত পরিবার কিছুকালের মধ্যে কোথায় চলে যায় আর জানতে পারিনি। তবে দোর্দণ্ড বিজয়ীর প্রতিপত্তি সময়ের আবর্তে ধীরে ধীরে লোপ পায়। সমাজে ঘৃণার শিকার এবং তার সন্তানদের অনাহারে কষ্ট ভুগতে ও পরের

www.pathagar.com

অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে জীবন যাপন করতে দেখেছি পরবর্তী ৫০ বৎসর সময়ের ব্যবধানের মধ্যে। অসহায় ও দুর্বলের উপর সবলের এমন অত্যাচার বিভিন্নভাবে এখনোও চলে, কিন্তু কেহ তাতে বিচলিত হয় না কিম্বা শিক্ষা গ্রহণ করে না।

৪.২২ উল্লিখিত দুটি ঘটনাতে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের ফলে দুটি পরিবার গৃহহারা হয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণে ইহা অমানবিক প্রতীয়মান হবে। কিন্তু এই অমানবিক পরিণতি ঘটেছে প্রচলিত আইনের বিধানসম্মত বিচারের ফলে। বিচারক নিশ্চয় আইনের নিয়মকানুন পালন করে সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করে দেখে বুঝে মানব পরিবারকে গৃহ হতে বিতাড়িত করবার রায় প্রদান করে ন্যায় বিচার করেছেন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকবেন। প্রকৃতই কি ন্যায়বিচার হয়েছে? না হয়ে থাকলে বিচারককে কি দোষারোপ করা যায়? মৌখিক সাক্ষী, দালিলিক প্রমাণে মিথ্যা সত্য প্রমাণ হলেই কি ঘটনাকে সত্য বলা যাবে? ৪.১৯ নং ঘটনায় একজন ন্যায় বিচারকের মহাবিচারকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে করুণ আর্তনাদের কথা স্মরণযোগ্য। একজন আইনজ্ঞের নৈতিক পেশা হওয়ার কথা বিচার কার্যে আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা সত্য উত্থাপিতকরণ এবং ন্যায় বিচারে বিচারককে সহায়তা করণ। বিষয়বস্তু মিথ্যা জেনে উহাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য মামলা পরিচালনা করতে কোন আইনজীবী অস্বীকার করেন কি? এই অস্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া না গেলেও অথবা এমন আইনজীবী থাকা দুস্কর হলেও আমার জীবনে এমন দুজন আইনজীবীকে আমি দেখেছি। ৮.৩৬ নং ঘটনার নায়ক মন্ত্রী আবদুল করিম সাহেব কুমিল্লা সদরে তাঁর সময়কালে একজন প্রথিতযশা আইনজীবী ছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে কোন বিষয়ে মামলা পরিচালনের জন্য উপস্থিত হলে মামলা সংক্রান্ত বৃত্তান্ত শুনবার আগেই তিনি নির্দিষ্ট ফির অর্থ নিতেন। পরে বিষয়বস্তু শুনে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজ দলিল পত্র রেখে তিনি ঐ মামলা পরিচালনা করবেন কি করবেন না

www.pathagar.com

সে সিদ্ধান্ত পরের দিন জানাবেন বলে আগন্তুক মামলা প্রার্থীকে বিদায় দিতেন। মামলার বিষয়বস্তু সত্য কি মিথ্যা, সত্য ও মিথ্যার পরিমাণ বা মাত্রা কত ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে মিথ্যার উপর ভিত্তি করে মামলা পরিচালনা করতে অস্বীকার করে পূর্বদিন গৃহিত ফির অর্থ ও কাগজপত্র পরের দিন ফেরৎ দিতেন। এই নীতির অনুসারী আমার পরিচিত অপর একজন আইনজীবী ছিলেন চট্টগ্রাম সদরের জনাব ওবায়দুন্নুর সিদ্দিকী। ইনিও সম্পূর্ণ অলীক অমানবিক বিষয়বস্তু নিয়ে কারো পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে অস্বীকার করতেন, গৃহিত ফি ফেরত দিতেন। ইনি কিছুকালের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

৪.২৩ সরকারী বাসভবনের বারান্দায় সংবাদপত্র পাঠের মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ করছিলাম। সম্মুখেই সড়কের অপর পারে সরকারী যানবাহনের কেন্দ্রীয় ডিপো। চারিদিকে কাঁটাতারে ঘেরা। দেখলাম একটা লোক কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে অতি সন্তর্পনে ও চুপিসারে একটি গাড়ীর ব্যাটারী বের করে নিয়ে রাস্তায় অপেক্ষমান ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দিলো। বুঝতে পারলাম সরকারী সম্পত্তি চুরি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ডেকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়া হলো। পরে জানলাম লোকটা গ্যারেজেরই কর্মচারী এবং আইনের চোখে চুরি এবং বিশ্বাসভঙ্গ দুই ধারা অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে। ইহার পরে কি হলো আর শুনিনি এবং ভুলে গেলাম। ইতোমধ্যে আমি বদলী হয়ে চট্টগ্রাম চলে যাই। দীর্ঘকাল পরে চুরির মামলায় প্রধান সাক্ষীরূপে ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য সমন পাই। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একাধিকবার মামলার তারিখ পড়ে, সমন পাই, হাজির হই। মামলা শেষ বা নিষ্পত্তি হয় না। কারণ, কোনবার চূড়ান্ত পুলিশ রিপোর্ট পৌছেনি, আবার কোনবার বিচারক বদলীর ফলে ডি-নোভো বা পিছন হতে পুনরায় শুনানীর তারিখ ইত্যাদি করে প্রায় দুই বছরে ৭-৮ তারিখ শুনানীর পর অবশেষে 'প্রমাণের অভাবে' মামলা খারিজ এবং আসামী খালাস পায়। ৭-৮ তারিখে আমার

www.pathagar.com

কর্মস্থল হতে ঢাকা পর্যন্ত সরকারী হারে প্রায় দেড় হাজার টাকা যাতায়াত ভাতা গ্রহণ করি। এই মামলায় অন্যখাতেও সরকারের আরো খরচ হয়ে থাকবে। অথচ তখনকার দিনে (১৯৪৮ সালে) একটা ব্যাটারীর মূল্য ছিল একশত টাকার নিচে।

ব্যাটারী চুরি হয়েছে সত্য, চোর চোরাইমাল সমেত হাতেনাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাও সত্য। বৎসরাধিককাল বিভিন্ন তারিখে বিচারালয়ে খুঁটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিচার বিবেচনার পর চুরি সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলো না। বিচারের ফল দাঁড়ালোঃ চোরাই মালের মূল্যের বহুগুণ অধিক সরকারী অর্থ ব্যয় হলো, ব্যাটারীও গেলো, বিচারের সারমর্ম দাঁড়ালো চুরি হয়নি বা চোর অপরাধ করেনি।

এই প্রসঙ্গে ৪.১৯ নং ঘটনার বিচারক সাহেবের মন্তব্য স্মরণযোগ্য এবং অনুধাবনীয়। আইনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার আইনেরই ঘোরপ্যাঁচে জড়িয়ে অবিচার বা বিচারহীনতায় পরিণত হয়। ইহার প্রতিকার বা কিছু উপশম খুঁজে পাওয়ার দাবী রাখে কি না, চিন্তাশীল পাঠককে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই।

৪.২৪ ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে আইন পরিষদের উপ নির্বাচনে ভাষা সৈনিক জনাব শামসুল হক নির্দলীয় প্রার্থীরূপে জয়লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারী দলের প্রার্থী পরাজিত হন। কিন্তু নাজিমউদ্দিন সরকার কর্তৃক তাঁকে পরিষদে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। তাঁর বিপক্ষে পক্ষে মাওলানা ভাসানীর একটি ইশতেহারে মাওলানার স্বাক্ষর জাল করে জয়লাভের লক্ষ্যে অসৎ পন্থা অবলম্বনের অভিযোগ এনে নির্বাচন বাতিলের মামলা দায়ের করা হয়। তিনজন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিকে সংসদে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে।

www.pathagar.com

বিচারকমণ্ডলী তখনও জানতেন না অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছে কি করেনি। বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযোগ বিচার বিশ্লেষণ করবার পূর্বেই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে কার্যতঃ ধরে নিয়ে নাগরিক অধিকার ও পরিষদ সদস্যের অধিকার প্রাপ্যে বাধা নিষেধ আরোপ কি ন্যায়বিচার হলো? বৎসরকাল বিচার চলার পর শামসুল হক নির্দোষ প্রমাণিত হন, ট্রাইব্যুনাল নির্বাচন বাতিলের মামলাটিই বাতিল ঘোষণা করে। নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও জনাব হককে পরিষদে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। ক্ষোভে ও দুঃখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে হক সাহেব প্রাণত্যাগ করেন। জনভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির আইন পরিষদে যোগদান এবং অংশগ্রহণ আইনসম্মত ও বিধিবদ্ধ অধিকার। বিনা বিচারে বা বিচারের পূর্বে সেই অধিকার হরণ ন্যায়বিচার কি না? রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের বিরুদ্ধতা বা শত্রুতা করা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু বিচারের নামে অবিচার তথা নিগ্রহের ফলে একজন মানব সন্তান যদি মর্মাহত ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায় বা প্রাণত্যাগ করে তার বিচার কে করবে? যাঁরা আইনের যথাপ্রয়োগ ও ন্যায়বিচারে সহায়তা করার পেশা গ্রহণ করেন (আইনজীবী) এবং যাঁরা বিচারকের আসনে বসে বিচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, এই সম্পর্কে তাঁদের ভাবনা চিন্তা করার কিছু আছে কি? আবারও ১৯ নং উপাখ্যানের বিরল প্রকৃতির বিচারকের দিকে ইঙ্গিত করা হলো।

www.pathagar.com

৫ম পরিচ্ছেদ
সরকারী চাকুরীতে ব্যক্তি প্রতিভার বিড়ম্বনা

৫.২৫ সরকারী চাকুরীতে ব্যক্তি প্রতিভা কখনো কখনো বিড়ম্বনার কারণ হয়ে থাকে। আমাদের জাতীয় চরিত্রে একটি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি যে ঊর্ধতন ও অধস্তন সহকর্মীদের মাঝে প্রতিভা বা মেধার দ্বন্দ্ব অতি প্রকট। অন্যকথায় উচ্চ ও হীনমনস্কতার ব্যাধি। অধস্তন-কর্মকর্তা যদি কোন ক্ষেত্রে উপরওয়ালার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক কর্মকূশল বা মেধাবী ও জনপ্রিয় হন তবে গুণের স্বীকৃতির বা উৎসাহ লাভের পরিবর্তে সচরাচর লাঞ্ছনাই পেয়ে থাকেন, যদিও কদাচিৎ ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

একটি আধা সরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে চুক্তি ভিত্তিতে (contract) নির্দিষ্ট অংকের মাসিক বেতনে আমি পরিচালকের পদে নিয়োজিত হই। তুলনামূলকভাবে এই মাহিনা টাইম স্কেলে সমপর্যায়ের পদের বেতন অপেক্ষা অধিক। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্থা প্রধানের বেতনের হার ছিল আমার বেতনের নিচে, যেহেতু তিনি স্থায়ী ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য। অতএব বিড়ম্বনা দেখা দিল। সহকারীর পারিশ্রমিক দলপতির পারিশ্রমিকের অধিক হবে এমন অসংগত (?) রীতি কর্তাব্যক্তির অহমিকায় (ego) আঘাত হানে। তিনি কিন্তু একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। সমস্যা (?) সমাধানে হয় আমার বেতন তাঁর বেতনের নিচে নির্ধারিতকরণ নতুবা আমাকে অন্যত্র অপসারণ। দুই প্রচেষ্টাই চলে তবে কোনটিই ফলপ্রসু হয় না। আমার নির্ধারিত বেতন এবং আমি টিকে গেলাম বটে, তবে তিনি একটা অস্বস্তিকর উচ্চমনস্কতায় ভুগতে থাকেন। অধিকন্তু, আমার নির্ভীক কর্মদক্ষতা যেন তাঁর মেধার ওপর ছায়াপাত করতে থাকে।

www.pathagar.com

সময়টা ছিল স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে (১৯৭২)। তখন সমাজ, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য ও প্রশাসনের সর্বস্তরে অরাজকতা বিরাজ করছিল। এমনি পরিবেশে একদিন সংস্থা প্রধানের (চেয়ারম্যান) সভাপতিত্বে ডাইরেক্টর বোর্ডের অধিবেশন চলছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে একদল বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনীর যুবক সভাকক্ষে প্রবেশ করে "কলাবরেটর" বলে সভাপতিকে তুলে নিয়ে যেতে চাইলো। এরকম মানুষ হাইজ্যাক তখনকার দিনে নিত্য ঘটনা। সবাই বিমূঢ়, সভাপতি বাকশক্তি রহিত, নিশ্চল, কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অগত্যা আমি দাঁড়িয়ে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে প্রস্তাব দিলাম যে সভাকক্ষের পরিবর্তে তাঁর চেম্বারে একান্তে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। দৃঢ়তার ফল হলো। কথাবার্তায় জানাগেলো তিনি নাকি পাকিস্তান সরকারের দোসরদের অন্যতম (collaborator), তাই আপাততঃ নিয়ে আটক রাখা হবে এবং যথাসময়ে বিচার হবে। কোন্ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আটক এবং কে বিচার করবেন তার কোন বৈধ প্রমাণ বা উত্তর চেয়ে পাওয়া গেলো না। বুঝা গেলো মুজিব বাহিনী বা রক্ষীবাহিনীরই তৎপরতা। আমি টেলিফোন তুলে বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামালকে জানালাম (তখনও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটক), ফলে সমস্যাটি সমূহ এড়ান গেলো। সশস্ত্র আগন্তুক বাহিনী সেদিনের মত চলে গেলো। সপ্তাহখানেক পরে রাতে কর্তাব্যক্তির বাসভবন হতে টেলিফোনে আমাকে জানানো হলো যে একদল সশস্ত্র যুবক তাঁকে বাসভবন হতে ধরে নিয়ে গেছে, তাঁর মুক্তির জন্য আমি যেন একটা কিছু করি। তাঁর সম্মানিত বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী পুত্র পরিবার শঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন মহলে আমার জানাশোনা এবং আমার পরিবারের যোগাযোগ ছিল। এখানে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ্য যে আমার বিধবা ফুফুর বাড়ীতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাপাতি তরকারী জাতীয় বহনযোগ্য খাবার তৈরী হতো এবং তথা হতে সরবরাহ হতো। রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সকলের অজান্তে কেউ এসে খাবার নিয়ে যেতো। কাজেই বাহিনীর

www.pathagar.com

উপর ফুফুর মমতাময় মাতৃত্বপ্রভাব ছিল। তাঁকে অবহিত করে কর্তা সাহেবকে খুঁজে উদ্ধার করার অনুরোধ জানালাম। পাশাপাশি রাতে অন্ধকারে সম্ভাব্যস্থানে যাতায়াত ও খোঁজাখুঁজির দুঃসাহসিক কাজটার ভার দিলাম পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসানকে (মরহুম)। তিনি তখন আমার তত্ত্বাবধানে প্রধান ডিজাইনারের কাজ করতেন। মুক্তিযোদ্ধামহলে তাঁরও আনাগোনা ছিলো। পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে আমার ফুফুর বাড়ীতে ছিনতাইকৃত বড় সাহেবকে আমার হাতে তুলে দেয়া হয়। আমি তাঁকে নিয়ে তাঁর বাসভবনে স্ত্রী, সন্তান ও বৃদ্ধ পিতার কাছে পৌঁছায়ে দিই।

শ্রদ্ধাবনতচিত্তে জানিয়ে দিতে চাই আমার ফুফু হৃদয়বতী সাহসী মহিলা ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মরহুম ডাঃ শারাফাত আলীর স্ত্রী বেগম নূরজাহান। শারাফাত আলী সাহেব ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কোলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এস ওয়াজেদ আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরিচিত সমাজে ও আত্মীয়দের কাছে ফুফু ছিলেন একজন পর্দানশীন, নিরীহ বিধবা মহিলা এবং নিঃসন্তান। পক্ষান্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় সকলের অজান্তে তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অন্নযোগানদায়িনী মহিয়সী জননী।

উল্লিখিত কঠোর পরীক্ষা (ordeal) হতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমার কর্তাব্যক্তি আমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ, হিতবাদী হবেন এমন আশা করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হলেন বিপরীত। সরকারের উচ্চতম মহলে আমার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র লক্ষ্য করে আমাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা সফলতার পথে প্রতিবন্ধক মনে করে তিনি বিরূপ হয়ে পড়েন। যাহোক, কিছুকালের মধ্যেই তাঁকে অপসারণ করা হলো তাঁরই কর্মদোষে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ইনি একজন বিচক্ষণ, দক্ষ, কুশলী সিভিল সারভেন্ট ছিলেন। দুর্দিন কাটিয়ে পরবর্তী সরকারের আমলে পুনরায় ক্ষমতার উচ্চ আসন মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ অলঙ্কৃত করতে সক্ষম হন। নিজে দক্ষ ছিলেন, অপরের দক্ষতারও

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিতেন, তবে তা তাঁর দক্ষতাকে ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ। কনিষ্ঠ সহকর্মীর ব্যক্তিপ্রতিভা বরদাস্ত হতো না, উচ্চমনস্কতা তাঁকে নির্মমভাবে আহত করতো। সেই মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধিন সংস্থার তখনো আমি পরিচালক পদে কর্মরত। আমি যা করেছি প্রতিদানে তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে বৈরিতাই পেয়েছি।

আমার প্রতি তাঁর উক্তরূপ অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব বৈরিতার কারণ নিয়ে অন্তরঙ্গ সরকারী মহলে আলোচনা হতো। তিনি হয়ত অনুমান করেছিলেন যে হয়ত আমারই ইঙ্গিতে তাঁর বিরুদ্ধে অমন ষড়যন্ত্র পাকান হয়ে থাকবে অথবা তাঁকে হটিয়ে আমি তাঁর আসন অধিকার করতে পারি। অবশ্য সর্বজ্ঞ বিধাতা জানতেন প্রকৃত সত্য কি।

৫.২৬ সময়কাল স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে ১৯৭২-৭৩ সাল। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, তাঁর পিতা মাতা ও পরিবার, তাঁর ভগ্নিপতি আবদুর বর সেরনিয়াবাত আমার পরিবারের সাথে ভারত বিভাগের পূর্ব হতেই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিরাজমান। কোলকাতা নিউ পার্ক স্ট্রীটে একই বাড়িতে দোতালায় আমার বাসস্থান এবং একতলায় বঙ্গবন্ধু ও সেরনিয়াবাত পরিবার বসবাস করতেন। দেশ বিভাগের পরে পাকিস্তান আমলেও সেই সম্পর্ক বজায় থাকে।

আলোচ্য সময়ে তাঁত শিল্প রক্ষাকল্পে সুতা ও বস্ত্রকলগুলির উৎপাদন ও সরবরাহনীতি সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে সুতা সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্ব ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় (বিসিক) ন্যস্ত করা হয় এবং উহা আমার কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই নীতি বাস্তবায়নকালে দেখা গেলো বস্তুতঃ উহা ক্ষমতাসীন দলীয় সদস্য ও কর্মীগণের রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে পড়ে। অফিস চলাকালে এরা সারাক্ষণ আমার অফিস কক্ষ দখল করে তাঁদের নির্বাচিত ব্যক্তি বা তাঁদের সুপারিশমত সুতা বরাদ্দ করার জন্য চাপ দিতেন। অথচ প্রণীত

www.pathagar.com

বিতরণনীতিতে সুতা বরাদ্দ পাওয়ার একমাত্র অধিকার তাঁতের প্রকৃত মালিকের। আমি নীতি রক্ষায় অনড়। ফলে কোন কোন দিন গভীর রাত পর্যন্ত আমি অফিসকক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতাম। দিনের পর দিন একই অবস্থা, কোন কাজ করতে পারতাম না। সংস্থার চেয়ারম্যান হতে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত সবাই পরিস্থিতি জানতেন। স্বীকার করতে চাই নীতির প্রশ্নে আমার অনড় চরিত্রের পেছনে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উহ্য সমর্থন ছিল। অবশেষে একদিন চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি নীতিভঙ্গ করব না, সুতা বিতরণের দায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে আমাকে রেহাই দেয়া হোক, নয়তো আমি আর চাকুরী করব না। আমার ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি চেয়ারম্যানেরও সমর্থন ছিল। যেই কথা সেই কাজ, কয়দিন অফিসে গেলাম না। অগত্যা চেয়ারম্যান আমাকে প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব রুহুল কুদ্দুসের কাছে নিয়ে গেলেন এবং সব অবহিত করালেন। মুখ্য সচিব আমার যুক্তি, বক্তব্য ও দৃঢ়তায় মুগ্ধ হলেন বটে তবে শান্ত ভাষায় বললেন, "সময়কাল ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আমরাই বা কি সুখে বা নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করছি? রয়ে সয়ে চলতে হয়। তুমি বরং ছুটি নিয়ে দিন কয়েক বিশ্রাম নাও" চেয়ারম্যানকে ততদিন কার্যক্রম স্থগিত রাখতে উপদেশ দিলেন। অবশ্য আমার অনমনীয়তার ফলে চার সপ্তাহ পরে সুতা বিতরণ দায়িত্ব পালনের জন্য সংস্থার সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে পরিচালক নিয়োগের পর আমি কর্মস্থলে ফিরে যাই।

সরকারী মহলে আমি একগুঁয়ে ঘাড়বাঁকা (stiffnecked) এবং ক্ষমতাসীন নেতা কর্মীদের কাছে উদ্ধত শিরের জন্য দাগী (black listed) হয়ে গেলাম। তবে চাকুরীচ্যুত হইনি। বঙ্গবন্ধু প্রধামন্ত্রী না থাকলে হয়তো হতাম।

৫.২৭ আমার অন্যতম কর্মস্থলের সংস্থাপ্রধান পরিস্থিতি ও পরিবেশের পার্থক্যের দরুণ আমার প্রতি দুই প্রকার ধারণা পোষণ ও আচরণ করতেন।

www.pathagar.com

যতদিন আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন তিনি আমার প্রতি মাত্রারিক্ত সৌজন্য, হৃদ্যতা ও আস্থা রাখতেন, এমনকি আমার যেই গুণ ছিল না, কথাবার্তায় আমাকে সেই গুণেও ভূষিত করতেন। তিনি প্রায় বলতেন আমার না কি (sixth sense) ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। দুবৎসর পরে রাষ্ট্রপ্রধান পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার স্বর্গচ্যুতি ঘটলো।

এই সময় হতে কর্তব্য পালন বিধি নিয়ে অহরহ তাঁর সাথে আমার মতভেদ হতে শুরু করে। ইতোপূর্বে আমার কার্যপ্রণালী তাঁর মনঃপূত ছিল। কোন বিষয়ে অভিমত লিপিবদ্ধ করে তাঁর কাছে উপস্থাপিত করলে বিনা প্রশ্নে সম্মতি স্বাক্ষর দিতেন এবং আমার দক্ষতার প্রশংসাও করতেন। পরিবর্তিত পরিবেশে তাঁর আচরণেরও পরিবর্তন দেখা দিল। কোন কোন নথিতে কি লিখতে হবে বা কোন্ বিষয় কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে তা আমাকে পূর্ব হতে মৌখিক নির্দেশ দিতে থাকেন। উদ্ধেশ্য, তিনি যা চাইতেন তা যদি তাঁর জন্য সুবিধাজনক অথচ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তবে যেন উহা আমারই অভিমত ও পরামর্শরূপে বুঝা যায় এবং সিদ্দান্ত ভুল হলে অপরাধ এড়ানো যায়। আপন কর্তব্যপালনে অপর কাহারো নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন আমার চরিত্রের বিপরীত বৈশিষ্ট্য। আমি বিবেক খাটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে সুচিন্তিত অভিমত লিপিবদ্ধ করে দিতাম। উধ্বতন কর্তৃত্বাধিকারী আমার মতামত গ্রহণ অথবা অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু আমার মূল্যায়ন ও স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার হারাতে সম্মত ছিলাম না। তিনি লিখিতভাবে আমার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করতে চাইতেন না, বা সাহস করতেন না। ফলে আমাদের মাঝে মধুর সম্পর্কে ফাটল দিন দিন বাড়তে থাকে।

অবশেষে তাঁর কাছে আমার মূল্য ও মর্যাদায় এমন ভাটা পড়লো যে অসহযোগিতা ও অবাধ্যতার অজুহাতে আমার স্থানান্তর বা অপসারণের সুপারিশ করতেও দ্বিধা করেন নি। ফল হলো বিপরীত। কারণ আমার আসল

www.pathagar.com

সত্ত্বা (integrity) সচিব, মন্ত্রী ও উচ্চস্তরে পূর্ব হতেই ভালভাবে জানা ছিল। এমনকি কর্তা স্বয়ং কিছুকাল পূর্বেও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বিধাতাও অবশ্য তাঁর অভিপ্রায়ে বাধ সাধেন। আমার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই তিনি স্থানান্তরিত হলেন।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উচ্চপদ অধিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত আচরণই তাঁর উচ্চ মর্যাদার মাপকাঠি

৬.২৮ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর (১৯৬১-৬২) লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান একজন অসাধারণ প্রকৃতির (exceptional) প্রশাসক ছিলেন। উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী যে ব্যক্তি বা নেতার আচরণে ও সান্নিধ্যে সাধারণ মানুষ যতবেশী স্বাচ্ছন্দ ও মুক্ত বোধ করে সেই ব্যক্তি তত মহান। জেনারেল আজম খান ছিলেন তেমন এক ব্যক্তিত্ব। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ভ্রমণ করতেন, জনস্বার্থ সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের সঙ্গে নিতেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি ওয়াকিবহাল হতেন। বরিশাল, খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া জেলায় অনুরূপ এক সরকারী সফরে আমাকেও সাথে নিলেন। আমি ছাড়া অপর সকল সফরসঙ্গী সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন গভর্ণরের সচিব কাজী ফজলুর রহমান, সমবায় রেজিষ্ট্রার একেএম আহসান, জনসংযোগ ডাইরেক্টর সৈয়দ আহমদ, মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আনোয়ার, এডিসি মেজর রিজভী, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ অকিল আহমদ এবং আরও কর্মকর্তা। ঢাকা হতে রকেট ষ্টিমার যোগে এ ভ্রমণ যাত্রা হয়। চলমান জাহাজের বিস্তীর্ণ ডেকে মিনি সমাবেশে সরকারী কর্মকাণ্ড, সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো, যা পরে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে যাচাই করা হতো। উল্লেখ্য যে গভর্ণরের ব্যক্তিগত ষ্টাফ ছাড়া তাঁর সফরসঙ্গী অপর প্রত্যেক কর্মকর্তার সাথে ভ্রমণকালীন সাহায্যের জন্য যার যার পদমর্যাদামানের ভিত্তিতে প্রচলিত সরকারী বিধি মোতাবেক এক বা একাধিক ব্যক্তিগত কর্মচারী, পিয়ন-আরদালীও ছিল। আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তা। তাদের প্রশাসন নীতিতে পিয়ন-আরদালী জাতীয় কোন

www.pathagar.com

সেবকের বিধান নেই। যত বড় পদের অধিকারী হউক না কেন শ্রমের মর্যাদার নীতিতে কর্তব্যপালনকালে নিজের দেখাশোনা নিজেকেই করতে হয়। অবশ্য কর্মক্ষেত্রে উপযোগী পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা এবং ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদানে কার্পণ্য নেই। সুতরাং আমার সাথে কোন সাহায্যকারী ছিল না, যদিও মাহিনা ও আনুসঙ্গিক আর্থিক সুযোগ সুবিধা ছিল আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ বেতনভুকের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশী।

যাহোক, দ্বিতীয় দিন প্রভাতে রকেট ষ্টিমার খুলনা ঘাটে ভিড়লে গভর্ণর ও সাথী সকল কর্মকর্তা তাঁদের মালপত্র যার যার ব্যক্তিগত সাহায্যকারী পিয়ন আরদালীর জিম্মায় রেখে তীরে উঠে জেলা প্রশাসকের ব্যবস্থাধীন যানবাহনে চড়ে গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন। আমি নিজের লাগেজ গুছিয়ে তীরে পৌছতে কিছু বিলম্ব হওয়ার কারণে নিরাপত্তা বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে ভিআইপি গাড়ীর বহর ধরতে পারিনি। অগত্যা কিছুক্ষণ পরে পিয়ন চাপরাাশিদের সাথে মালপত্র বহনকারী পরিবহনে চড়ে নির্দিষ্ট আবাসস্থল-প্লাটিনাম জুট মিলের অতিথি ভবনে পৌছি। ইতোমধ্যে প্রায় একঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আবাসস্থলে পৌছে সফর সঙ্গীদের সাথে আমাকে দেখতে না পেয়ে গভর্ণর সাহেব অনুসন্ধানে আমার অনুপস্থিতির হেতু কারো কাছে জানতে না পেরে চিন্তাশীল ভাবে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় আমি উপস্থিত হই। প্রশ্ন করলেন কোথায় ছিলে এতক্ষণ তুমি? ঢাকা ফিরে যাওয়ার মতলব আঁটছিলে না তো? কৃতার্থ চিত্তে ও হাসিমুখে নিবেদন করলাম, পিয়ন চাপরাশি সাথে নেই কিনা, লাগেজপত্র সামলাতে গিয়ে দলচ্যুত হয়ে পড়ি, তাই। উদার হাসিমুখে আমার পিঠ চাপড়িয়ে সমবেত কর্তাবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, You people should learn the dignity of labour from this adopted American. খুশি হলাম বটে তবে লক্ষ্য করলাম আজম সাহেবের মন্তব্যটি কর্মকর্তাগণের অনেকেরই পছন্দ হয়নি। পরবর্তী নেপথ্য আলাপচারিতায় বুঝা গেলো কেহ কেহ উহাকে

www.pathagar.com

আমলাতান্ত্রিক আচরণের প্রতি গভর্ণরের বিরূপ কটাক্ষ মনে করেছেন। সংরক্ষিত কুলীন পদাধিকারী (cadre) বর্গের সমস্তরে একজন গোত্রহীনের অবস্থান কারো কারো অনুভূতিতে অস্বস্তিকর স্পর্শকাতরতা (allergy) সৃষ্টি হয় বলে মনে হতো। আমি বুঝতে পেরেও না বুঝার ভান করতাম। আমার অসঙ্কোচ বিচরণ ও সাবলীল আচরণ উহাকে আরও জ্বালাময় করে তুললেও পরস্পরের মাঝে বাহ্যিক শিষ্টাচার ও হৃদ্যতায় কোন খুঁত ধরা পড়তো না। পৃথিবীর কোন উন্নত দেশে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ধরনের কেডার আভিজাত্যের ব্যাধি দেখিনি। আজম খানের প্রাণখোলা এ অন্তরঙ্গ আচরণ এ আভিজাত্যবোধের উপর অশণিপাত তুল্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রীতিকর অভিজ্ঞতা প্রকাশের লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। গভর্ণর আজম খান জনসভায় বাগ্মী রাজনৈতিক নেতার ন্যায় দীর্ঘক্ষণ উর্দুভাষায় বক্তৃতা করতেন সাথে তাঁর সচিব কাজী ফজলুর রহমান সেই অনর্গল উর্দু বক্তৃতা প্রতিশব্দ খোঁজাখুঁজি না করে তাৎক্ষণিকভাবে একই ধারায় হুবহু বাংলায় শ্রোতাদের শুনিয়ে যেতেন। তাঁর দ্বিধাহীন নিখুঁত ভাষান্তরের এই প্রতিভায় আমি এবং অনেকেই মুগ্ধ হতেন।

জেনারেল আজম খান সর্বস্তরের জনগণের সাথে আভিজাত্যের উদ্যত আচরণের পরিবর্তে বন্ধুসুলভ মেলামেশার ফলে তাদের অন্তরে একজন প্রিয় জননেতার আসন করে নিয়েছিলেন। এই জনপ্রিয়তা তাঁর পূর্ববর্তী গভর্ণর ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জাকের হোসেনকে ঈর্ষান্বিত ও ভাবান্বিত করে তোলে, যা আজম খানের বিপক্ষে প্রয়োগ করা হয়। আজম খানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আয়ুব খানের জন্য মারাত্মক পরিণতির সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে সময় থাকতে সতর্ক হবার জন্য জাকের হোসেন আয়ুব খানকে বন্ধুসুলভ পরামর্শ দিলেন। মোনেম খান ও অন্যান্য বাঙালী মন্ত্রীরাও এ বিষয়ে ইন্ধন যোগাতো, যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই আজম খান স্থানান্তরিত হন।

www.pathagar.com

জেনারেল আজম খান পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকাল বাঙালীদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়।

৬.২৯ কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হতে বি এ পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে অর্থ শাস্ত্রে এম এ অধ্যয়নে রত হই, সলিমুল্লাহ হলে থাকি। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। এই সময় বৃদ্ধ পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে আমার শিক্ষার ব্যয়ভার বহন তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অনেক অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করি এবং কোলকাতা ফিরে যাই। দিনে চাকুরী করব, রাত্রে পড়াশোনা করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবো মনস্থ করলাম। বিএ পড়বার সময় বেকার হোষ্টেলে বসবাসকালের বন্ধু শাহজাহানের (প্রয়াত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী) কাছে মনের কথা প্রকাশ করে পরামর্শ চাইলাম। তাঁর পিতা বঙ্গীয় আইন পরিষদের ডিপুটি স্পীকার জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। চৌধুরী সাহেব লর্ড সিংহ রোডে অবস্থিত পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপারিনটেনডেন্ট জনাব জাকির হোসেনকে টেলিফোনে আমার বাসনা জানিয়ে একটা কেরানীর চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করলেন, যাতে দিনে চাকুরী করে জীবিকা অর্জন করতে পারি এবং রাতে পড়াশোনা করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পারি। হোসেন সাহেব আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বললেন।

পার্ক সার্কাসের পূর্ব প্রান্তে রেল লাইনের অপর পারে তিলঝলা রোডে অবস্থিত নিজস্ব বাড়ীতে জাকির হোসেন সাহেব বাস করতেন, সেখানে গেলাম। নারিকেল, আম প্রভৃতি গাছে ভরা বিরাট আঙ্গিনার বাগান বাড়ী। তাঁর বাগান করার সখ ছিল। আপন হাতে মালির মত গাছ গাছড়া লাগাতেন ও পরিচর্যা করতেন। গেঞ্জী গায়ে লুঙ্গি পরা খুরপি হাতে সাদাসিধা বেশধারী মানুষ জাকির সাহেবের সাক্ষাৎ পেয়ে মনে মনে প্রীত হলাম। বাগানে মাটি ঘাঁটা ও ফুলের পরিচর্যা অবস্থাতেই আমাদের প্রাথমিক পরিচয়। ঘাসের উপর বসে ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ আলোচনা চলে। শেষের দিকে এক পর্যায়ে

www.pathagar.com

বললেন, তোমার তো চাকুরী হবে না। কেন? তোমার চেহারা ভাল নয়। আমি স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়ে গেলাম। সহায়তাকামী হলেও বয়সে নবীন এবং চিত্তের স্বাধীন সত্ত্বা রুখে ওঠলো। এও বুঝলাম যে আগমন বৃথা, অতএব ছাড়ি কেন? বললাম, স্যার, আমার চেহারা কি আপনার চেহারা অপেক্ষাও খারাপ? আপনার চাকুরী হলো কি ভাবে? আর যায় কোথায়, হাতের খুরপি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার অমন বিদ্রোহী প্রতিক্রিয়া ছিল তাঁর জন্য অপ্রত্যাশিত ও কল্পনাতীত। আত্মম্ভরিতায় আঘাত পেয়ে বললেন,"বড় বেয়াদব ছেলে তো তুমি" কালবিলম্ব না করে বিদায় সালাম জানিয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে ত্রস্তপদে ফিরে আসি এবং শাহজাহান ও তাঁর পিতাকে বিস্তারিত জানাই। উভয়েই ভদ্রলোকের (?) আচরণ শুনে বিস্মিত এবং আমার কাছে অপ্রস্তুত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন, তবে আমার স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ ও হলেন।

একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির অমন উন্নাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমার অন্তরে স্থায়ী ছাপ মেরে দিলো। বেশ কয়েক বৎসর পর পাকিস্তান আমলে তাঁর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান। কোন একটি চাকুরী নির্বাচনী সাক্ষাৎকালে তাঁর মুখোমুখি হই। প্রথমবারের সাক্ষাৎকালে আমার শাণিত উত্তর যে তাঁর মনেও স্থায়ী ভাবে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল এতদিন পরে তা বুঝা গেলো। সেই স্মৃতির ক্ষত অতীতের উদ্ধত ছোকরাকে চিনিয়ে দিলো। সুতরাং এবারও চাকুরী হলো না। অবশ্য ব্যবহার ছিল সংযত এবং যথাসম্ভব শালীনতায় আবৃত। ইহার বেশ কয়েক বৎসর পরে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর, আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কর্মকর্তা। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্যরূপে তাঁর সাথে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ। এবারকার আচরণ ও কথাবার্তা হৃদ্যতাপূর্ণ, অন্তরঙ্গ এবং গম্ভীর। বরাবরের ন্যায় তখনও তিনি উদ্যানপ্রিয়। গভর্ণমেন্ট হাউসের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রকমারী ফুল, ফল,

www.pathagar.com

শাক-সব্জি বাগান দেখাতে দেখাতে বেশ হালকা মেজাজে নানা জাতের গাছ গাছড়ার সমাবেশ ও তাঁদের প্রতি আপন সখের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সুযোগ বুঝে চাপা পড়ে থাকা স্মৃতির ক্ষতে মৃদু আঘাত দিলাম। 'স্যার, আপনার বাগান করবার সখ এবং গাছ পাছড়ার প্রতি মমতায় আমি মুগ্ধ। মনে আছেতো কোলকাতার তিলঝলা রোডে আপনার বাড়ীতে এরকম সবুজ পরিবেশে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও চেনাচিনি? আমি কিন্তু ভুলিনি'। লাট বাহাদুর প্রকৃতই অপ্রস্তুত হয়ে নিজকে গুটাবার প্রয়াসে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিলেন। এতদিনে তাঁর শিক্ষালাভ হয়েছে উপলব্ধি করে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। "দৈনন্দিন খাদ্যে গমের প্রচলন" আমার এই কর্মসূচীতে তাঁর আগ্রহের জন্য প্রশংসা করে বিড়ম্বনা হতে রেহাই দিলাম।

গভর্ণর নিয়োগের পূর্বে জনাব জাকির হোসেন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল ছিলেন। একই সময়কালে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে জি. ও. সি ছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীর কোন সদস্য কর্মরত নহে এমন সিভিলিয়ান পরিবেশে বিধিবহির্ভূত বা নিন্দনীয় কোন আচরণে ধরা পড়লে কঠোর শাস্তির বিধান আছে। আয়ুব খানকে সেনা নিবাসের বাইরে ঢাকা ক্লাবে কোন এক বিশেষ প্রতিকূল ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি হতে পুলিশের আই. জি. উদ্ধার করে তাঁর কৃপাদৃষ্টি ও আস্থা অর্জন করেন। তারই পুরস্কাররূপে পরবর্তী কালে মার্শাল-ল-প্রধান হয়ে আয়ুব খান জাকির হোসেনকে আই. জি. পদ হতে সরাসরি গভর্ণর পদে নিয়োগ করেন (১৯৫৮-৫৯)। একই সময়ে জি. ও. সি. মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন।

শিক্ষা মানুষকে হীন মনস্কতার উর্ধে তুলে থাকে, উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে এবং মহানুভবতার মর্যাদায় উন্নীত করে। তবে কিছু বিরল ব্যতিক্রম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও থাকে, জাকির হোসেন ছিলেন সে ব্যতিক্রম চরিত্রের ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

৭ম পরিচ্ছেদ

আদর্শ এবং বিশ্বাসে ভিন্নমত পোষণকারীর চরিত্র নিষ্ঠার স্বীকৃতি বিরল মানবিক গুণ

৭.৩০ পড়ন্ত বেলায় ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম। খেলার সাথীদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিত যুববয়সী অধ্যাপক এবং ৪.২২ নং উপাখ্যানে উল্লিখিত উকিল সিদ্দিকী সাহেবও ছিলেন। সময়কাল ১৯৪৯। উক্ত যুবক পরে সি এস পি হন এবং বিভিন্ন উচ্চপদ অলঙ্কৃত করেছেন। খেলাচলাকালে মাগরেবের আজান শোনা গেলো। নামাজ আদায়ের জন্য আমি স্বল্পক্ষণের জন্য খেলা বিরতি দিয়ে চলে যাই, খেলা চলতে থাকে। নামাজান্তে ফিরে এসে দেখি খেলা স্থগিত এবং উল্লিখিত দুই ভদ্রলোকের মধ্যে তুমুল বাকযুদ্ধ, যুক্তি, পাল্টা যুক্তি ইত্যাদি। অপর সকলে উপভোগ করছেন। জানলাম জীবনের উঠন্ত বয়সে খেলা ছেড়ে নামাজ পড়তে যাওয়াটা না কি আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা বা ভ্রান্ত কাজ হয়েছে বলে যুবক খেলার সাথী মন্তব্য করলে সিদ্দিকী সাহেব সেই মন্তব্যকে অপরের বিবেকের উপর অনধিকার চর্চা মনে করে আপত্তি করেন। অতএব তর্কযুদ্ধ। অনুধাবনযোগ্য যে দুজনই ধর্মকর্ম বা নামাজ রোজা করেন না এবং ধর্মীয় আচরণ নীতির বিপক্ষে দুজনই সহযাত্রী তবে নীতির প্রশ্নে দ্বিপন্থী। একজন নিজে ধর্মকর্ম বিশ্বাস বা পালন না করলেও অপরের তা অনুশীলন করার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান করেন এবং সহ অবস্থানে বিশ্বাসী, ইনি জনাব সিদ্দিকী। পক্ষান্তরে যুবক অধ্যাপক ধর্মের ব্যাপারে আপন সংস্কার নিয়েই তুষ্ট নন, অপরের স্বাধীন চিন্তাধারা বা বিশ্বাসের ওপর নিজের বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়াকেও তার উচ্চশিক্ষার মাপকাঠি মনে করেন।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষায় দুজন মানুষ একই স্তরে থেকেও ব্যক্তিগত সংস্কার একজনকে উদার মনোবৃত্তির আলোকে পথ দেখালো, অপরজনকে সংকীর্ণ মনোবৃত্তির কুয়াশার দিকে ঠেলে দিলো। ধর্মীয় অনুভূতি ও সংস্কারে উভয়ে একই পংক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়েও মানবিক গুণাবলীর মাপকাঠিতে দুজনের অবস্থান ভিন্ন, নয় কি?

৭.৩১ সময়কাল ১৯৩৮ সাল। কোলকাতা সরকারী ইসলামিয়া কলেজে বি এ ক্লাসে ভর্তি হই এবং বেকার হোষ্টেলে থাকি। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রাক্তন স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরীও একই সময়ে বেকার হোষ্টেলের বাসিন্দা এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ ক্লাসে অধ্যয়নরত ছিলেন। আমরা তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তৎকালীন দৈনিক পত্রিকা Morning News এবং Star of India র সম্পাদক আবদুর রহমান সিদ্দিকী একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও সমাজ কর্মী, চিরকুমার, সংসার বিরাগী, পরহিতৈষী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সমসাময়িক বিশ্ব বিষয়, রাজনীতি, শিক্ষা এবং মুসলিম যুব সামাজিক সমস্যা নিয়ে উন্নত মানের আলোচনা ও মতবিনিময়ে আগ্রহী ছিলেন। ছাত্র সমাজ তাঁর প্রিয় ছিল এবং তাঁর দরবারে হরহামেশা ছাত্র সমাবেশ হতো। সিদ্দিকী সাহেব পরবর্তীকালে একবার পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরও ছিলেন। কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র বন্ধুদের সাথে একদিন আমিও তাঁর চেম্বারে উপস্থিত হই, ইহা প্রথম সাক্ষাৎ। পরিচিতি ও প্রীতি সম্ভাষণ বিনিময়ের পর জানতে চাইলেন আমার জন্মস্থান কোথায়। উত্তরে জানালাম, নোয়াখালী। শোনামাত্র চেয়ারে হেলান দেয়া (relax) অবস্থা হতে সোজা হয়ে বসলেন। হাত বাড়িয়ে করমর্দন ও পাশের একটা আসন দেখিয়ে বললেন, নোয়াখালীর সন্তান, তুমি হয়তো জাননা তোমার পেছনে কি উদ্ভাবনী শক্তি (ingenuity) নিহিত রয়েছে, অষ্টম বেহেশ্‌ত সৃষ্টির মূলে নোয়াখালীবাসীর অবদান রয়েছে। হাসিমুখে ও কৌতুক মিশ্রিত উর্দু ইংরেজী ভাষাতেই কথা বলছিলেন এবং

www.pathagar.com

তাঁর ব্যবহৃত শব্দ, ingenuity র বাংলা রূপান্তর "উদ্ভাবনী শক্তি" আমিই করলাম। অষ্টম বেহেশত সৃষ্টি বাক্যমালা সবাইকে যুগপৎ উৎসুক ও অবাক করলো। অনুধাবন করে তিনিই বললেন, অবাক হলে? তবে শোনঃ

নোয়াখালীর অধিবাসী শ্রমের মর্যাদা (dignity of labour) জানে। এমন কোন পেশা, বৃত্তি (profession) কর্মকৌশল (skill) নেই যা তারা নিষ্ঠার সাথে নির্বাহ করেন না। কায়িক পরিশ্রমকারী দিনমজুর হতে আরম্ভ করে শিক্ষা বিজ্ঞানের উঁচুস্তর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁরা বিরাজমান। সৎ উপার্জনের অনুসন্ধানে সমুদ্র পাড়ি দেয় এবং ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ে বিধাতার সাথেও বোঝাপড়া করে জয়ী হয়। অবশ্য দোষে-গুণে সকল মানুষের ন্যায় তারাও বেহেশত ও দোজখে যাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকেন। উদাহরণ শোনঃ

একজন মানুষ মৃত্যুর পর আল্লাহর দরবারে পাপপুণ্য বিচার অন্তে দোজখে প্রেরণ সাব্যস্ত হয়। দণ্ডাদেশ কার্যকর করার পূর্বে বিধাতা জানতে চান তার কোন অন্তিম ইচ্ছা (last wishes) আছে কিনা, যে রীতি পৃথিবীতেও বিচার শেষে প্রচলিত আছে। উত্তরে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানালো দোজখ কিংবা বেহেশত যাই হোক যেখানে কোন নোয়াখালীবাসী আছে তাকে যেন তথায় পাঠানো না হয়। জীবৎকালে নোয়াখালীবাসীর তাড়নায় সে পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। অন্ততঃ মরণের পরে তা হতে রেহাই পেতে চায়। অতএব যেখানে নোয়াখালীনিবাসী (inmate) নেই, বেহেশত হোক বা দোজখই হোক, সেখানে সে যেতে চায়, ইহাই তার অন্তিম প্রার্থনা। সাত দোজখের যে দোজখে নোয়াখালীর লোক নেই সেখানে তাকে নিয়ে যাবার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ হলো।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে নোয়াখালীর লোক নেই এমন দোজখ একটাও পাওয়া গেলো না। সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণ বিধাতার দরবারে ফিরে এসে তাই নিবেদন করলো। দারুন সমস্যা–ন্যায় বিচারক আল্লাহ তো পূর্বেই তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুমোদন করেছেন। হাকীম নড়তে পারে কিন্তু হুকুম তো

www.pathagar.com

নড়তে পারে না। এই ক্ষেত্রে হাকীম এবং হুকুম কোনটাই নড়ান যায় না। অতএব হুকুম হলো আল্লাহর ন্যায়বিচার ও কর্তৃত্বে যে ব্যক্তির এমন অটল বিশ্বাস সকল অপরাধ ক্ষমা করে তাকে বেহেশতেই পাঠানো হোক, তবে ইহকালের কর্মফল ও সামাজিক পদমর্যাদার ভিত্তিতেই বেহেশত (পরকালে) তার পদমর্যাদা বা শ্রেণী নির্ধারিত হবে। তখন পর্যন্ত বেহেশত ছিল সাতটি, দোজখ ও বেহেশতের সংখ্যা সমান সমান। যাহোক, সব কটি বেহেশত ঘুরে দেখা গেলো কোন বেহেশতে প্রথম শ্রেণী, কোথাও দ্বিতীয় শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণীর নিবাসী রূপে রয়েছেন নোয়াখালীর অধিবাসী। অথবা কোথাও শ্রেণীভুক্ত নিবাসী (status holding inmates) না থাকলেও পরিচারক, বাবুর্চি, ভৃত্য প্রভৃতি অপরিহার্য কার্য (essential service) শ্রেণীর নোয়াখালী অধিবাসী কর্মচারী কোন না কোন বেহেশতে কর্মরত রয়েছেন। আল্লাহর বিচার রায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ স্থান ঐ ব্যক্তির জন্য কোন বেহেশতেও পাওয়া গেল না। পুনর্বার বিচারকের দরবারে তাই নিবেদন করা হলো। অবশেষে পরম দয়ালু ন্যায় বিচারক আল্লাহতায়ালা বিচারের রায় অক্ষুণ্ন রেখে আর একটি (অষ্টম) বেহেশত নির্মাণ করে বিচারাধীন ব্যক্তিকে সেখানেই বসবাস করবার অধিকার দিয়ে নির্দেশ দিলেন।

নোয়াখালীর লোকের কারণেই অষ্টম বেহেশত নির্মিত হলো। আরও কিছু সৎ লোকের স্থান সংকুলান হলো।

এই রূপক গল্পের (allegory) মাধ্যমে জ্ঞানবৃদ্ধ রসিক (Humourist) সিদ্দিকী সাহেব ছাত্রদের যা শিক্ষণীয় (lesson) উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন আমি, আরও অনেকে তা উপলব্ধি করে মানব চরিত্র চিত্রনে তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছি। কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে রূপক ভাষায় উপস্থাপন করায় দক্ষ (knack) ছিলেন তিনি।

www.pathagar.com

৭.৩২ জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবের আর একটি স্বভাবসিদ্ধ সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ রূপক কাহিনী উল্লেখ করছি। কাহিনী বর্ণনাকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন। দেশ বিভাগপূর্ব পরিচিতি।

বৃটিশ ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুখ সুবিধার জন্য একজন অন্যতম নিঃস্বার্থ প্রবক্তা ছিলেন জনাব সিদ্দিকী। প্রথম সারির মুসলিম লীগার হয়েও পাকিস্তান আন্দোলন তথা মিঃ জিন্নাহর দ্বিজাতি ভিত্তিক রাজনীতি দর্শনে তিনি একমত পোষণ করতেন না। কিন্তু মিঃ জিন্নাহর নীতি ও আদর্শে অনমনীয় দৃঢ়তা, নিষ্কলুষ চরিত্র, কঠোর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চিত্ত প্রভৃতি গুণের স্বীকৃতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। রাজনীতি মতাদর্শে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিপক্ষের চরিত্রে অন্যান্য অনুকরণীয় গুণাবলী অকপটে এবং প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে আবদুর রহমান সিদ্দিকীর মত চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ বিরল।

জিন্নাহর দ্বিজাতিক দর্শন অবাস্তব এবং ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য অদূর ভবিষ্যতে কল্যাণকর হবে না তা বিশ্বাস করেও সিদ্দিকী সাহেব মনে করতেন জিন্নাহর আত্মদর্শনে অটল বিশ্বাস ও আপোসহীন মনোবলেরই জয় হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে। লোভ লালসার ঊর্ধ্বে তাঁর (জিন্নাহর) নিষ্কলুষ চরিত্র প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে একটি রূপক গল্প রচনা করে আমাদের শোনালেন যার বর্ণনা এরূপঃ

বাইবেলের মতে বিশ্বস্রষ্টা নাকি জাগতিক ২৪ ঘন্টার পরিমাপের ছয়দিনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি সমাপ্ত করে ক্লান্তি দূর মানসে সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইহুদী ও খৃষ্টান জগৎ সপ্তাহের ৭ম দিন 'সাবাত' বা ছুটি পালন করে থাকে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কোরআন ভিত্তিক বিশ্বাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মাখলুকাত ছয়টি পর্যায়ক্রমিক ধাপে (পার্থিব হিসাবের দিন নয়) আল্লাহতালা সৃষ্টি করেন এবং এই সৃষ্টিধারা

www.pathagar.com

অব্যাহত রয়েছে ও থাকবে। স্রষ্টা নিরাকার ও অবয়বহীন সুতরাং পরিশ্রান্ত হন না, কাজেই তাঁর বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই। তবে বিশ্বপ্রভু মাঝে মধ্যে তাঁর সেরা সৃষ্টি প্রিয় বান্দার আনুগত্য যাচাই করার জন্য কঠোর পরীক্ষা করে থাকেন। এ রকম পরিক্ষেত্রে লোভলালসার ঊর্ধ্বে কঠোর সঙ্কল্প ও সাধনার মাধ্যমে অসম্ভবকে সম্ভব এবং অবাস্তবকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় এমন একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে কি করা যায় ফেরেশতাগণের সাথে পরামর্শ করলেন। সেরা সৃষ্টি মানব চরিত্রে সততা (integrity) পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা ফেরেশতাগণের সাথে সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে (periodic) এ ধরনের পরামর্শ সভা করে থাকেন। এ ধরনের এক পরামর্শ সভায় স্রষ্টাকে কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার এবং সে সময়কালে অন্য কাউকে বিশ্ব পরিচালনের সাময়িক দায়িত্ব (acting responsibility) দেওয়ার পরামর্শ দেয়া হলো। এমন যোগ্য "ব্যক্তি" কোথায়? স্রষ্টার পরে জ্বীন ও মানুষের মধ্যে একমাত্র আশরাফুল মাখলুকাত-মানুষই- এমন গুরুদায়িত্ব নিতে পারে। জিজ্ঞাসুনেত্রে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বলা হলো ভারতবর্ষে এমন চরিত্রের একজন বজ্রকঠিন মানুষ আছেন যাঁকে কোন প্রলোভন দ্বারা সঙ্কল্পচ্যুত করা যায় না, তিনি মিঃ জিন্নাহ। তাঁর যোগ্যতা যাচাই করে দেখবার জন্য দূত হিসাবে জনৈক বিচক্ষণ ফেরেশতাকে বোম্বাই এর মালাবার হিলে জিন্নাহর কাছে প্রস্তাব দিয়ে পাঠান হলো। কঠোর নিয়মানুবর্তী (disciplinarian) সময়নিষ্ঠ জিন্নাহর সাথে পূর্ব হতে সময় চেয়ে (by prior appointment) সাক্ষাৎলাভ করতে হয়। ফেরেশতাদূতের সাক্ষাৎ প্রার্থনার উদ্দেশ্য জিন্নাহর সেক্রেটারীকে অবহিত করা হলো। প্রতি উত্তরে জানান হলো ভারতের মুসলমানদের জন্য একটা পৃথক বাসভুমি সৃষ্টি-পাকিস্তান-আন্দোলন নিয়ে মিঃ জিন্নাহ এত ব্যস্ত রয়েছেন যে অন্ততঃ দু সপ্তাহের পূর্বে অন্য কোন দিকে মন দেয়া বা কারো সাথে সাক্ষাৎ দান অসম্ভব। জানান হলো সাক্ষাৎপ্রার্থী একজন ফেরেশতা, বিশ্বপ্রভুর জরুরী বাণী (special message from God) নিয়ে এসেছেন।

www.pathagar.com

অগত্যা জিন্নাহ সাহেবকে অবহিত করা হলো। অনুমতি পাওয়া গেলো–সারাদিনব্যাপী লিপিবদ্ধ কর্মসূচীর ফাঁকে মধ্যাহ্ন ভোজের টেবিলেই সাক্ষাৎ মিলবে। যথাসময়ে ফেরেশতা সংক্ষেপে বার্তা পেশ করলেন যে, বিধাতার বিশ্রামসময়ে সৃষ্টিজগতের পরিচালনা কাজে অস্থায়ীভাবে দেখাশোনার (officiating) জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তাঁর ওপর এমন আস্থা স্থাপনের জন্য যথারীতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জিন্নাহ সাহেব জানালেন যে পাকিস্তান অর্জন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী বা স্থায়ী খোদাইত্বের কোন পদ গ্রহণ করা দূরের কথা তিনি মরতেও প্রস্তুত নন। ফেরেশতা মুগ্ধ হলেন এবং নিরাশ ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করলেন। সভাসদ ফেরেশতাকুল সমস্বরে অভিমত দিলেন–যে মানুষ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজত্বের (Godship) লোভ প্রত্যাখ্যান করতে পারে বস্তুত এমন ব্যক্তিত্বই ঐ কাজের উপযুক্ত। কারণ এমন নির্লোভ ব্যক্তি একবার একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেও প্রয়োজনের অধিক সময় তা দখল (usurp) করে রাখবে না, অতএব তাঁকেই চাই। তবে তাঁর সংকল্প-পাকিস্তান-অর্জিত না হলে তো তাঁকে পাওয়া যাবে না। অতএব যথাশীঘ্র হয় ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান অনুমোদন করলে তখন আর জিন্নাহ আপত্তি করবেন না। অতএব অবাস্তব বাস্তবে পরিণত হলো। জিন্নাহর একাগ্র ও একনিষ্ঠ সংগ্রাম ও সাধনার ফলে পাকিস্তান লাভ হলো এবং এক বৎসর পরই তাঁর তিরোধান ঘটলো। দেশবাসী যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই স্বাধীনতা পেলো।

রূপককাহিনী সমাপ্তিতে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলেন এভাবে। "স্বাধীন দেশ পরিচালনা করবার মত আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা (integrity) প্রভৃতি অত্যাবশ্যক (essential) গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জনের বহুপূর্বে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানগণ স্বাধীনতা পেয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মাধ্যমে কিন্তু তা পরিচালনা করতে পারছে না। পাকিস্তান টিকে থাকে কি না বলা যায় না। যদি টিকে থাকে তবে তা পাকিস্তানী শাসকদের কৃতিত্বের ফলে নয়, মিঃ জিন্নাহর

www.pathagar.com

আত্মার আশীর্বাদ ও তাঁর গুণমুগ্ধ বিশ্ব সরকার পরিচালকের বিশেষ অনুগ্রহের ফলেই টিকে থাকবে হয়তো। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত করেছেন এবং এখন বিশ্বপালকের সান্নিধ্যে তাঁর বিশেষ সন্তোষ ও আতিথ্য ভোগ করছেন।"

মিঃ সিদ্দিকীর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। যে আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে ও যে উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের দুটি মুসলিম অধ্যুসিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান অর্জিত হলো সেই অখণ্ড পাকিস্তান টিকে থাকলো না। ভারতে ২০০ বৎসর বৃটিশ শাসনামলে বিদেশী শাসকের ছত্রছায়ায় ও যোগসাজসে সংখ্যালঘু মুসলমানের উপর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, শোষণ ও নিপীড়ন হতে মুক্তির লক্ষ্যে প্রথমে ১৪ দফা স্বাধীকারের দাবী, উহা প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতিতে পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। যার অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী সমেত আমাদের পূর্ব অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ভুলে যায় বা উপেক্ষা করে এবং একই শোষণ ও বঞ্চনানীতি পূর্বাঞ্চলবাসীদের উপর চালু রাখে। অন্যায় চিরকাল স্থায়ী হয় না। অতএব পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

বাংলাদেশের বয়স ২৫ বৎসর। বাংলাদেশের মূলসত্ত্বা পরিহার এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি আরোপজনিত আদর্শচ্যুতির ফলে বাংলাদেশও টিকে থাকবে কি না, আমার সে আশঙ্কা ১২শ পরিচ্ছেদে ৪৯ নং উপাখ্যানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৮ম পরিচ্ছেদ
চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নির্ভীক ন্যায়বিচার

৮.৩৩ আমার পিতৃতুল্য জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মরহুম ছালামতউল্লাহ চৌধুরী বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। কর্তব্যপালনে অনড়, আইনের বিধিপালনে অনমনীয় ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক ও সময়নিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজ শাসন আমলেই মুর্শিদাবাদে মহকুমা বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগ মাধ্যমে তিনি জেলার ইংরেজ পুলিশ সুপার মিঃ পোলার্ডকে কোন এক অপকর্মের জন্য কারারুদ্ধ করে ন্যায়বিচার নির্বাহে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আপন শ্যালক জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার কাছে ২০ টাকা মূল্যে তাঁর ঘোড়া বিক্রী করার কথাবার্তা পাকা হয়। কথা ছিল ঘোড়া হস্তান্তরের (physical delivery) পর ক্রেতা মূল্যের অর্থ পরিশোধ করবেন। মৌখিক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যথাসময়ে ক্রেতার প্রেরিত প্রতিনিধির হাতে ঘোড়া হস্তান্তর করা হলো। ঐ ব্যক্তি নিজেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গন্তব্যস্থলে ক্রেতার কাছে পৌছায় এবং ঘোড়ার দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তাকে পানি পান করতে দেয়। ফলে ঘোড়াটি মারা যায়। জেনে রাখা ভাল যে মানুষ কিংবা পশু দ্রুত চলে বা দৌড়ায়ে পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে দেহ ঠাণ্ডা ও ঘাম শুকাবার পূর্বে পানি পান করা মারাত্মক। ঐ ব্যক্তির তা জানা ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চুক্তিমত ঘোড়া বিক্রি মূল্যের অর্থ চেয়ে পাঠালেন। যেহেতু ঘোড়া মারা গিয়েছে ক্রেতা শ্যালক পুলিশ কর্মকর্তা মূল্য পরিশোধ করতে ইতস্ততঃ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চুক্তি আইনের বিধান প্রয়োগ করলেন। বিক্রীত সম্পত্তি ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিয়ে (physical delivery) দাতা চুক্তির শর্ত পালন করেছেন। আইনতঃ গ্রহীতা তার পালনীয় শর্তমূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য। বিক্রীত

www.pathagar.com

সম্পত্তি বহাল তবিয়তে (in good condition) বিক্রেতার দখল হতে ক্রেতার দখলে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। অতএব স্বীকৃত মূল্যের অর্থ বিক্রেতার প্রাপ্য। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেই ক্রেতাকে চুক্তিশর্ত পালন করতে হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা সম্পত্তি ভোগ করতে না পারলেও মূল্য পরিশোধ করেছেন। অবশ্য পরিবর্তিত অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে বিক্রেতা মূল্যের অর্থ মওকুফ করে দিতে পারতেন। এখানে উভয়ে নৈতিকতার সম্মুখীন হন। ক্রেতা রেহাই বা মকুফ না চাইলে মকুফ করার অর্থ অনুকম্পা প্রদর্শন, যা মকুফ প্রাপকের পক্ষে মর্যাদাহানিকর, পক্ষান্তরে মূল্য পরিশোধে আর্থিক অক্ষম না হলে রেয়াৎ চাওয়া তো আত্মপ্রবঞ্চনা। উভয়ের জন্য উভয়পন্থা মর্যাদাহানিকর। চুক্তির বিধান ও আইনের প্রয়োগে কোন সমঝোতা বা compromise নেই। সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আগেকার দিন এবং বর্তমান দিনের ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য কত জাজ্জ্বল্যমানভাবে হীনতার পরিচায়ক তা লক্ষণীয়।

এ দৃঢ়চেতা ন্যায় বিচারক অনেক কিংবদন্তীর নায়ক বলে খ্যাত ছিলেন। নিরীহ পথচারীকে পদাঘাত, অন্যায়ভাবে প্রহার ও দৈহিক নির্যাতনের অপরাধে তিনি ইংরেজ জেলা পুলিশ সুপারকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, যা প্রথমে উল্লেখ হয়েছে।

৮.৩৪ অবিভক্ত বাংলায় ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীসভায় (১৯৩৭-৪১) জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অর্থমন্ত্রী এবং ইংরেজ আইসিএস মিঃ আর এল ওয়াকার তাঁর অধীনে অর্থ সচিব। মন্ত্রী নির্জন অফিসকক্ষে রুর্মে নিমগ্ন, ফাইলে দৃষ্টিনিবদ্ধ। এমতাবস্থায় ওয়াকার সাহেব বিনা সঙ্কেতে কক্ষে ঢুকলেন। মন্ত্রী ক্ষণিকের জন্য কটাক্ষ করে আপন কাজে পুনঃমনোনিবেশ করলেন। কেহ আগমন করেছে বলে বুঝতে পেরেছেন এমন ভাব দেখালেন না অথবা সচিবের উপস্থিতি জেনেই উপেক্ষা করলেন। সচিব ক্ষণেক অপেক্ষা করে আসন গ্রহণ করতে বলা, আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া

www.pathagar.com

অথবা অন্য কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া না দেখে–স্যার, আমি একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই–কথাটি মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে মন্ত্রী ধীরে মাথা তুলে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকালেন এবং শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

'Oh I see!But how could you expect me to have nothing else to do except wait to receive you or anybody at the convenience of the visitor? Don't you have a telephone on your desk, just to lift the receiver and enquire if I am free to receive?'

ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ প্রশাসন ক্ষেত্রে এমন প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য একজন ইংরেজ সচিবের আত্মম্ভরিতায় অপ্রত্যাশিত কঠোর আঘাত বটে। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর কঠোর ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীক নিয়মানুবর্তিতার কাছে তাঁর শিক্ষণীয় ছিল বলে আঘাত হজম করে শান্তভাবে দুঃখ প্রকাশ করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। ইহা ছিল প্রশাসনিক নেতৃত্বের নিয়মানুবর্তিতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

৮.৩৫ এক জেলা শহরে কর্মরতকালে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার বৃটিশ আমলে খান বাহাদুর খেতাবে ভূষিত শ্রদ্ধেয় বর্ষিয়ান ব্যক্তি তাঁর কতিপয় বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। ইহা তাঁর সামাজিক সৌজন্যের নৈমিত্তিক একটা অভ্যাস। সময় নির্দিষ্ট ছিল অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা, তাঁর দৈনন্দিন সান্ধ্য ভ্রমণের পূর্বে। চা আপ্যায়ন পর্ব শেষে নিমন্ত্রিতদের কেহ ঘরে ফিরে গেছেন, কেহ ফিরছেন। যথাসময়ে খান বাহাদুর সাহেব সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ছড়ি হাতে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হয়ে পড়লেন। অদূরে পথে আমন্ত্রিতদের একজনকে তাঁর বাড়ীর দিকে আসতে দেখে শুভেচ্ছা বিনিময়ান্তে আগন্তুকের গন্তব্য কোথায় জানতে চাইলেন। অতিথি আকাশ হতে পড়লেন, মনে মনে ক্ষুণ্নও হলেন হয়তো। বললেন, সে কী? আপনি যে আজ বিকেলে চা খেতে ডেকেছেন।

www.pathagar.com

ওহ্ তাইতো, তবে তাতো ছিলো একঘন্টা পূর্বে, বেলা পাঁচটায়, আপনার বোধ হয় মনে ছিল না। আচ্ছা আবার কোন সময় হবে খন, আজ তাহলে আসি-বলেই ছড়ি ঘুরিয়ে আপন নির্ধারিত কর্তব্য ভ্রমণে এগিয়ে গেলেন।

সময়ানুবর্তিতার এমন কঠোর আনুগত্য অথবা মেকী ভদ্রাচরণের প্রতি উপেক্ষার এমন নজির সচরাচর দেখা না গেলেও উহার মূল্য চিরন্তন এবং মানবচরিত্রের উহা এক অনপনেয় এবং অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য। দৈহিক এবাদত-নামাজ-আদায়ে সময়ানুবর্তিতার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত মহানবী (দঃ) ও তাঁর ভক্ত সাহাবিগণের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হতো। মদীনার মসজিদে নব্বীতে মহানবী নামাজে নিয়মিত ইমামতি করতেন। কখনো কোন কারণে নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে সামান্য বিলম্ব হলে অন্য সাহাবীর নেতৃত্বে যথাসময়ে নামাজ আরম্ভ হয়ে যেতো। হুজুরের প্রতি সম্মান দেখানোর অজুহাতে নামাজে সময়ানুবর্তিতা লঙ্ঘিত হতো না। অথচ বর্তমানে নেতা, গুরু, এমনকি ধর্মগুরুকে সম্মান দেখাবার অজুহাতে নামাজের সময় পার করে দিতে বিবেক বাধে না। আসলে ইহা মেকী সম্মান প্রদর্শন।

৮.৩৬ বৃটিশ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলা সরকারে এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী (মরহুম) খান বাহাদুর আবদুল করীমের সমীপে কতিপয় মুসলমান অভিভাবক উপস্থিত হয়ে এ মর্মে অভিযোগ করলেন যে কোলকাতার একমাত্র মুসলিম মহিলা শিক্ষালয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনজন অবিবাহিতা মুসলমান শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে বয়স্কা ছাত্রীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং মেলামেশার সুযোগ করে দিয়ে তাঁদের কন্যাদের বিপথগামিনী করছেন।

মন্ত্রী বাহাদুর তাঁর দপ্তরের কাছে শিক্ষিকাত্রয়ের নাম জানতে চেয়ে পাঠালেন। নাম সরবরাহ করা হলো। নোট সীটে নামের নিচে মন্ত্রী সাহেব লিখিত নির্দেশ দিলেন যে শিক্ষিকাত্রয় যেন তিন মাসের মধ্যে বিবাহ করেন।

www.pathagar.com

অন্যথায় যেন চাকুরী ছেড়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এই অভূতপূর্ব নির্দেশে সচিবালয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। সরকারী চাকুরী বিধানে অমন বাধ্যবাধকতা আরোপের অবকাশ বা অধিকার নেই। মরহুম খান বাহাদুর মাহতাবউদ্দিন সরকার এবং মিঃ হিউবার্ট গ্রেহাম ছিলেন যথাক্রমে সহকারী সচিব ও সচিব। মন্ত্রীকে বুঝাবার তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মন্ত্রী অটল, অতএব নির্দেশ জারী হলো। ফলও পাওয়া গেলো। দুজন বিবাহ করলেন, অপরজন চাকুরী ছেড়ে চলে গেলেন।

উক্ত নির্দেশে আইনের সমর্থন ছিল না বটে কিন্তু উহার কার্যকারিতার পেছনে ছিল মন্ত্রী ব্যক্তির নৈতিক মনোবল, আপন দায়িত্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অধিকার, ন্যায় কঠোর ব্যক্তিত্ব ও কার্যকারণের যৌক্তিকতা।

www.pathagar.com

মানব চরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান

দ্বিতীয় স্তবক

রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক অঙ্গনে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য

(প্রামাণ্য প্রবন্ধ)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২য় স্তবক

৯ম পরিচ্ছেদ
ইতিহাসের অলিখিত উপকরণ

৯.৩৭ শিল্পাচার্য খেতাব ও খ্যাতির গোড়ার কথা

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ সময়কাল। কলকাতার পার্ক সার্কাসে ১০ নং সাকার্স রো-তে এক কামরা বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ঘরে শিল্পী জয়নুল আবেদীন এবং আমি একত্রে বসবাস করতাম। উভয়ে অবিবাহিত। ইক্‌মিক কুকারে ডিম, আলু, ডাল ও চাল এক সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রান্নায় বসিয়ে আমি পড়াশোনা ও রচনায় লিপ্ত থাকতাম, জয়নুল ডুবে থাকতেন ছবি অঙ্কনে। ইহা ছিল দু জনের অবসর সময়ের সখ, আসলে দুজনই কর্মজীবী। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য দিনে চাকুরী রাতে পড়াশোনা করি। জয়নুল কলকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তখনকার দিনে সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র কর্মকালীন সময় (working hours) ছিল ১০-৫টা। বাসস্থান হতে প্রথম নিউ পার্ক ষ্ট্রীট, পরে পার্ক ষ্ট্রীট ধরে দুজনে একসাথে পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে যেতাম। পার্ক ষ্ট্রীট-চৌরঙ্গী সংযোগস্থলে জাতীয় যাদুঘরের সংলগ্ন আর্টস্কুলে পৌঁছে জয়নুলের পদযাত্রা শেষ হতো। আমি এগিয়ে যেতাম ময়দান, এসপ্ল্যানেড পার্ক অতিক্রম করে ডালহাউসী স্কোয়ারে (লালদীঘি) অবস্থিত সচিবালয়ে (রাইটার্স বিল্ডিং) পৌঁছতাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের মাঝামাঝি সময় পূর্ববাংলা ও কোলকাতা নগরে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত জাপানী বোমা বর্ষণ হয়। স্থলপথে শত্রু আক্রমণ আশঙ্কায় এবং খাদ্যশস্য যাতে শত্রুর হাতে পড়তে না পারে সে লক্ষ্যে দেশীয় মালবাহী

www.pathagar.com

নৌকা ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। ফলে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য বহন বন্ধ হয়ে যায়। দেশের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। উহার চাক্ষুস প্রমাণ কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেখা যেতো, রাস্তায় মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতো আমাদের পথচলাকালে পার্ক ষ্ট্রীটে হোটেলগুলির সম্মুখে স্থাপিত ডাষ্টবিনে উচ্ছিষ্ট ও বর্জিত খাদ্যদ্রব্যের ভাগাভাগি নিয়ে কুকুর, কাক এবং কঙ্কালসার অভুক্ত মানুষের মধ্যে বিবাদের দৃশ্য চোখে পড়তো। এদিকে ওদিকে হৃদয়বিদারী দৃশ্য। ফুটপাথ দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি। কোন কোন স্থানে দুর্গন্ধ এড়াবার জন্য নাকে রুমাল এবং দৃষ্টি নিচে নিবদ্ধ, ক্বচিৎ দু'একটি বাক্য বিনিময়, মানসিক অস্বস্তিকর অবস্থায় পথ অতিক্রম করছি। এক পর্যায়ে হঠাৎ জয়নুল থমকিয়ে পড়লেন, জঞ্জাল স্তুপ হতে একটুকরা সাদা ঠোঙ্গার কাগজ তুলে নিলেন, একটু ইতস্ততঃ তাকিয়ে পড়ে থাকা একটা কাঠকয়লাও তুলে নিয়ে আত্মসমাহিত জয়নুল খচখচ করে কুকুর-কাক-মানুষের খাদ্যকণা নিয়ে লড়াইর দৃশ্য এঁকে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। ডাষ্টবিনের পাশে জীবন্ত মানুষ জন্তু পাখীর চলনশীল দৃশ্য কাঠকয়লার আঁচড়ে কাগজের উপর মূর্ত অবস্থায় দেখে আমি স্তম্ভিত এবং শ্রদ্ধানুরাগে বিমোহিত হয়ে পড়ি। আমার বিস্ময়মুগ্ধ প্রশংসা ও অভিনন্দনে জয়নুল উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে।

এর পর কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভিক্ষের জ্বলন্ত স্বাক্ষর অবলোকন ও তাকে ধরে রাখা জয়নুলের সখ (হবি বা নেশা) হয়ে পড়লো। উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণা নিয়ে মানুষ পশু পাখীর মাঝে কাড়াকাড়ি সম্বলিত দুর্ভিক্ষের দৃশ্য এঁকে চলেছেন তিনি একের পর এক। আমার চারুকলা জ্ঞান ও রুচি এ অভূতপূর্ব সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে না পারলেও ইহা যে এক অমূল্য সম্পদ হতে পারে এমন অনুভূতি বোধ করে বন্ধুমহলে প্রচার করলাম। বিখ্যাত 'লালশালু' উপন্যাসের রচয়িতা (তখনও রচনা করেন নাই) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তখন দৈনিক স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতায় শিক্ষানবিশ।

www.pathagar.com

তাঁর সৌজন্য মাধ্যমে দুই একখানা স্কেচ সম্পাদক আইয়ান স্টিফেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে উক্ত দৈনিকে প্রকাশিত হয়। কোলকাতার সুধীমহলে ও সরকারী পাড়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হলো। অজানা প্রতিশ্রুতিমান শিল্পী জয়নুল আবেদীনের নাম ও যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুকাল পরেই স্টেটসম্যান কর্তৃপক্ষ দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত জয়নুলের আরও ছবি সম্বলিত একখানা পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশ করে যা জয়নুলকে পৃথিবীতে শিল্পাচার্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

স্মরণ ও অনুধাবনযোগ্য যে চিত্রিত পরিস্থিতি ছিল বৃটিশ শাসনামলের এবং দুর্ভিক্ষ ছিল ঐ সরকারেরই সময়কালীন ত্রুটিপূর্ণ বেসামরিক নীতির ব্যর্থতার পরিচায়ক। সে ব্যর্থতা রূপায়িত করে দুনিয়ার সমক্ষে তুলে ধরার জন্য জয়নুল বা স্টেটসম্যান পত্রিকা তিরস্কৃত হননি, বরঞ্চ প্রশংসিত হয়েছেন। জানি না স্বদেশীয় কোন সরকারের আমলে ইহা করা হলে 'রাষ্ট্রের প্রতি জনমনে ঘৃণা উদ্রেকের' অভিযোগে জবাবদিহী হতেন কি না।

আমি শিল্পী নই। চারুশিল্প কর্ম অবলোকন আমার আত্মিক আনন্দ উপভোগ ছাড়া অন্য কোন অবদান রাখার যোগ্যতা ছিল না, এখনও নেই। তবে ভারত-পাকিস্তানের অন্যতম এবং বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর শিল্পচর্চা ও শিল্পীজীবনের সহচর হতে পেরে নিজকে ভাগ্যবান মনে করতাম। শিল্পীর পার্শ্বচর ছিলাম বিধায় তাঁর কীর্তির গুণগ্রাহিতার উপচে পড়া প্রসাদ আমিও ভোগ করে কৃতার্থ বোধ করতাম। শিল্পী না হয়েও নিজের অজান্তে শিল্পীর গুণে আকৃষ্ট ও শিল্প সৃষ্টিতে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি এবং যখনই সুযোগ পেতাম চারুশিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধ্যমত ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালাতাম। ঐ সময় কোলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব মুকুল দে। বিস্ময়ের বিষয় ছিল যে ইনি একজন দক্ষ, প্রখ্যাত ও প্রবীণ শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও চারুকলা বিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁর কার্যাবলী, আচরণ ও নীতি বিদ্যালয় উন্নয়ন ও চারুশিল্প প্রসারের পরিপন্থী ছিল। ফলে বিদ্যালয়ে পাঠক্রম, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক

www.pathagar.com

ছাত্রদের শিল্পকর্ম প্রচার ও প্রদর্শনী ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা অনিয়ম ও দুর্নীতির কবলে পড়ে। জয়নুল এই বিদ্যালয় হতে স্বর্ণপদক পেয়ে কৃতিত্বের সাথে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রতিভাবান ছিলেন বলে এ বিদ্যালয়েই শিক্ষকতার পদলাভ করেন। জয়নুল মুকুল দে'র ছাত্র ছিলেন কিন্তু তাঁর শিল্প প্রতিভা প্রসারে ও প্রকাশে মুকুল বাবু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। শুধু তাই নয়, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ সিংহ প্রভৃতি প্রতিভাবান শিল্পী-শিক্ষকগণও অধ্যক্ষের নিকট হতে গুণগ্রাহিতার পরিবর্তে তাচ্ছিল্য প্রতিবন্ধকতা পেতেন।

আলোচ্য সময়কালে আমাদের (জয়নুল ও আমি) বাসগৃহে সমমনা ও ভুক্তভোগী শিল্পীগণের জমায়েত ও বৈঠক হতো। শফিউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারুল হক, খাজা শফি আহমদ, কামরুল হাসান (পটুয়া) প্রমুখ জয়নুলের ছাত্র ছিলেন তাঁরাও জামায়েত হতেন। পরে যথাসময়ে প্রত্যেকেই চারুকলা বিদ্যালয় হতে ডিগ্রী লাভ করেন এবং কৃতী শিল্পী রূপে পরিচিত ও খ্যাতি অর্জন করেন। মাঝে মধ্যে অছাত্র তরুণ শিল্পী সুলতানও আসতেন। কামরুল হাসান পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থায় প্রধান ডিজাইনার পদে আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী হয়েছিলেন। এঁরা সবাই এবং তাঁদের শিক্ষকবৃন্দ রমেন চক্রবর্তী ও সতীশ বাবুরাও আমাদের বাসভবনে সমবেত হতেন। আর্ট স্কুলে মুকুলদে'র চারুশিল্পকলা বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ, বিদ্যালয়ের অবনতিশীল পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতো। আমি ছাড়া তাঁরা সবাই চারুকলার একই সূত্রে গ্রথিত। অথচ নিজের অজ্ঞাতেই আমিও তাঁদের উদ্বেগের সাথে জড়িত হয়ে পড়ি, কি করে বিদ্যমান অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি নিরসন করা যায়, একান্তে তা নিয়ে ভাবনা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়। সচিবালয়ে কর্মস্থলে কথাবার্তার মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি সংশ্লিষ্ট অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে থাকি। উদ্দেশ্যঃ উপরওয়ালা নীতি নির্ধারকদের অবগতিতে পৌঁছান। আমার কর্মস্থল ছিল শিক্ষা বিভাগ। আর্ট স্কুল শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন যেমন আশা করেছিলাম, শিক্ষা বিভাগ ও দপ্তরে আর্ট স্কুলের কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়লো। সবাই অসমর্থিত গুঞ্জনে অবহিত ও উদ্বিগ্ন

www.pathagar.com

হন। আসল পরিস্থিতি জানবার আগ্রহ প্রবল হয়। কথায় কথায় অসমর্থিত সূত্র রূপে আমি চিহ্নিত হয়ে পড়ি। বেসরকারীভাবে ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করবার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হলো। আমার জন্য কাজটি সহজ ছিল, পূর্ব হতেই অনেক কিছু জানতাম, যার ভিত্তি ছিল মূলতঃ মৌখিক বর্ণনা ও আলোচনা। এক্ষণে সকলের সাথে মেলামেশা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নথিভিত্তিক নির্ভরযোগ্য আরো তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পেশ করি। বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ ডাঃ জেন্‌কিন্‌স্ ছিলেন শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক। আমার ব্যক্তিগত এবং বেসরকারী প্রতিবেদনকে নিয়মিত তদন্তের পূর্বে দৃশ্যতঃ (prima facie) প্রমাণ সাব্যস্ত করে একটা আনুষ্ঠানিক সরকারী তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তদন্তে মুকুলদে'র আর্ট বিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী তৎপরতা প্রমাণিত হলো। তিনি অপসারিত হলেন, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শ্রী রমেন্দ্র চক্রবর্তী অধ্যক্ষ নিয়োজিত হলেন। চারুকলা বিদ্যালয় রাহুমুক্ত হয়ে চারুকলা শিল্প শিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হতে থাকে।

দেশ বিভাগের পরে শিল্পী জয়নুল আবেদীন "অপসন" দিয়ে ঢাকা চলে আসেন। শিক্ষাবিভাগের চাকুরী, তখনকার সময় পূর্ব পাকিস্তানে আর্ট স্কুল অথবা চারুশিল্প শিক্ষা বা চর্চার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখানকার সমসাময়িক সামাজিক পরিমণ্ডলে ছবি আঁকার প্রতি কারো আগ্রহ কিংবা পেশাজীবী চারুকল্প শিল্পের মর্যাদা বুঝবার পরিবেশও ছিল না। শিল্পী আবেদীন একরকম দিশেহারা হয়ে একটা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার কল্পনা এবং সঙ্কল্প নিয়ে শিক্ষিত মহল এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারগণের কাছে ধর্ণা দিয়ে অনেক আবেদন নিবেদন করে অবশেষে সফল হন। সে সময় ডাঃ কুদরত-ই-খুদা ডি পি আই ছিলেন, জয়নুল তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। ইতোপূর্বে জয়নুল জনসন রোডে অবস্থিত ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউটের সৌজন্যে ও বদান্যতায় উহার একটি কামরায় ব্যক্তিগত এবং বেসরকারী পর্যায়ে পূর্বপাকিস্তানে তাঁর প্রথম শিল্পচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। কিছুকাল পরেই সেগুনবাগিচায় একটি পুরাতন ইমারতে গভর্ণর বিচারপতি আমির উদ্দিন পূর্বপাকিস্তানে সর্বপ্রথম সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

www.pathagar.com

করেন। একে একে আবেদীনের শিষ্যবৃন্দ পূর্বোল্লিখিত আনওয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমদ, আমিনুল ইসলাম, খাজা শফি আহমদ শিক্ষকরূপে তাঁর সাথে যোগ দেন। মুখ্যতঃ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সাধনা, অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উল্লিখিত সহকর্মীগণের নিবেদিত সহযোগিতার ফলশ্রুতিতে সেগুনণবাগিচায় প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল পরবর্তীতে শাহবাগের বর্তমান পূর্ণাঙ্গ চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। শিল্পাচার্য জয়নুল নেই, তাঁর সাধনার কীর্তি তাঁরই অমর অবদানের সাক্ষ্য ঘোষণা করছে, আর আপন কীর্তির সার্বক্ষণিক পৃষ্ঠপোষক বা নিয়মিত তত্ত্বাবধায়করূপে তিনি স্বয়ং শায়িত রয়েছেন তাঁর কীর্তির পাশে।

৯.৩৮ ভাষা আন্দোলনের শ্রেণীস্বার্থ ও রাজনৈতিক কোন্দলে জাতীয় স্বার্থ হারিয়ে যাওয়ার অজানা কথা। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলা ভাষার দাবীর প্রাথমিক উদ্যোগ ব্যর্থতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে মিঃ জিন্নাহকে এবং পরোক্ষভাবে খাজা নাজিমউদ্দিনকে দায়ী করা হয়েছে। প্রকৃত পুরো সত্য কি তাই? ইতিহাস, রচনা, বিবৃতি ও পর্যালোচনায় প্রকৃত সত্যের প্রতিফলন ঘটলেও দুটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় কেউ উল্লেখ করেন নি বা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, যা সত্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে জিন্নাহ ও নাজিমউদ্দিন ছাড়াও তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক অংশও মূলতঃ দায়ী ছিলেন এবং ভাষার দাবীর সমর্থনে কারো কারো বস্তুনিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথাও অজানা রয়ে গেছে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের অলিখিত ও অজানা এ দুটি দিক তুলে ধরাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের আবর্তে দলীয় বা ব্যক্তিস্বার্থ মিশ্রিত আদর্শের কোন্দলে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন হারিয়ে যাবার নজির ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও জাতীয় ইতিহাসে বিরল নয়। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার জাতীয় অধিকার বানচাল হওয়ার ঘটনা তেমন একটি অন্যতম নিদর্শন। রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে দেশের আপামর সবাইর যেমন আলো, বাতাস ও খাদ্যে অধিকার আছে

www.pathagar.com

মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার অধিকারও তেমনি সকল মত ও পথের ঊর্ধে সম্মিলিত জাতীয় অধিকার ছিল। খাজা নাজিমউদ্দিন ইহাকে রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে জিন্নাহর সম্মুখে তুলে ধরেন বটে। কিন্তু ভাষার দাবীদার আন্দোলনকারী প্রতিপক্ষও উক্ত চিরন্তন সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে জিন্নাহর কাছে ভাষার দাবীটি রাজনীতির কলুষমুক্ত খাঁটি জাতীয় আদর্শের দাবী রূপে উপস্থাপিত হতে পারেনি। তা পাকিস্তান বিরোধী রাজনৈতিক দাবী বলেই পরিচিত হয় এবং সে কারণেই উপেক্ষিত হয়। নাজিমউদ্দিনের বিশ্বাসভঙ্গ এবং জিন্নাহর ভ্রান্তির জন্য সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চালবাজি এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের সে চালবাজি বুঝতে না পারার কারণই দায়ী ছিল।

ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্যায় এবং দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯৪৭-৪৮ এর প্রথম পর্যায়ে ছাত্র শিক্ষক বুদ্ধিবাদী শ্রেণীই উদ্যোগী হয়ে আন্দোলন শুরু ও পরিচালনা করেন। তখন কিছু রাজনৈতিক সুবিধাবাদীও ইহাতে অনুপ্রবেশ করে। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ১৯৫২ সালের সর্বস্তরের গণআন্দোলন। দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি ছিল সাংস্কৃতিক অপরটি রাজনৈতিক। মিঃ জিন্নাহর কাছে নাজিমউদ্দিন রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যই দেখিয়েছেন, যাতে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধমতবাদীর প্রভাব ছিল, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়নি।

উভয় পর্যায় এবং উভয় বৈশিষ্ট্য মিলিয়েই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। সে ইতিহাস সঠিকভাবে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ইতিহাসকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে না লিখে আপন আপন কামনা বাসনা আর বিশ্বাসের প্রলেপে সাজানো হলে তা সত্য ইতিহাস হয়না। ক্ষেত্র বিষয়ে অতিশয়োক্তি, আপন ভূমিকার অতিরঞ্জন, অপরের ভূমিকাকে খাটো করা অথবা স্মৃতিজনিত ঘটনা ভুল বর্ণনার ফলে ইতিহাস বিকৃত হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা কর্মীগণের সকলের ভূমিকা সমান ছিল না। যাঁরা কোন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন নি তাঁদেরকে আন্দোলনের সৈনিক আখ্যা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

আবার যাঁরা প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তাঁদের অনেকে অজানা রয়ে গেছেন।

বাংলা ভাষার পক্ষে সাংস্কৃতিক পরিচায়ক যুক্তি ছিল যে পৃথক সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক জাতিত্বের ধারণায় বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা বাংলা। যদিও পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানী অধিবাসীদের ভাষা হিসাবে গণনীতির ভিত্তিতেও বাঙলা ভাষার দাবী স্বাভাবিক কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তান অধিবাসীর মধ্যে সীমিত সংখ্যক পাকিস্তান মতবিরোধী ও অন্তর্ভুক্ত ছিল বিধায় এ যুক্তি জিন্নাহকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর কাছে বাংলাভাষার সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা হয়নি। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য ভাষা আন্দোলনের গোড়ার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

বৃটিশ ভারত বিভাগের পর সকল সরকারী কর্মকর্তার সাথে আমিও কোলকাতা হতে ঢাকায় চলে আসি। অফিস করি সচিবালয়ে, বাস করি মেডিকেল কলেজের কাছে অধুনালুপ্ত রেলক্রসিং এর ওপারে সরকারী বাসভবনে। সময়কাল ১৯৪৭, সেপ্টেম্বর মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেম (মরহুম), অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (মরহুম), অধ্যাপক শাহেদ আলী, সৈয়দ শাহাদাত হোসেন এবং নাম মনে নেই এমন আরো কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী সদ্য গঠিত তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে আমার বাসভবনে এক সাহিত্য আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। দিন তারিখ মনে নেই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমার প্রতিবেশী, বাংলা ভাষায় "আল হাদীস" গ্রন্থ রচয়িতা জেলা জজ মাওলানা ফজলুল করিম। এ সাহিত্য সভাতে স্বাধীন পাকিস্তানে রাষ্ট্র ভাষা কি হবে তা নিয়ে প্রথম আলোচনা ও মত বিনিময় হয়। ইহার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে (১ বা ২ সেপ্টেম্বর) তমদ্দুন মজলিশ নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনটি গঠিত হয়। ইহার কয়েকদিন পরে ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে জনাব হাবীবউল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাহিত্য সভায় বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের

www.pathagar.com

সরকারী ভাষা করার দাবী এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা ও তার জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মত ব্যক্ত করা হয়। কয়েকদিন পরে তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ হতে অধ্যাপক কাশেম 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে বাংলাভাষার পক্ষে আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়। তমদ্দুন মজলিশ গঠন এবং উহার মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন চালাবার ধারণার প্রবর্তক ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম আর পূর্বোক্ত ভাষানুরাগীগণ ছিলেন সে ধারণার প্রাথমিক সমর্থক ও প্রত্যক্ষ সহযোগী। আমার বাসভবনে সকল সাহিত্যিককে একত্রিত করার দায়িত্ব ছিল অধ্যাপক শাহেদ আলী ও জনাব সৈয়দ শাহাদাত হোসেনের ওপর। ইহাই ছিল স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের গোড়ার কথা এবং বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনা (মোস্তফা কামাল সংকলিত-ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় শাহেদ আলীর সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য) *

এ ঘটনা ঘটে আজ (১৯৯৭) হতে ৫০ বৎসর পূর্বে, বৃটিশ ভারত বিভাগের অব্যবহিত পরে, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান জন্মের মাত্র মাসখানেক সময়ের মধ্যে। ঐ সময় যাঁরা বালক ও কিশোর, বয়স ১০-১২ বৎসর, জীবিত থেকে থাকলে বর্তমানে তাঁরা ৫৮-৬০ বৎসর বয়সের প্রবীণ। সহজেই অনুধাবনীয় যে তখনকার ১০-১২ বৎসর বয়স্ক কিশোর এবং বর্তমানের প্রবীণ ব্যক্তিগণ জানতেন না বা বলতে পারবেন না অব্যবহিত পূর্বেকার (১৯৩৫-৪৭) রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল এবং কিভাবে ও

---

* প্রশ্নঃ প্রথমে আপনার ওপর মজলিশের কি দায়িত্ব অর্পিত হয়?

উত্তরঃ শাহেদ আলী– সাহিত্যিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। সৈয়দ শাহাদাত হোসেন ছিলেন একাজে আমার সহকারী। এর পূর্বে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মজলিশের তেমন কোন কর্মতৎপরতা ছিল না। বর্তমান মেডিকেল কলেজের পেছনে কাজী সাখাওয়াত উল্লাহ (তখন তিনি ফুড কন্ট্রোলার) সাহেবের একতলা বাড়ীতে আমাদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

কেন ভারত বিভাগ হয়েছিলো এবং ভারত বিভাগ না হলে অর্থাৎ পাকিস্তান না হলে আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো কি না। দেশ বিভাগপূর্ব এবং বিভাগ সময়কালের পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহের সঠিক ও সত্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেই তবে বর্তমান কালের পঞ্চাশ ষাটের কোঠা বয়সী গুণী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিবিদগণ তা উপলব্ধি করতে পারবেন। পৃথক সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পৃথক জাতিত্ব দর্শনের ভিত্তিতেই ভারতীয় মুসলমানের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের জন্ম। পূর্ব পাকিস্তান নাম নেই কিন্তু সেই ভূখণ্ড রয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানগণ, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও মূলসত্ত্বা এখনও অটুট রয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালের সুধী সমাজে এই মৌলিক জাতিসত্ত্বার বিস্মৃতি কিংবা সংশয় অথবা অস্বীকৃতি দেখে সঠিক ইতিহাস লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা কথাবার্তা বলেন কিংবা কৃতিত্বের দাবী করেন তাঁদের অধিকাংশের বয়স ষাটের কাছাকাছি, সে সময়কালের ৭ম-৮ম শ্রেণীর সে সকল কিশোর বিদ্যার্থীগণ কেমন করে তখনকার প্রকৃত পরিস্থিতি জানবেন?

বলা হয়ে থাকে বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রকৃত সত্য তা নয়। রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারীর পাঁচ বৎসর পূর্বে আমার বাসভবনে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত সাহিত্য সভায় এবং তার কয়দিন পূর্বে গঠিত তমদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে। পূর্ণ আন্দোলনে পরিণত হয় ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চে ধর্মঘট মিছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা ও সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে। আর বায়ান্নর ফেব্রুয়ারীতে সে আন্দোলন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রূপ নেয়। স্মরণ রাখা চাই যে প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষামহল, ছাত্র শিক্ষক গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে মিঃ জিন্নাহর ঢাকা আগমনের প্রাক্কালে (১৯৪৮ ফেব্রুয়ারী-মার্চ) ধীরে ধীরে আন্দোলন অন্যান্য ক্ষেত্রে-সাংবাদিক, নারী সমাজ

www.pathagar.com

এবং রাজনীতিতে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ সময়ে মুসলিম লীগে নাজিমউদ্দিন বিরোধী উপদলীয় কিছু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা আপন স্বার্থ উদ্ধার মানসে ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রাম পরিষদে ঢুকে পড়ে। এদের আসল মতলব বুঝতে না পেরে ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাঁদের কুপরামর্শ জালে আবদ্ধ হয়ে যায়।

সরকারী চাকুরী করতাম বিধায় আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তখনকার কোন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করতে পারিনি। তবে রাজনৈতিক ও ভাষা সংস্কৃতি অঙ্গনের নেতৃবৃন্দ ও গুণীজনের সাথে নেপথ্য যোগাযোগ রক্ষা ও সান্নিধ্যলাভে সচেষ্ট ছিলাম। সরাসরি যোগাযোগ এবং প্রথম সারিতে আমার অবস্থান না থাকায় ভাষা আন্দোলনের তখনকার তরুণ এবং বর্তমানের প্রত্যক্ষ প্রবীণ কর্মীদের অনেকেই আমাকে এতদিন পরে স্মরণ করতে, চিনতে বা জানতে পারবেন না এবং আমার এ সত্য প্রকাশে কেহ কেহ সংশয়বোধ করতে পারেন। আবার অনেকে বেঁচেও নেই, যেমন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, কমরদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, শামসুল হক, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম। যে কয়জন এখনও বেঁচে আছেন এবং আমাকে জানেন, যেমন অধ্যাপক শাহেদ আলী, সংগ্রাম পরিষদ আহবায়ক শামসুল আলম (সম্প্রতি তিনিও বিদায় নিয়েছেন), তাঁরা চলে গেলে পরে যদি আমি বেঁচে থাকি এবং এই পুরাতন সত্য কথা বলি, তখন কেহই বিশ্বাস করবেন না। অতএব আর বিলম্ব না করে লুপ্ত হয়ে থাকা সত্য পরিস্থিতিটি প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করি।

যা বলতে চাই তার একটি হচ্ছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীর পক্ষে মন্ত্রী হাবীবউল্লাহ বাহারের অপ্রকাশিত একটি সঠিক অথচ বিফল প্রচেষ্টা, যা কখনো কাউকে বলতে শুনিনি এবং অজানা রয়ে গেছে। অপরটি ছিল ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন কিছু রাজনৈতিক নেতার আপন স্বার্থ উদ্ধার মানসে সমর্থকের ছদ্মবেশে ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনে অনুপ্রবেশ, পরে মিঃ জিন্নাহর

www.pathagar.com

কাছে নাজিমউদ্দিন কর্তৃক ভাষা আন্দোলনের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান এবং ঐক্যবদ্ধ মুসলিম ছাত্র সমাজের সম্মিলিত মতামত উপস্থাপনে ব্যর্থতা। জনাব হাবীবউল্লাহ বাহার জিন্নাহর অন্যতম বিশ্বাসভাজন, অনুগত ও অনুরাগী হয়েও বাংলাভাষায় নিবেদিত খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং বাংলা ভাষার নিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। মন্ত্রীসভার সদস্য থাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রতি খোলাখুলি সমর্থন দিতে পারেন নি, নেপথ্যে যে অবদান রেখেছেন তাই প্রকাশ করছি।

সকলেরই জানা আছে ১৯৪৮ মার্চে গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহর ঢাকা আগমনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন তমদ্দুন মজলিশ ও সংগ্রাম পরিষদের বাংলা ভাষার সম্মিলিত দাবী মেনে নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। চুক্তির শর্ত ছিল (১) পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে প্রাদেশিক সংসদে অনুমোদনকরণ (২) পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষারূপে কেন্দ্রীয় সরকার ও জাতীয় সংসদের কাছে সুপারিশ করে প্রাদেশিক সংসদে প্রস্তাব পাশকরণ। একই সময়ে কারো বোধগম্যের অগোচরে মুসলিম লীগে নাজিমউদ্দিনের বিরোধী কিছু রাজনৈতিক নেতা আপন মতলবে সংগ্রাম পরিষদে ঢুকে পড়ে। এ উপদলীয় নেতাগণ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কৌশলরূপে ছাত্র শিক্ষক ভাষা আন্দোলনের সমর্থক সেজে আপন স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট হন। প্রাদেশিক আইন সভায় স্পীকার নির্বাচন প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের সাহায্যে ভাষার দাবীর নামে তাঁরা মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ব্যবস্থা করেন যাতে নাজিমউদ্দিন হতে তাঁদের দলের ব্যক্তিকে স্পীকার নির্বাচনে মনোনয়ন আদায় করা যায়। তাদের উস্কানীতে ছাত্রগণ চুক্তি বাস্তবায়ন প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপনের পূর্বেই আইন পরিষদ অবরোধ করে বসে। রাজনীতির কূটচাল ভাষা আন্দোলনে ঢুকে পড়ে। চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র কয়দিন পরেই এবং পরিষদে উত্থাপনের সুযোগ না দিয়েই ছাত্রদের এ বিক্ষোভ বা অবরোধ নাজিমউদ্দিনের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। ছাত্রগণ না বুঝেই প্রতারণার ফাঁদে পা দিল। ছাত্রদের চুক্তি উপেক্ষার অজুহাতে

www.pathagar.com

নাজিমউদ্দিনও তাঁর অনিচ্ছাকৃত চুক্তি উপেক্ষা করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সংশ্লিষ্ট রাজনীতিকবৃন্দ উভয় পক্ষকে ধোঁকা দিয়েছেন, নাজিমউদ্দিনকে বুঝালেন যে আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর তাঁদের প্রভাব রয়েছে সুতরাং তাদের নিরস্ত ও সংযত রাখতে তাঁরাই সক্ষম, অপরদিকে ছাত্রদের পরামর্শ দিলেন ভাষার দাবী আদায় নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করতে হলে পরিষদ অবরোধ ও বিক্ষোভ চালু রাখা চাই। তাঁরা মন্ত্রীসভায় স্থান, চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের আশায় ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র সেজে নাজিমউদ্দিনের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন এবং দেখাতে থাকেন যে ভাষা আন্দোলন তাঁদের নেতৃত্বেই চলছে। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্ব জনাব তোফাজ্জল আলী, মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আবদুল মালেক, মিসেস আনোয়ারা আমজাদ প্রমুখ।

এই পটভূমিতে ১৯ মার্চ মিঃ জিন্নাহ ঢাকা আগমন করেন। ভাষা সম্পর্কিত আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি পূর্ব হতেই অবহিত ছিলেন। রাষ্ট্রভাষা পরিষদ পক্ষ হতে জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রস্তুতি চলছিল। সাক্ষাতের পূর্বে নাজিমউদ্দিন জিন্নাহর মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিকল্পে তাঁকে বুঝালেন যে ভাষার দাবী বৃহত্তর স্বাধীন যুক্তবাংলার প্রস্তাবক সোহরাওয়ার্দীআবুল হাশেম শরৎবসু গং এর অনুসারীসহ কতিপয় দেশবিভাগ বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কমিউনিষ্ট ছাত্র নেতাদের বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনসাধারণ উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে মেনে নিবে। স্মরণ রাখতে হবে যে মিঃ জিন্নাহ কঠোর অনমনীয় চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। রাজনৈতিক মতবিরোধীদের কোন যুক্তিই তিনি আমল দিতেন না, তা যতই ন্যায় ও বাস্তব হোক না কেন। নাজিমউদ্দিন ও হাবীবউল্লাহ বাহার উভয়ে জিন্নাহর উক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালভাবে জানতেন। নাজিমউদ্দিন উহার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে জিন্নাহর মনকে পক্ষপাতদুষ্ট করে দিলেন। অপর পক্ষে বাহার সাহেব ছাত্র সমাজের প্রতি জিন্নাহর স্নেহশীল দুর্বলতা, সহনশীলতা ও আগ্রহের কথাও জানতেন। ইহাকেই তিনি নাজিমউদ্দিনের কূটচালের বিপক্ষে গোপনে

www.pathagar.com

এগিয়ে দিলেন এই বলে যে সংগ্রাম পরিষদের দাবীর পাশাপাশি ছাত্র সমাজের মতামত যাচাই করে দেখলে কেমন হয়? জিন্নাহ সাহেব ইঙ্গিত গ্রহণ করলেন এবং পৃথক ভাবে ও একান্তে মুসলিম ছাত্রদের মতামত শুনতে সম্মত হলেন এক শর্তেঃ যেহেতু বিষয়বস্তু একটি-রাষ্ট্রভাষা-তিনি সকল মত ও দলের মুসলিম ছাত্রদের সম্মিলিত একটি প্রতিনিধিদলের সাথে কথা বলবেন।

খাজা নাজিমউদ্দিনের অজ্ঞাতে মন্ত্রী বাহার সাহেবের উদ্যোগে ইপ্সিত ছাত্র প্রতিনিধিদল গঠন ও আলোচ্যসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ ডি কে পাওয়ার ছাত্রনেতা শামসুল আলমকে এক লিখিত সরকারী পত্রে ডেকে পাঠালেন। প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল জিন্নাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে জিন্নাহর মন জয় করার উপস্থাপনা কৌশল (presentation strategy) ছাত্রদের বাতলিয়ে (briefing) দেয়া। দুর্ভাগ্য, সে সুযোগ হয়নি। কারণ, বিভাগপূর্ব সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র রাজনীতিতে মিঃ জিন্নাহর কাছে ছাত্রদের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিহীন একটা পৃথক স্বাধীন সত্ত্বা ও সম্মানজনক মর্যাদা ছিল। অল ইণ্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন এ মর্যাদার অধিকারী ছিল। এই ছাত্র প্রতিষ্ঠান রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখতো, রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতো বটে, তবে স্বাধীন ও নির্ভীক মতামত পোষণ ও কর্মপন্থা অবলম্বন করতো, রাজনৈতিক দল বা নেতাদের নির্দেশ বা অনুপ্রেরণায় চলতো না। সর্বভারতীয় দলীয় রাজনীতি এবং ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্র ছিল তখন পূর্ব বাংলার বাইরে দিল্লী ও কলকাতায়। নিখিল বঙ্গ (প্রাদেশিক) মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রও ছিল কলকাতায়। সেই পর্যায়ের ছাত্র নেতা কর্মীগণ অনেকেই ততদিনে (১৯৪৮) চাকুরী বা অন্য পেশাজীবী হয়ে পড়েছেন এবং কেহ কেহ তখনও কলকাতা হতে ঢাকায় এসে পৌঁছেন নি। বিভাগপূর্ব পূর্ব বাংলার পরিবেশের ছাত্র সমাজ সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

আওতার ও প্রভাবের বাইরে ছিল বিধায় মিঃ জিন্নাহর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং পাওয়ার সাহেবের পত্রের গুঢ় তাৎপর্য বা গুরুত্ব উপলব্ধি করার অবকাশ ঢাকা পর্যায়ের ছাত্র নেতাদের ছিল না। শামসুল আলম মিঃ পাওয়ারের পত্রে সাড়া দেয়নি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাও প্রয়োজন বোধ করেনি। আমন্ত্রিত পত্রের মর্মার্থ ও আসল উদ্দেশ্য বুঝা যেতো যদি জিন্নাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে পাওয়ার/বাহার সাহেবের সাথে আলোচনা হতো। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাবিদগণ আরম্ভ করে থাকলেও পরবর্তীতে রূপান্তরিত রাজনৈতিক নেতাদের ধোঁকাবাজীর ধূম্রজালে ছাত্রদের পৃথক স্বাধীন সত্ত্বা ততক্ষণে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আন্দোলন ক্রমে বামপন্থী প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী কর্মী, নেতা ও দলসমূহের হাতে চলে যায়। পাওয়ার সাহেবের আমন্ত্রণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি না করেই পরস্পরবিরোধী মতাদর্শী ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে মিঃ জিন্নাহর পৃথক পৃথক এবং যুক্তভাবে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এদের মধ্যে কমিউনিষ্ট ছাত্র ফেডারেশনের সদস্যও ছিলেন। পরস্পর রাজনৈতিক আদর্শ মত বিরোধী মিশ্র ছাত্র প্রতিনিধি দলকে অগ্রাহ্য করে মিঃ জিন্নাহ ভাষা নিয়ে আলোচনার পূর্বে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিভেদের পরিবর্তে ঐক্য চেয়ে সম্মিলিতভাবে কথা বলবেন বলে জানিয়ে দিলেন। ইহাই ছিল মিঃ ডি. কে. পাওয়ারের পত্রের অন্তর্নিহিত বাণী, যা ছাত্রদের বুঝবার সুযোগ হয়নি। দলাদলি ও বিভেদ দূর হলো না। জিন্নাহ সাহেব মুসলিম ছাত্রদের যে ঐক্য চেয়ে ছিলেন সে আশা ব্যর্থ হয়ে যায়। সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম ছাত্র প্রতিনিধি দল গঠিত হয়নি এবং বাহার সাহেবের পরিকল্পিত নির্ভেজাল মুসলিম ছাত্রদলের সম্মিলিত মতামতও জিন্নাহর আর জানা হয়নি। যদিও একটি লিখিত স্মারকলিপি তাঁর হাতে দেয়া হয়েছিল যা তিনি উপেক্ষা করেছেন। ছাত্র প্রতিনিধিদল ছাড়া সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে ছাত্র-শিক্ষাবিদ-রাজনৈতিক ব্যক্তির মিশ্র প্রতিনিধি দলেরও মিঃ জিন্নাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যাকে পূর্বাহ্নেই নাজিমউদ্দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী নেতাদের নিজস্ব দাবী বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

নাজিমউদ্দিনের অপব্যাখ্যার বিপরীতে সত্য কী তা জানতে না পেরে পূর্ব হতে লব্ধ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সরল বিশ্বাসে জিন্নাহ রেসকোর্সের জনসভায়, কার্জন হলের সমাবর্তন সমাবেশে এবং ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে রেডিওতে বিদায় ভাষণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন, যার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

বাংলা প্রদেশের ভাষা হবে কি না তা প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন। কিন্তু পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনভাষা নয়। একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই একসূত্রে গ্রথিত হয়ে কোন কার্য নির্বাহ করতে পারে না।

আমি শুনেছি যে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক সুবিধাবাদিরা প্রশাসনকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করছে।

পাকিস্তান আন্দোলনবিরোধী রাজনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদমুক্ত নিছক মুসলিম ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ যুক্তি শোনবার সুযোগ পেলে জিন্নাহ কি সিদ্ধান্ত দিতেন তা কে জানে? কার্জন হলে বক্তৃতার সমাপনিতে কিঞ্চিৎ সমঝোতার সুরে বলেছিলেন যে উহা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত, অর্থাৎ চেপে দেয়ার দম্ভ ছিল না। উহার পর মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্র প্রধানরূপে ভাষা সম্পর্কে আর যে কখনো উচ্চবাচ্য করেন নি তাতে অনুমিত হয় রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল, কোন কোন মুসলিম সংবাদ পত্রের বাংলা ভাষার বিপক্ষে মতামত প্রকাশ এবং সর্বোপরি মুসলিম ছাত্রদের ঐক্যজোটের সাথে মত বিনিময় করার অভিলাষ প্রকাশ করা সত্ত্বেও তা না হওয়ায় হতাশ এবং বিভ্রান্ত চিত্তেই জিন্নাহ ভাষা সম্পর্কে বিরুদ্ধ অভিমত ঘোষণা করেছেন। মরহুম মোহাম্মদ মোদাব্বের তাঁর 'ইতিহাস কথা কয়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে জিন্নাহ না কি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সাথে ঘরোয়া কথাবার্তাকালে দুঃখ করে বলেছিলেন যে জীবনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে দুটি ভুল করেছেন। একটি লাহোর প্রস্তাব সংশোধন, অপরটি–কয়েকজন পূর্বপাকিস্তানী নেতার

www.pathagar.com

দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ভাষা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী অযৌক্তিক ছিল না। (ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন - মোস্তাফা কামাল পৃঃ১৯-৩০)।

বাংলাভাষার পক্ষে আন্দোলন তখনকার সকল শ্রেণীর বাঙালী বুদ্ধিবিদ, সংবাদপত্র ও সাময়িকী হতেও নিরঙ্কুশ সমর্থন ও সহযোগিতা পায়নি। আজাদ, মর্নিং নিউজ, পাসবান, আসাম হিরাল্ড, যুগভেরী বাংলাভাষার বিরোধী মতামত প্রকাশ করতো। পক্ষান্তরে ইত্তেহাদ (কলকাতা), ইনসাফ, জিন্দেগী, দেশের দাবী, নওবেলাল পত্রিকাগুলি ভাষা আন্দোলনের সমর্থক ছিল। জনাব অলী আহাদের ভাষায় বলা যায় বাংলা ভাষা ও বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে কেহ জিন্নাহকে সঠিক ধারণা দেয়নি, বরঞ্চ ভুল তথ্য পরিবেশন করে তাঁকে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। কাজেই ন্যায় ও সত্যের খাতিরে জিন্নাহকে একক দায়ী না করে উল্লিখিত সকল মহল ও ব্যক্তিগণেরই দায়িত্ব স্বীকার করা উচিৎ। ছাত্রসমাজ এবং মিঃ জিন্নাহ উভয়ে না বুঝে ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে জড়িয়ে প্রতারিত হয়েছেন। ফলে মার খেয়েছে ভাষার দাবী। পক্ষান্তরে নাজিমউদ্দিন ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সজ্ঞানে সে প্রতারণা চালিয়ে জিতেছেন। কেউ মন্ত্রী, কেউ রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক আদর্শের কোন্দলে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ হারিয়ে গেলো।

আমার বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত কোন কোন গ্রন্থে, যেমন মোস্তফা কামালের "ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন", বশীর আলহেলালের রচিত "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস", বদরুদ্দিন ওমরের "পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি"। তবে ডি. কে. পাওয়ারের চিঠি এবং পর্দার আড়ালে বাহার সাহেবের প্রচেষ্টা ও পাওয়ারের পত্রের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের উল্লেখ এসব গ্রন্থে কোথাও দেখতে

www.pathagar.com

পাইনি। মিঃ বশীর উল্লেখ করেছেন যে, "জিন্নাহ ঢাকা অবস্থানকালে প্রতিনিধিস্থানীয় ছাত্রদের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন"। কি ভাবে বা কোন মাধ্যমে সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তা বলেন নি। এক যায়গায় বলা হয়েছে মোহাম্মদ আলী ও খাজা নসরুল্লাহ কমরুদ্দিনের কাছে মৌখিক বার্তা বহন করেন। প্রকৃত পক্ষে এঁদের কারোরই জিন্নাহর সাথে কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। নাজিমউদ্দিন পূর্ব হতেই তাদের নীতিদ্রোহী (quisling) বলে জিন্নাহর কাছে পরিচিত করে রেখেছেন। বস্তুতঃ এঁরা নাজিমউদ্দিন ও ছাত্রদের মাঝে স্বঘোষিত মাধ্যমরূপে ছাত্রদের আন্দোলনকে হাইজ্যাক করে উভয় পক্ষকে প্রতারিত করেন। তবে মোস্তফা কামাল তাঁর সংকলনে ৪২৭ পৃষ্ঠায় শামসুল আলমের সাক্ষাৎকারে ডি কে পাওয়ারের পত্রের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর রচনায় আরো লক্ষণীয় যে জিন্নাহর অভিপ্রেত কেবলমাত্র মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে গঠিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে অনভিপ্রেত এবং অতিরিক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির ফলে বসবার স্থান সঙ্কুলান হয়নি, অভীষ্ঠ লক্ষ্যে বৈঠক ও আলোচনাও হতে পারেনি। এ ব্যাখ্যার পরেও জিন্নাহকে একক দায়ী করা কি সত্যের অপলাপ নয়? আমার এ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য জিন্নাহর পক্ষে সাফাই নয়। বরঞ্চ জাতীয় রাজনীতি চরিত্রে কুচক্রীদের অপকর্ম অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণের প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত প্রদান। উপরোক্ত গ্রন্থ রচয়িতাগণ কেউই ১৯৪৭-৪৮ এর ভাষা আন্দোলন স্বচক্ষে অবলোকন করেন নি, তাঁরা আন্দোলনকারিগণের মৌখিক বর্ণনা এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন। আমার বাসস্থান ছিল আন্দোলন ক্ষেত্রের পরিধির ভিতরে এবং সভা সমাবেশ মিছিলে পরিচয়হীনভাবে প্রায়শঃ অংশগ্রহণ করেছি। আর নেপথ্যে হাবিবউল্লাহ বাহার ও ডি. কে. পাওয়ারের মাঝে সংযোগকারী বার্তাবাহকের

www.pathagar.com

ভূমিকা পালন করেছি। সুতরাং আমি ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষদর্শী এবং আন্দোলন সম্পর্কে আমার জ্ঞানও সরাসরি।

৯.৩৯ ভেতো বাঙালী কী করে গম খেতে অভ্যস্ত হলো?

ষাটের দশকের পূর্বে এতদঞ্চলে প্রধান খাদ্য ছিল একটি–চাল। খাদ্য তালিকায় গমের কোন স্থান ছিল না। অথচ চালের উৎপাদন ও সরবরাহ দেশে ও বিদেশে ছিল সীমিত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্যঘাটতি আমদানীর মাধ্যমে মেটান হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুন্নত দেশসমূহে তার সাহায্যের বিরাট অংশ প্রদান করতো উদ্বৃত্ত গমের মাধ্যমে। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানেও পর্যাপ্ত পরিমাণ গম সরবরাহ করে যুক্তরাষ্ট্র। সমস্যা দেখা দেয় গমের ব্যবহার নিয়ে। সেই সময়কালে জনসাধারণ উপবাস থাকলেও গমজাত খাদ্যগ্রহণে প্রস্তুত ছিল না। আবহমানকালের খাদ্যাভ্যাসই ছিল এই অনীহার কারণ। যুক্তরাষ্ট্র এবং দেশীয় সরকার ও জনগণের মাঝে সমঝোতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধন ছিল আমার কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় সরকার চায় চাল সরবরাহের জন্য আমি যেন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রভাব খাটাই আর যুক্তরাষ্ট্র সরকার চায় গম গ্রহণে স্থানীয় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করি। আমি নিশ্চিত জানতাম, প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল পাওয়া যাবে না। গম সস্তা মূল্যে এবং বিনামূল্যে যত ইচ্ছা পরিমাণ পাওয়া যাবে। এ পরিস্থিতিতে আপন স্বার্থে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্যথায় উপবাস। দেশবাসীর খাদ্যভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারলে হয়তো গমজাত খাদ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে ভেবে দৈনিক খাদ্য তালিকায় গমজাত খাদ্য যুক্তকরণে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অবলম্বনের পরামর্শ দিলাম। উদ্বৃত্ত গম খাদ্য সাহায্যরূপে কাজে লাগান যাবে ভেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সে পরামর্শ গ্রহণ করলো এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে প্রস্তাব দিল। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করলেও পূর্ব পাকিস্তান সরকার উদাসীনতা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রস্তাব মেনে নেয়। তবে কার্যকারিতা ও সফলতায় সন্দিহান থেকে যায়।

www.pathagar.com

কিভাবে গমজাত খাদ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আরম্ভ হয়। বিভিন্ন পন্থার মাঝে বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের গমজাত খাদ্য টিফিনরূপে বিনামূল্যে বিতরণের ধারণাটা অনেকের কাছে "ধরি মাছ না ছুঁই পানির" মতো গৃহীত হলো। আমাদের দেশে বালক বালিকারা সারাদিন একরকম অভুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে কাটায়। গমজাত হাল্‌কা খাদ্য দুপুর বেলা বিনামূল্যে পেলে সানন্দে গ্রহণ করতে পারে এবং ছুটি শেষে গৃহে ফিরে এই আনন্দের সংবাদ পিতামাতার কাছে নিয়ে গেলে তাঁরাও উৎসুক হয়ে গমজাত খাদ্যে আগ্রহী হতে পারেন এই চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে দুপুর বেলা হাল্‌কা ভোজের পরিকল্পনা উত্থাপিত ও গৃহীত হলো। প্রাদেশিক শিক্ষা দফতর, যুক্তরাষ্ট্রের হুইট এসোসিয়েট্‌স ও কেয়ার যৌথভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রয়োজনীয় অর্থ, উপকরণ (গম, গুঁড়ো দুধ) ও তৈজসপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী যুক্তরাষ্ট্র প্রদান করে। শিক্ষা দফতর সারাদেশে প্রাথমিক হতে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে। ১৯৬২ সালে শিক্ষামন্ত্রী মফিজউদ্দিন কামরুন্নেসা বিদ্যালয়ে দেশব্যাপী "স্কুল লাঞ্চ প্রকল্প" উদ্বোধন করেন।

এটা ছিল একটি অভিনব কার্যক্রম। ইতোপূর্বে কেউ বাংলা অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ খাদ্যরূপে গম খেয়েছে এমন কোন প্রমাণ ছিল না। অভাবে ও দুর্ভিক্ষে মানুষ লতাপাতা, গাছের মূল প্রভৃতি অখাদ্য খেয়েছে কিন্তু জঠরজ্বালা নিবারণে কেউ গম খায়নি। কাজেই লক্ষ্য মহৎ হলেও এ কর্মসূচীর কার্যকারিতা এবং সফলতা সম্পর্কে উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় সরকার সর্বস্তরে অনিশ্চয়তা ছিল। বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকলেও সহযোগিতার অভাব ও অনীহা ছিল এবং সরকারের কোন কোন মহল হতে তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ পাওয়া যেতো। অবশ্য শিক্ষাদফতরের পরিচালক অধ্যাপক শামসুল হকের প্রশাসনিক ও নৈতিক সমর্থন, কেন্দ্রীয় সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সর্বোপরি গভর্ণর আজম খানের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সকল প্রতিকূল

www.pathagar.com

পরিবেশ কাটিয়ে কার্যক্রম ধীরে ধীরে আপন অবস্থান ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনমনে প্রথমে কৌতূহল ও পরে আগ্রহ সৃষ্টি করতে থাকে। বাধা-বিপত্তি, সংশয় সত্ত্বেও কার্যক্রম এগিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ইতস্ততঃভাব থাকলেও বিদ্যালয়ে অভুক্ত কিশোর শিক্ষার্থীরা ক্রমশঃ দুধমিশ্রিত গমজাত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দিনের শেষে গৃহে ফিরে তারা তাদের উপভোগের কথা মাতা-পিতাকে জানাতো, ফলে অভিভাবক মহলেও কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে।

পাশাপাশি খণ্ডকালীন অন্যান্য কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়, যার দুএকটিতে নতুনত্ব ও বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ঐ সকল কর্মসূচীর মাধ্যমে কর্মস্থলে শ্রমিক, মাঠে কৃষক, নৌকা ও গাড়ী চালকের মাঝে গমজাত খাদ্যের উপকারিতা, রকমারী গমজাত খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে বিতরণের ফলে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে গমজাত খাদ্যের প্রতি বিরাগ বা অরুচি শিথিল হতে থাকে এবং আগ্রহ বেড়ে যায়। রকমারী খাদ্য–চাপাতি, তনদুরি ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে সহজে বহনযোগ্য, ভাতের তুলনায় দীর্ঘক্ষণ পেটে স্থায়ী হয় এবং তাড়াতাড়ি ক্ষুধাবোধ হয় না, সস্তায় চালের সম পরিমাণ গমে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির খাদ্য সংস্থান ইত্যাদি বহুবিধ উপকারিতা ও সুবিধা প্রচার বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হতে থাকে। খাদ্যরূপে গমের জনপ্রিয়তা সৃষ্টির সামগ্রিক প্রকল্পের আওতায় উল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে ধীরে এবং দৃঢ়ভাবে অভাবগ্রস্ত পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ গমজাত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসূচীর মধ্যে একটি ছিল ঢাকা ষ্টেডিয়ামে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতীয় মেলায় কেবলমাত্র মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত ও পরিবেশিত রেস্তোরাঁ-হুইটকীচেন। নতুন নতুন ধরণের রকমারী গমজাত হালকা খাদ্যসামগ্রী তৈরী ও তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঢাকায় বেইলী রোডে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য প্রথম হোষ্টেল ভবন নির্মাণের প্রাথমিক মূলধন এ

www.pathagar.com

হুইটকীচেনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। কর্মজীবী মহিলা সমিতি ও হোষ্টেলের স্থপতি ছিলেন তদানীন্তন একাউন্টেন্ট জেনারেল মিসেস সালিমা আহমদ। গভর্ণর জেনারেল আজম খান হুইটকীচেন উদ্বোধন করেন। এর পূর্বে এদেশের কোন প্রদর্শনী বা মেলায় সর্বসাধারণের জন্য খোলাখুলিভাবে একচেটিয়া মহিলাগণ কর্তৃক কোন রেস্তেরাঁ পরিচালনা করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।

এ ধরনের আর একটি কর্মসূচী ছিল সেগুনবাগিচায় ডায়াবেটিক সমিতির প্রথম ডায়াবেটিক হাসপাতালের রোগী, কর্মকর্তা, কর্মী ও আগন্তুকদের কার্বোহাইড্রেডমুক্ত খাদ্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় হুইটকীচেন প্রতিষ্ঠা।

বর্তমান প্রাসাদোপম আধুনিক ডায়াবেটিক হাসপাতালের সূচনা ছিল এই হুইটকীচেন। এর নায়ক ছিলেন মরহুম ডাঃ ইবরাহীম, আমি ছিলাম নেপথ্য উদ্যোক্তা। হুইট এসোসিয়েটস এর আর্থিক অনুদানে এই কীচেন গৃহ নির্মাণ এবং উপকরণ ও আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়। স্মরণযোগ্য, গমে কার্বোহাইড্রেড না থাকায় ডায়াবেটিক রোগীর জন্য ভাতের বিকল্প গমজাত খাদ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। খাদ্যভ্যাসে পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় কর্মসূচী ছিল তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত 'বায়তুল আতফাল শাবিয়া' নামক নারী এতিমখানায় দিনে একবেলা গমজাত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত করার জন্য যাবতীয় উপকরণ, তৈজসপত্র, আসবাব এবং গম বিনামূল্যে সরবরাহকরণ।

উল্লিখিত বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে ৫/৬ বছর পরে গমজাত খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রচারের প্রয়োজন আর পড়েনি। গম দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যরূপে দেশব্যাপী গৃহীত ও প্রচলিত হয়ে গেল। কৃষকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে গম চাষ আরম্ভ করে, যা বর্তমানে দ্বিতীয় উৎপাদিত প্রধান খাদ্যশস্য। সরকারের উচ্চমহলে সন্দেহ ও অনাসক্তি থাকা সত্ত্বেও একাগ্র প্রচেষ্টার ফলে ঐতিহ্যগত খাদ্যভ্যাসে পরিবর্তন আনা সম্ভব হলো, যা ষাট দশকের পূর্বে ছিল অবাস্তব ও কল্পনামাত্র।

www.pathagar.com

৩৫-৪৫ বছর বয়সী বর্তমান প্রজন্মের কাছে দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যের স্থান অধিকারে গমের বিজয় রূপকাহিনী বলে মনে হতে পারে। যা একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে বাস্তব সত্যে পরিণত হতে পেরেছিল।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং খাদ্য ঘাটতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশের এখন প্রধান খাদ্য দুটি–চাল ও গম। ইচ্ছা করলে আলুকে আমরা তৃতীয় প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি। দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১১.১৯ কোটি। শিশু বাদে অবশিষ্ট জনসংখ্যার জন্য বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজন ১.৮৫ কোটি টন। চাল ও গম মিলে মোট খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে ১.৭৭ কোটি টন। অতএব ঘাটতি থেকে যায় ৮ লাখ টন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ডামাডোল সত্ত্বেও মানুষ বাড়ছে। অতএব খাদ্যঘাটতি বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী। এই ঘাটতি পূরণের জন্য নিম্নবিত্ত ও স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে চাল ও গমের ন্যায় আলুকেও অন্যতম উপাদেয় খাদ্যরূপে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে কৃষিবিভাগ, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং হিমাগার সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে প্রচার, প্রদর্শনী ও শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস।

www.pathagar.com

১০ম পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রশাসনের উচ্চস্তরে নৈতিক অবনতি

১০.৪০ ৫.২৫ নং উপাখ্যানের নায়ক করপোরেশন প্রধান আপন পদ হতে অপসারণ এবং সচিব পদে নিয়োগের মধ্যবর্তী সময় তিনি বেশ কিছুকাল ও এস ডি ছিলেন। পূর্বের আসনে পদাধিকার বলে প্রাপ্য সরকারী যানবাহন ও বিবিধ সুযোগ সুবিধা বৈধ ও অবৈধ মাত্রায় ভোগ করতেন। কিন্তু ওএসডি হওয়ার পর সে সকল সুযোগ সুবিধার বিধান না থাকলেও ক্ষমতার অপব্যহারকারী সহযোগীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও সমর্থনে তার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। একদিন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতঃ করপোরেশনের একখানা গাড়ী সনাক্ত করে মন্ত্রী বাহাদুরের ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে পাঠিয়ে দিতে লিখিত নির্দেশ এসে পৌছলো। ঐ গাড়ীখানা অন্যতম পরিচালকরূপে আমাকে বরাদ্দ করা ছিল এবং আমি ব্যবহার করতাম। সরকারী চিঠিতে স্বয়ং সংস্থাপন সচিবের দস্তখত। কারসাজিটা অন্য কেউ না বুঝলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সজাগ মনে সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। দেখা গেল গাড়িটি ব্যবহার করছেন ওএসডি সাহেব, কোন মন্ত্রী নয়। মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে (blackmail) এবং তা করেছেন স্বয়ং সংস্থাপন সচিব। মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে তিনি জানতে চাইতেন কাজকর্ম কেমন চলছে। এমনি এক মুহূর্তে জানালাম যে যান-বাহনের অভাবে তদারকের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। স্বভাবসুলভ হাঁক দিয়ে বললেন করপোরেশনের গাড়ীর অভাব থাকার কথা নয়। বললাম, তা ঠিক, তবে করপোরেশনের গাড়ী মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত ব্যবহারে নিয়ে যায়, ফলে করপোরেশনের কাজে অসুবিধা হয়। সরকারী নির্দেশের চিঠিখানার অনুলিপি

www.pathagar.com

সব সময় পকেটে রাখতাম, সামনে তুলে ধরলাম। উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, ওহে, কে আছ, রফিকুল্লাহ, সৈয়দ হোসেন। তৎক্ষণাৎ তাঁদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না বটে তবে পরের দিন আমার সহকর্মী অর্থ পরিচালক জনাব আখতার আলীর (বর্তমানে সচিব) বন্ধু স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের জনৈক উপ-সচিব ফোন করে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমাদের গাড়ী আজই ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ হয়েছে। অনুধাবনীয় যে প্রশাসনের উচ্চতম পদাধিকারী সংস্থাপন সচিব তাঁর সহকর্মী বন্ধুকে অবৈধভাবে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার জন্য মন্ত্রীর নাম ব্যবহার করে ডাহা মিথ্যা নির্দেশ সরকারীভাবে জারি করতে বিবেকের অনুশাসন অনুভব করেননি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সময়কালের প্রশাসনে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুঃশাসন ও দুর্নীতির মাত্রা কত গভীরে প্রবেশ করেছিল এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের চরিত্র কত নিচে নেমেছিল এই একটি মাত্র ঘটনা হতে সহজে উপলব্ধি করা যাবে। এ রকম অসংখ্য ঘটনা ও উদাহরণের মধ্যে গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আরও ২/১টি উল্লেখ করা হচ্ছে।

১০.৪১ আমার ব্যক্তিগত পরিচয়, যোগাযোগ ও অগ্রণী পদক্ষেপের (initiation) ফলে ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প ও কারিগরী শিল্প মালিক সমিতি কোলকাতায় এক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত সামগ্রী প্রদর্শনী এবং সেমিনারে উক্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আমন্ত্রিত হই। সরকারের অনুমোদনও পাওয়া যায়। ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে পঠিতব্য বক্তৃতা সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের সচিব তা পড়ে প্রথমে অনুমোদন করলেন বটে তবে তাঁর আদি চারিত্রিক ও মানসিক জটিলতা (mental complex) আবার আত্মপ্রকাশ করলো বোধ হয়। কারণ সেমিনারে আমার অংশগ্রহণে অনুমতি একবার দিয়ে আমার রচনা পড়াবার পর পরই তা প্রত্যাহার করে নেন এবং আমার পরিবর্তে নিজেই যাওয়া স্থির করলেন। সচিব তিনি যার

www.pathagar.com

কাহিনী ৫.২৫ এবং ১০.৪০ উপাখ্যানে (ও. এস. ডি) বর্ণনা করা হয়েছে। সে সময় করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব এ এইচ সাদেক, অতি ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্রলোক। তাঁর কাছে ব্যাপারটি বিসদৃশ ঠেকলো এবং সচিব তা উপলব্ধি করে প্রশাসনিক কূটনীতির যুক্তিতে একান্ত ভদ্রমানুষ চেয়ারম্যানকেও তাঁর সাথে সেমিনারে যাওয়ার জন্য রাজী করালেন। আমার রচিত প্রবন্ধই রূপান্তরে অপরের নামে সেমিনারে উপস্থাপিত হলো। ভদ্রবেশে অপরের কৃতিত্ব চুরির কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। সাদেক সাহেব এই দক্ষ হাতচালনার (manipulation) শিকার হওয়ায় নিজেই দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। দুজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চ পদালঙ্কারকারী ক্ষমতাসীন মানব সন্তানের চরিত্রে বিচিত্র এবং বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

১০.৪২ এক সময় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশন হতে কনজিউমার করপোরেশনের (ভোগ্যপণ্য সংস্থা) পরিচালক পদে বদলির নির্দেশ পাই। ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছিলাম তখনকার সময়ে সরকারী আধাসরকারী কর্মকাণ্ডে ও কর্মস্থলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, ও দুর্নীতি ব্যাপক। কনজিউমার করপোরেশন সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ওখানে যাবার ইচ্ছা নেই। তবুও ওখানকার পরিবেশ বুঝবার ইচ্ছায় একদিন গেলাম। আলাপ আলোচনায় যা বুঝলাম ও দেখলাম আমার চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তির স্থান ওখানে মানানসই হতে পারে না। জনগণের কাছে নিত্য ব্যবহার্য ভোগদ্রব্য স্বল্প মূল্যে সহজ লভ্য করার সৎ উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী সরকারী দোকান স্থাপন ও দোকানদার নিয়োগ কার্যক্রম পুর্ণোদ্যমে চলছে দেখলাম। দোকান পরিচালনা যাঁরা (ম্যানেজার) করবেন তাঁরা করপোরেশনের নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী হবেন। নাম ঠিকানা অলিখিত (blank) রেখে শত শত নিয়োগপত্রে সই করে বাণ্ডেলবদ্ধ অবস্থায় সরকার দলীয় স্থানীয় নেতাদের নামে পাঠাবার ব্যবস্থা চালু রয়েছে, দেখতে পাই। স্থানীয় নেতাই প্রার্থী

www.pathagar.com

নির্বাচন করে নিয়োগপত্রের ফাঁকা স্থানে নাম ঠিকানা বসিয়ে দোকানের ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারীর নিয়োগ দেবেন। একই নিয়মে দোকান ঘর ভাড়ার কাগজপত্র ও কাল্পনিক (fictitious) ঘরের মালিকের নাম ঠিকানার স্থান ফাঁকা রেখে সই করে পাঠনো হয়। পরিচালক পদে কার্য গ্রহণ করলে আমাকে অজানা কাল্পনিক ব্যক্তির বরাবরে ঐ সকল ফাঁকা নিয়োগপত্রে সই করতে হবে। মনস্থির করে ফেললাম। প্রধানমন্ত্রীর ভগ্নিপতি ও তখনকার প্রশাসনিক ক্ষমতার চাবির অধিকারী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সৈয়দ হোসেনের কাছে গিয়ে আমার বদলীটা বাতিল করার জন্য অনুরোধ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কারণও শুনিয়ে দিলাম। বুঝলাম, তিনি সব জানেন এবং জেনে শুনেই আমাকে ঐ নরকে বদলী করেছেন, এ আশায় যেন আমিও সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে (তিনিও) দেশব্যাপী ঐ সঙ্ঘবদ্ধ দুর্নীতি প্রথায় অর্জিতব্য আয়ের অংশীদার হই। তিনি শিষ্টাচার বর্জিত ভাষায় এবং অনুগ্রহ বিতরণের ভাঙ্গিমায় জানিয়ে দিলেন–চাকুরী করতে চাইলে যেন সরকারের নির্দেশ পালন করি, না হয় বাড়ী চলে যেতে পারি। তাঁর কথা আমলে না নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বদলীর আদেশটা বাতিল করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালাম। রহস্য ফাঁস হয়ে গেলো। বললেন–'আদেশে সই করলেও আমি তোমাকে ওখানে বদলী করতে চাইনি। আমাকে বোঝান হয়েছে যে ঐ করপোরেশনের জটিলতা সামলাতে তুমিই যোগ্য ব্যক্তি, তাই। তবে তুমি যেতে না চইলে যেখানে আছ সেখানেই থাক'। অবশ্য কারণ জানতে চাইলেন। যা দেখেছি সব খুলে বললাম। দুঃখ করলেন, আমিও দুঃখ পেলাম-দুর্নীতি ও কুচক্র তাঁকে বেঁধে রেখেছে। বুঝেও এ অভিশাপ হতে মুক্তির পথ ধরবার সাহস ও প্রশাসনিক দক্ষতা নেই। বদলী বাতিল হয়ে গেলো। আসন্ন নরকবাস হতে আপততঃ মুক্তি পেলাম।

www.pathagar.com

ভোগ্যপণ্যের দুর্ভিক্ষ নিরসন করে দুঃখী মানুষের দোরগোড়ায় তা পৌঁছায়ে দেয়ার পবিত্র ইচ্ছার পেছনে দেশব্যাপী দলীয় নেতা ও কর্মীগণের রুজি রোজগারের একটা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা করাই ছিল ভোগ্যপণ্য সংস্থার হাজার হাজার দোকান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়ার আসল উদ্দেশ্য। এই নেটওয়ার্ক পরে ছিঁড়ে যায় এবং কেবলমাত্র ঢাকা ও দু একটি শহরে এঁর অস্তিত্ব টিকে রাখা হয়, যার ফল সর্বজনবিদিত। পরবর্তীকালে উক্ত সংস্থার অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

১১শ পরিচ্ছেদ

ক্ষমতার উৎসের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা আহরণের কৌশলমাত্র

১১.৪৩ সরকারী উচ্চপদে কর্মরত থাকা কালে বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের মধ্যে কেউ কেউ আমার কর্মদক্ষতা, সততা ও সৎসাহসের জন্য প্রশংসা করতেন। কখনো কখনো কেউ বিচিত্র প্রকারে আমার মন জয় করার প্রচেষ্টা চালায়ে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার ন্যায়ের খাতিরে কখনো কখনো আমিও কারো পক্ষ নেয়ার কারণে আমার উপরওয়ালার সাথে মতভেদ, এমন কি মন কষাকষিও হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে আমার অর্থাৎ ন্যায়ের জয় হতো। ফলে ঊর্ধ্বতন কর্তা নারাজ হতেন, তবে সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশংসা পেয়ে গর্ববোধ করতাম। সেই প্রশংসাকে তখন আন্তরিক বলে বিশ্বাস করতাম এবং উদ্যম ও সৎসাহস দৃঢ় হতো। সততার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা যে সাময়িক সুবিধা লাভের কৌশল এবং তাঁদের বিচারে আমি যে আসলে নির্বোধ তখন তা বুঝতে পারিনি, বুঝেছি অনেক পরে।

অনেক সরকারী আধাসরকারী কর্মকর্তাকে অবসর গ্রহণের পর ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে পুনর্বাসিত হতে দেখতাম। চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর দেখাদেখি হালাল রোজগারের তাগিদে আমাকেও কাজে লাগান যায় কি না বিবেচনা করতে কাউকে কাউকে অনুরোধ করলে আমার সে পূর্বেকার গুণমুগ্ধ (?) ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিগণ সসম্মানে আমাকে এড়িয়ে যেতেন। কারণ তাঁরা জানতেন আমি তাঁদের লাইনের মানুষ নই এবং আমাকে দিয়ে অবাঞ্ছিত কোন ফায়দা কোন কর্তৃপক্ষ হতে আদায় করা যাবে না। কর্তব্যরত থাকা কালে যে সকল কর্মকর্তা ঐ সকল মহলের সাথে

www.pathagar.com

আঁতাত পেতে সংশ্লিষ্ট লাইনে ট্রেনিং নিয়ে ও সহায়তা দিয়ে হাত পাকিয়েছেন, পূর্ব হতে তাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে আমি সে সুযোগ গ্রহণ না করে নিজেকে পূর্বেই নির্বোধ ও অযোগ্য প্রমাণ করেছি।

উপরোক্ত ধরণের মনোবৃত্তি বা পরিবেশ এখন আরো ব্যাপক এবং এই মনোবৃত্তির কারণে পরে ১১.৪৪ উপাখ্যানে বিবৃত সংস্থা প্রধান প্রথমে আমাকে অযোগ্য মনে করেছিলেন আবার একই মনোবৃত্তির কারণে পরবর্তী সময়ে উচ্চতর পদে যোগ্য মনে করে আমাকে আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন।

১১.৪৪. বিদেশী সংস্থায় কর্মে নিয়োজিত থাকাকালে তাদের প্রতিনিধিরূপে একসময় আমি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির জন্য বেশ কিছু অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। ফলে এই সংস্থা প্রধানের সাথে আমার হৃদ্যতা জমেছিল। বেশ কিছুকাল পরে কোন এক সময়ে সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তার প্রয়োজন জেনে আমি প্রার্থী হিসেবে আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু আমাকে এড়িয়ে গেলেন তিনি। এর বেশ কিছুকাল পরে তিনিই প্রতিষ্ঠানের নির্মাণাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের পদ, যা পূর্বোক্ত পদ অপেক্ষা উচ্চ স্তরের, গ্রহণ করতে আমাকে সম্মত করাবার জন্য ক্ষমতার উচ্চতম স্তরের পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করেছিলেন।

এক সময়ে যে ব্যক্তি একটি কর্মপদের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে একই ব্যক্তি একই সংস্থা প্রধানের কাছে আরো উচ্চপদে কি করে যোগ্য হতে পারেন? আপাতদৃষ্টিতে তা বোধগম্য না হলেও কারো যোগ্যতার মাপকাঠি উচ্চতম ক্ষমতাসীনের সাথে সম্পর্কের মাপকাঠিতে যে উঠানামা করতে পারে তা কে না জানে? আমার যোগ্যতা কি করে কেন পরে বেড়ে গেলো আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তখনকালে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন অবজ্ঞাভরে উক্ত সংস্থা প্রধান একবার

www.pathagar.com

আমাকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন তেমন অবজ্ঞাভরে আমিও তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করি। ইনি মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বরূপে সমাজে পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি চরিত্রে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ভোগের প্রত্যাশায় অথবা অর্থনৈতিক ও শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনবিধিবিধানের ছত্রছায়ায় অবৈধ সুযোগ সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার উচ্চাঙ্গনের সাথে যুক্ত/সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণকে প্রাইভেট শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদ উপহার দেয়া আজকাল একটা স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত রীতি, আমার উক্ত ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন বা নতুন উদাহরণ নয়। তবে এমন অসংখ্য অজানা ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র ব্যতিক্রম যে আমি এ ধরনের ফাঁদে পড়িনি।

www.pathagar.com

১২শ পরিচ্ছেদ

হিতৈষী আমলাতন্ত্রে জনকল্যাণকর স্বেচ্ছাচারিতা

১২.৪৫ বৃটিশ শাসন আমল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা প্রশাসক জনাব নিয়াজ মোহাম্মদ খান, পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জে মহকুমা প্রশাসক জনাব খুরশীদ। উভয়েই আইসিএস এবং জন্মে পাঞ্জাবী তবে পূর্ণ কর্মজীবন কাটিয়েছেন পূর্বাঞ্চলে। খুরশীদ সাহেব পরে সিলেটের জেলা প্রশাসক এবং নিয়াজ খান পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী হন।

দুই মহকুমার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে একদিকে ভূমি চাষাবাদের অনুপযোগী ছিল, অপরদিকে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে বর্ষাকালে প্লাবনের ফলে আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতো। এই দ্বৈত সমস্যার প্রতিকার হয় খাল খনন করে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে প্লাবন রহিত ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং শুকনো মওসুমে পানি সেচের সুযোগ সৃষ্টি করণ। সদিচ্ছা থাকলে প্রশাসনিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহার এবং উহার প্রভাব খাটিয়ে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনকল্যাণকর কঠিন কার্যও যে করা যায় তার নজির স্থাপন করে কোন কোন প্রশাসক স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। এমন অন্যতম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মহকুমা প্রশাসক নিয়াজ মোহাম্মদ খান।

বৃটিশ আমলে জেলা বা মহকুমার প্রশাসকগণ দোর্দণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হতেন। আলোচ্য উভয় মহকুমার প্রশাসক যুক্তি, পরামর্শ ও বিবেচনা করে খাল খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে মাটি কাটার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ যোগানই হলো সমস্যা। নিয়মিত ব্যয় বরাদ্দের (বাজেট) বাহিরে ব্যয় করার জন্য সরকারী তহবিলে কোন অর্থ নেই, বিধিও নেই সুতরাং মাটি কাটার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমিক চাই। কি ভাবে তার ব্যবস্থা করা যায়? এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করা হলোঃ জনৈক বিধবা দরিদ্র মহিলাকে এ পন্থার তৃতীয়

www.pathagar.com

সহযোগীরূপে নির্বাচিত করা হলো। গ্রামাঞ্চলে কারো বাড়ীতে ঘরে আগুন লাগলে প্রতিবেশী সবাই বিনা আহবানে স্বেচছায় প্রাণপণ করে আগুন নির্বাপনের কাজে লেগে যায়। পূর্ব পরিকল্পনা মতে একরাতে বিধবার ঘরে আগুন লাগে। যথারীতি গ্রাম জুড়ে কর্মক্ষম সকল পুরুষ মানুষ জড় হলো এবং আগুন নিভালো। তবে বিধবার কুড়েঘর পুড়ে গেছে। বিধবাকে অবশ্য পূর্বাহ্নেই নগদ অর্থে ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্নির্মাণে আশ্বস্ত করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে সকলের অজান্তে পুলিশ বাহিনী সম্পূর্ণ এলাকা ঘিরে ফেলে, সকল কর্মঠ মানুষকে অবরুদ্ধ করা হলো। আগুন নির্বাপনের পর কাহাকেও বাড়ী ফিরে যেতে দেয়া হলো না। ব্যাখ্যা করা হলো খাল খননের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য সুফল। কিছুলোক স্বেচ্ছায় এবং কিছুলোক অনিচ্ছায় খাল খননের কাজে শ্রম দিতে বাধ্য হলো। মাটি কেটে পানি নিষ্কাশনের উপযোগী দীর্ঘ খাল খনন হলো। গ্রামবাসী দেখে আসল উদ্দেশ্য বুঝলো এবং প্রাথমিক অসন্তুষ্টি পরে কৃতজ্ঞতায় ভেসে গেলো। চিরকালের জন্য জলাবদ্ধতা দূর হলো, বিস্তীর্ণ এলাকায় সেচের ফসল ফলতে শুরু করলো। জনগণ আজও সেই উদ্ভাবনী শক্তির (ingenuity) সুফল ভোগ করছে এবং উক্ত দুই রাজপুরুষকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছে। জনাব নিয়াজ খান এই প্রকল্পের প্রধান উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা ছিলেন বলে ইহার নামকরণ হয় নিয়াজ খাল।

১২.৪৬ মহকুমার প্রশাসক তাঁর সরকারী বাসভবনের আঙ্গিনায় পদচারণা করছেন। সম্মুখের রাস্তায় এক ব্যক্তিকে একটি বড় ও লোভনীয় আকৃতির পাকা পেঁপে নিয়ে বাজারের দিকে যেতে দেখতে পান, সম্ভবতঃ বিক্রীর উদ্দেশ্যে। কর্তব্যরত পাহারাদারকে ইঙ্গিত দিলে পেঁপের মালিককে আঙ্গিনার ভিতরে ডেকে আনা হলো। জানতে চাইলেন কত মূল্যে বিক্রী করবে। লোকটি কোন মূল্য না চেয়ে জানালো যে জনৈক উকিল বাবু পেঁপেটি কিনে ফেলেছেন, অবশ্য মূল্যের অর্থ দেন নি। বাজারে দর যাচাই করে তাঁর কাছে

www.pathagar.com

ফেরৎ গেলে বাজারের সর্বোচ্চ প্রস্তাবিত মূল্যই তিনি দিবেন, কথা দিয়েছেন এবং অন্য কারো কাছে বিক্রী করতে নিষেধ করেছেন। এ অস্বাভাবিক বেচাকেনায় কৌতুহলী হয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে মহকুমা হাকীম জানতে পারেন যে বিক্রেতা স্বাভাবিক নিয়মেই ক্রয়েচ্ছু উকিলের কাছে একটা মূল্য চেয়েছিল। পণ্য কেনা-বেচা স্বাভাবিক দরাদরি রীতিতে হয়, বিক্রেতার প্রস্তাবিত দর গৃহিত হয় নতুবা ক্রেতা একটা পাল্টা দর প্রস্তাব দিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে দমবাজ (humbug) ক্রেতাব্যক্তি নিরীহ গ্রামবাসীকে তাঁর খামখেয়ালীর শিকার বানিয়ে হয়রানি করেছেন এবং সামাজিক উন্নাসিকতা দেখিয়েছেন। উকিল মহোদয়ের স্বেচ্ছাচারিতার সমুচিত শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এস.ডি.ও সাহেব পেঁপেঁটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা প্রস্তাব দিয়ে উকিলের কাছে তাই দাবী করতে নির্দেশ দিলেন। সরল মানুষটি যেমন হতভম্ব হলো তেমন অস্বাভাবিক মূল্যের প্রস্তাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো। অগত্যা মহকুমা হাকীমের নির্দেশ, পুলকিত বিস্ময়মনে ফেরৎ গিয়ে তাহাই বিবৃত করলো। উকিল মহোদয় উপাখ্যানটি অবিশ্বাস্যকৌতুক মনে করে তাকে লাঞ্ছনা করে বিদায় দিলেন। সে ফেরৎ এসে এস. ডি. ও. কে জানালো। তিনি পুলিশ পাঠিয়ে উকিলকে ডেকে আনালেন। নিরাপরাধীর প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস ও (humorous contempt) পীড়াদায়ক হয়রানির (oppressive harassment) জন্য ফৌজদারী যোগ্য অপরাধের ইঙ্গিত দিয়ে তাঁরই কথামত প্রস্তাবিত পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে পেঁপেঁ ক্রয় করতে বাধ্য করলেন। এই মহকুমা হাকীম ছিলেন পূর্বোল্লিখিত উপাখ্যানের নায়ক নিয়াজ মোহাম্মদ খান।

১২.৪৭ এক সময় জনাব ন ম খান চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন। একবার সরকারী পরিদর্শনে কুমিল্লা সদরে আগমন করেন। জেলা সদর পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাগণের সমাবেশে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে আলোচনারত। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত। জি এম কাদেরী নামে আমার

www.pathagar.com

এক বন্ধুও তখন ম্যাজিস্ট্রেটরূপেকর্মে নিয়োজিত এবং সমাবেশে উপস্থিত। বহুপূর্ব হতে কাদেরী নিয়াজ সাহেবের অতি প্রিয় অধস্তন সহকর্মী ছিলেন, সেই সম্পর্ক তখনও বজায় রয়েছে। সুতরাং তিনি ভাল করে জানেন কাদেরী কেমন অফিসার। কাদেরীর বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্টে (ACR) জেলা প্রশাসকের লিপিবদ্ধ মূল্যায়ন ও মন্তব্য কমিশনার সাহেবের মনঃপূত ছিল না, কাদেরী সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও অভিমতের পরিপন্থী ছিল। এ. সি. আর খানি তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন। কর্মকর্তাগণের কার্যনির্বাহের অগ্রগতি ও মান সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কাছে জানতে চাইলেন কাদেরী কাজকর্ম কেমন করে। জেলা প্রশাসক সাহেব উত্তরে "ভালই" জানালেন। মুহূর্তে এ. সি. আর. খানি সামনে আগায়ে দিয়ে বললেন, তা হলে ইহা কার এ. সি. আর.? আপনার কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রিপোর্ট পুনরায় পেশ করুন। সমবেত কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসকের তখনকার মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বিব্রতকর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তী ১২:৫৯ পর্যালোচনাটি প্রাসঙ্গিক।

www.pathagar.com

জাতীয় ঐতিহ্য অস্বীকার জাতির ধ্বংস ডেকে আনে

১২.৪৮ পাঁচ দশক পূর্বে পাকিস্তানের জন্মকালে যাঁরা ১০-১২ বৎসরের বালক কিশোর ছিলেন এবং নব্বই এর দশকে প্রবীণ শিক্ষিত নেতা, কর্মজীবী ও সুধীজন, তাঁরা দেখেননি অতএব জানেন না এবং বলতে পারবেন না তখনকার সময়কালে বা বৃটিশ ভারত বিভাগ পূর্বকালে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল, কেন এবং কিভাবে ভারত বিভাগ হয়েছিল এবং ভারত বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো কি না। দেশ বিভাগপূর্ব এবং বিভাগ সময়কালের পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের সঠিক এবং সত্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেই তবে বর্তমানকালে পঞ্চাশের কোঠার বয়সী গুণী, জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তা উপলব্ধি করতে পারতেন। চলমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবেগ উচ্ছ্বাস দেখে সঠিক ইতিহাস লিখিত হয়েছে বলে মনে হয় না। অথবা লিখিত হয়ে থাকলেও সে ইতিহাস তাঁরা যে পড়েছেন তা বুঝা যায় না। বলাবাহুল্য, ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের ধর্মাচারের স্বাধীনতা রক্ষা, জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্যই মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। ফলে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হয়। মুসলিম অধ্যুষিত ছিল বলেই মুসলিম সংস্কৃতি ও আর্থিক স্বার্থরক্ষাকল্পে এই অঞ্চল (বাংলাদেশ) মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত হয়েছিল। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল না হলে মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নই ওঠতো না। সুতরাং মূল ভারতের অংশরূপেই থেকে যেতো, তা হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো কিভাবে?

www.pathagar.com

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৃটিশ আমলের বাঙলা প্রদেশের বিভক্তি বাঙালী মুসলমানগণ অথবা পাকিস্তানের দাবীদারগণ চাননি। বাঙলা বিভক্ত হয় বাঙালী হিন্দুদের দাবী ও কংগ্রেসের আরোপিত শর্তের ফলে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল সমন্বয়ে গঠিতব্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী মানতে ভারতীয় কংগ্রেস প্রথমে সম্মত ছিল না। দীর্ঘস্থায়ী আলাপ আলোচনা ও যুক্তিতর্কের পর কংগ্রেস অগত্যা সম্মত হয় বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির শর্তে, যা ছিল এইঃ "ভারত যদি বিভক্ত করতেই হয় তাহলে এইরূপভাবে বিভক্ত হলে (অর্থাৎ পাঞ্জাব ও বাংলার বিভক্তি) তা কংগ্রেসের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে।" কংগ্রেসের এই শর্তসাপেক্ষ সম্মতির বিপক্ষে আবুল হাশেমসোহরাওয়ার্দী-শরৎবসু স্বাধীন "যুক্ত বাংলা রাষ্ট্র" (Greater Bengal) এর প্রস্তাব উত্থ্যাপন করেছিলেন, যা দ্বি-জাতিতত্ত্বের বা "সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকার" সংজ্ঞার যুক্তিতে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ যুক্ত বাংলার বিপক্ষে এবং বাংলা বিভক্তির পক্ষে একযোগে ভোট প্রদান করেন। দেশত্যাগী পূর্ব বাঙালী (ভঙ্গভূমি ধারণাকারী) এবং দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী তাদের সহযোগী যারা এখন এক ভাষাভাষি যুক্তবাংলার দরদে অশ্রুপাত করেন, তাঁদের পূর্বপুরুষ এবং মুরুব্বীগণই তাঁদের দেশত্যাগের সেতু নির্মাণ করে গেছেন। সেই মুরুব্বীগণের যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদেরকে আর তাঁদের প্রয়াতদের বিদেহী আত্মাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জবাবদিহি করা উচিত। খণ্ডিত বাংলার এক অংশ ভারতের অঙ্গরাজ্যরূপে ভারতীয় জাতিত্বে বিলীন হয়ে গেছে, অপরাংশ পূর্ববাংলা এবং পরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্ররূপে জন্ম লাভ করায় অখণ্ড বাঙলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে ৫০ বৎসর পূর্বে। বাঙলা নামে কোন ভৌগোলিক ভূখণ্ড বা রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে নেই। যার অস্তিত্ব নেই তার প্রতি অনুরাগ বা তার জয়গান বাতুলতার পরিচায়ক নয় কি? অর্ধশতাব্দী পূর্বে বিলীন হয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

বাঙলার জয় গাওয়া কি দেশপ্রেম অথবা সার্বভৌম জন্মভূমি বাংলাদেশ "জিন্দাবাদের প্রতি লাথি মারা" শ্লোগান দেয়া দেশদ্রোহিতা নয় কি?

যা হোক, বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে কাটাছেঁড়া (truncated) পাকিস্তান সৃষ্টি হলো এবং এই অঞ্চল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হলো বটে কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণমুক্ত হলো না। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রগঠনের মূলনীতি উপক্ষো করে বৃটিশ আমলের শোষণ ও বঞ্চনানীতি পূর্বাঞ্চলবাসীদের ওপর চালু রাখে। সেই অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও প্রশাসনিক বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তবে ভুললে চলবে না যে এদেশের ৯০% অধিবাসী মুসলমান দেশেই রয়ে গেছে, তাদের ধর্ম ইসলামও বহাল রয়ে গেছে। কাজেই বাংলাদেশের মূল ভিত্তি ছিল পাকিস্তান, যা ভেঙ্গে বাংলাদেশ হলো, সেখানকার অধিবাসীগণের আত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও মানবিকসত্ত্বা, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিও অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তনশীল পরিবেশে লক্ষ্য করা যায়, "শিক্ষিত" সমাজের একাংশের মধ্যে বাংলাদেশের মূল ভিত্তিতে, ধর্মীয় সংস্কৃতিকে অস্বীকার এবং বিজাতীয় অপসংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। এর প্রধান কারণ ৫০-৫৫ বয়স কোঠার বর্তমান চিন্তাবিদগণ হয় বৃটিশ ভারতের সামাজিক ইতিহাস জানেন না, তখন তারা ছিলেন ১০-১২ বছরের অবোধ কিশোর, অথবা যাঁরা জানেন তাঁরা বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে মতিচ্ছন্ন হয়ে স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের পরিবর্তে ৯০% পূর্বপুরুষ ও পিতামাতার ধর্মীয় অনুভূতিকে অস্বীকার করার প্রকট প্রবণতা দেখাতে সাহসী হয়েছেন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হতে কোরআনের প্রতীক সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে শোনা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোর নাম হতে "মুসলিম" শব্দ না কি মুছে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামি জাতিত্ববোধের ভিত্তিতে সৃষ্ট আবাসভূমি সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত স্বাধীন বাংলাদেশের মুসলিম পিতামাতার সন্তান বর্তমানের কিছু বুদ্ধিজীবী মুসলমান বলে পরিচিত হতে দ্বিধা বোধ করেন। এ মনোবৃত্তি তো পিতৃকুল অস্বীকারের সমতুল্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তা করতেও অনেকের বিবেক বাধা দেবে না। এ ধরনের বিজাতীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন বিকৃত মানসিকতার প্রতি ঘৃণা বা বৈরিতা পোষণের পরিবর্তে সমঝোতাবোধ নিয়ে করুণাপোষণই সঙ্গত হবে। কারণ দেশবিভাগপূর্ব পরিস্থিতি ও পিতৃপুরুষের ধর্ম ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ধর্মহীন শিক্ষাই এই বিপথগামিতার পেছনে কাজ করছে। শতকরা নব্বইজন মুসলমান অধিবাসীর বাসভূমি এই স্বাধীন বাংলাদেশে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ইসলামিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা যাতে হতে না পারে সে লক্ষ্যে আন্দোলন দানা বাঁধছে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীমালার মধ্যে পাঠ্যক্রমে দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষা বাতিলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অন্তর্ঘাতি ধর্ম ও দেশদ্রোহী স্রোত এখনই সময়মত ঠেকাতে না পারলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও জ্ঞান আহরণকারী অগণিত নিষ্পাপ অবোধ কিশোর কিশোরী ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বয়োপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের জাতীয় ও বংশ পরিচয় জানতে পারবে না, যেমন বর্তমানে বয়স্ক ও প্রবীণ শিক্ষিতজন জানেন না বা জেনেও অস্বীকার করছেন।

উল্লিখিত অশুভ পরিবেশ ও আশংকা নিয়েই বলতে চাই–যে জাতি আপন জন্মের ভিত্তি অস্বীকার করে কিম্বা আপন সত্ত্বাকে ভুলে যায় সে জাতি টিকে থাকে না। মানবইতিহাস তার সাক্ষী। এই আত্মঘাতী প্রবণতা চলতে থাকলে এমন একদিন আসবে যখন হয়তো নদীমাতৃক সুজলা সুফলা মাটির বাংলাদেশ ভৌগলিক অস্তিত্ব নিয়ে মানচিত্রে টিকে থাকবে তবে যে সত্ত্বা হতে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সেই পবিত্র সত্ত্বা ও মূল ধর্মীয় সংস্কৃতিতে

www.pathagar.com

বিশ্বাসী ও ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত বাংলাদেশী আর থাকবে না। অস্তিত্বহীন বাঙালার প্রেতাত্মা সবাইকে তাড়না করে ফিরবে। বিজাতীয় বস্তুতাত্ত্বিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী পরগাছা (parasite) বাংলাদেশবাসী তখন আপন জাতীয় ঐতিহ্য খুঁজে পাবে না এবং আপন অতীতকেও চিনবে না। দেশপ্রেমিক ঈমানদার সকল দেশবাসীর সাথে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হোক।

www.pathagar.com

আদর্শ প্রচার ও তার অনুশীলনের মাঝে অসঙ্গতি

১২.৪৯ রাজনীতি এবং সাংবাদিকতা যেমন দুটি সর্বব্যাপ্তিশীল পেশা আদর্শ প্রচার এবং অনুশীলনে উভয় পেশায় অসঙ্গতিও তেমন সর্বকালীন রীতি বলে মনে হয়। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই অসঙ্গতির প্রতি উদার সহনশীলতা থাকলেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্র বিশেষে এটা মর্মপীড়াদায়ক হয়ে থাকে, কারণ ওখানে নৈতিকতার প্রশ্ন রয়েছে।

দেশসেবাজীবী রাজনীতি এবং দলীয় রাজনীতি এক নয়। পেশাজীবী রাজনীতিবিদকে আদর্শবাদী এবং নীতিবানও হতে হয়, কমিটমেন্ট থাকতে হয়, সমাজ এবং মানব প্রকৃতিতে জ্ঞান রাখতে হয়। তবেই তিনি সত্যিকার জনবরেণ্য রাজনীতিক হতে পারেন। দলীয় রাজনীতিতে ওসব না থাকলেও আজকাল চলে। বরঞ্চ নীতিবান ব্যক্তি দলীয় রাজনীতিতে অনেক সময় অযোগ্য হয়ে পড়েন। দলীয় রাজনীতিবিদদের রাজনীতি এক তরফা, আত্মকেন্দ্রিক, চিত্রের একদিকটাই তাঁরা দেখেন, আপন জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকেই সঠিক মনে করে থাকেন, বিপক্ষের মতামতকে ভ্রান্ত মনে করে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করেন। নিজেদের ব্যর্থতার কারণ নিজেদের কর্মপন্থার মধ্যে অন্বেষণ করেন না, শুধু বিপক্ষকেই দায়ী করেন।

সব রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদই বলে থাকেন তাঁরা দেশ ও জনগণের কল্যাণ কামনা করেন। সকলেরই এক কথা, এক আদর্শ ও এক লক্ষ্য দেশ ও জাতির মঙ্গলসাধন। অথচ যুক্তি পরস্পরবিরোধী, নীতি ও আচরণ ভিন্ন, যদিও পন্থা ভিন্ন হতে পারে। এমনকি ঘোষিত আদর্শ অর্থাৎ জনকল্যাণের প্রকৃতি বা সংজ্ঞা কি তা নিয়েও মতভেদ। অবশ্য বৈষয়িক স্বার্থের প্রশ্নে মতপার্থক্য থাকে না। আসলে সবাই চান নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি, তার সঙ্গে আধিপত্য বা কর্তৃত্ব। প্রকৃতপক্ষে কেউই দেশ ও জনস্বার্থকে আপন ব্যক্তি,

www.pathagar.com

দলীয় ও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধে স্থান দিতে পারেন না। কারণ রাজনীতিকরা সাধারণতঃ রাজনীতিজ্ঞ নন এবং মূলতঃ দেশপ্রেমিকও নন। বিরল ব্যতিক্রম থাকলেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। রাজনীতিকগণ যদি পড়াশোনা করতেন, পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাস ও ধারায় জ্ঞান অর্জন করতেন, দেখতে পেতেন সত্যিকারের নিঃস্বার্থবান রাজনীতিকরা দেশ ও জাতির সামগ্রিক স্বার্থকেই আপন রাজনীতির লক্ষ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে থাকেন। ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের গভীরতা ও চিন্তাশক্তির তারতম্যের কারণেই উন্নত দেশসমূহে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দুই বা তিনের অধিক বড় বেশি থাকে না। আমাদের দেশে একই আদর্শ ও লক্ষ্য অর্থাৎ দেশের মঙ্গলসাধনের জন্য পৌনে একশত রাজনৈতিক দল এবং ততোধিক সংখ্যক ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শী আছেন। প্রকৃত ব্যাপার অবশ্য যা প্রচার করা হয় তা নয়, অন্য কিছু। আসল উদ্দেশ্য হলো কিভাবে রাজনীতি করলে ব্যক্তি ও আপন দলের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধ হয়, দেশ ও জাতির স্বার্থ উপলক্ষ মাত্র এবং উপরে ওঠবার সিড়ি। তা না হলে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে একটা মতৈক্য হয় না কেন? এ পৌনে একশত রাজনৈতিক দল ও শতাধিক মতাদর্শের পরিবর্তে জাতীয় কল্যাণমূলক কর্মসূচীভিত্তিক ঐক্যের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সীমিত নেই কেন? পৃথিবীর উন্নত গণতন্ত্রী দেশসমূহের রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে দলীয় রাজনীতি নেই, কারণ তাদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য দেশ এবং একমাত্র উদ্দেশ্য সামগ্রিক জনকল্যাণ। সুতরাং আছে কর্মসূচীভিত্তিক রাজনীতি, যা জাতীয় নির্বাচনকালে প্রতিযোগী কর্মসূচীর "প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে" খেলার মাঠে প্রতিপক্ষের মত আত্মপ্রকাশ করে, পরস্পর "বিরোধী" দলরূপে নয়। যে কারণে নির্বাচনশেষে বিজয়ী দল সরকার গঠন করলে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদল অভিনন্দন জানায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং সহযোগিতা দিয়ে থাকে। নিজেদের পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করে আপন কর্মসূচীর সম্ভাব্য ত্রুটির মাঝে, বিপক্ষকে দায়ী করে না।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যের মাঝে অসঙ্গতির অনুরূপ সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিকতার বেলায়ও পরস্পর বিরোধী নীতি লক্ষ্য করে আসছি। এ মহলেও যা আদর্শ ও লক্ষ্য বলে ব্যক্ত ও স্বীকৃত, বাস্তবায়নে তা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখতে পাই। বলা হয়ে থাকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সর্বসম্মুখে তুলে ধরাই সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের পেশাগত নৈতিক দায়িত্ব। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম। ব্যক্তিমালিকানার ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক স্বার্থ অথবা দলীয় গোষ্ঠী মালিকানার রাজনৈতিক স্বার্থই সংবাদ মাধ্যমের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে থাকে, দেশ ও জনস্বার্থ গৌণ লক্ষ্য। অবশ্য বিরল ব্যতিক্রমও থাকতে পারে। তবে নিছক জাতীয় স্বার্থ ও নিঃস্বার্থ জনকল্যাণের লক্ষ্যে কয়টি সংবাদপত্র পরিচালিত ও প্রকাশিত হয়? পক্ষান্তরে একজন সাংবাদিকের পেশার মূল মানসিক উৎস ও উহার লক্ষ্য জনস্বার্থ, যদিও পাশাপাশি পরোক্ষ লক্ষ্য থাকে উপার্জনের মাধ্যমে পারিবারিক জনকল্যাণভিত্তিক ব্যক্তিস্বার্থ। সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক এ দুয়ের মধ্যে মাধ্যমগোষ্ঠী (মালিক) স্বাধীন কিন্তু বেতনভোগী সাংবাদিকের মতামত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা প্রথম পক্ষের (মালিকের) মুখ্য লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। সাংবাদিকরা একই বিষয়বস্তু আপন আপন দৃষ্টিকোণে ও মানসিক সংস্কারের ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। তার সাথে যদি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও প্রভাব কিংবা মালিকের স্বার্থযোগ হয় তবে একটি সামাজিক ঘটনা অথবা জনস্বার্থজড়িত সমস্যা রূপান্তরিত হয়ে রাজনৈতিক বিশ্বাস বা কোন বিশেষ সংস্কারের প্রলেপে আসল বিষয়বস্তু বা সমস্যার প্রকৃত সত্তা চাপা পড়ে যেতে পারে। যেমন লোহা বা অন্য কোন ধাতু সোনালী প্রলেপে রূপ নিতে পারে স্বর্ণালংকারে। এমন পরিস্থিতিতে তা আর বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা থাকে না। এ কারণে রাজনৈতিক দর্শনভিত্তিক কোন দলীয় একটি সংবাদপত্রে বিশেষতঃ সম্পাদকীয় বিভাগে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী সাংবাদিক কর্মে

www.pathagar.com

নিয়োজিত থাকলে, অর্থাৎ যা বিশ্বাস করেন তা লিখতে পারেন না, যা বিশ্বাস করেন না তা লেখেন, সে সংবাদপত্রের কথিত আদর্শ ও চিন্তাধারা এবং সংবাদ পরিবেশনার মাঝে সংযোগশীলতা (cohesion) থাকতে পারে না। পরিণামে এক সময় আদর্শের দ্বন্দ্বে আভ্যন্তরীণ কোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে সে সংবাদপত্রের স্বার্থের ও দলীয় রাজনৈতিক আদর্শে আঘাত হানতে পারে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে দেশে সত্যিকার জনকল্যাণকামী নেতা কিংবা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিক চিহ্নিত করা কঠিন। আমার এ ধরনের বিশ্লেষণকে কারো কারো কাছে কঠোর দোষদর্শীতা অভিমত (cynicism) অথবা বিভ্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি (confused thinking) বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আপত্তি করবো না। কারণ, দেশের চলমান রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাংবাদিকতা অঙ্গনে নীতি, রীতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তবিকই আমি এক ধরনের মানসিক ধাঁধায় দীর্ঘকাল যাবত ভুগছি। দুএকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা যাক।

ছাত্রজীবন থেকে কোন পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত না থেকেও লিখবার (freelance writing) অভ্যাস আমার আছে। কখনো কখনো কিছু কিছু রচনা সাময়িকী ও পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। আমার রচনার বৈশিষ্ট্য গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম। গল্প কাহিনী নয়–সামাজিক ও মানবিক সমস্যার বাস্তব পরিস্থিতির চিত্রায়ন। ১৯৫৮-৫৯ সালের সাময়িক শাসন আমলে প্রচলিত প্রশাসন নীতিকে সংস্কার ও ঢেলে সাজাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারী কমিশন কার্যরত ছিল। ঐ সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলাম। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের দেশীয় প্রশাসন পদ্ধতি এবং বিদেশী প্রশাসনের তুলনামূলক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশাসন সংস্কার ও পুনর্গঠনের ওপর আমার রচিত একটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য পরপর তদানীন্তন দৈনিক মর্নিং নিউজ ও পাকিস্তান অবজারভারে দিয়েছিলাম। উভয় দৈনিকের সম্পাদক যথাক্রমে জনাব বদরউদ্দিন ও জনাব আবদুস সালাম আমার অন্তরঙ্গ

www.pathagar.com

বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুজনেই রচনাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন কিন্তু ছাপাতে অপারগতা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বিষয়বস্তুর মূল্য উপলব্ধি করলেন এবং ব্যক্ত অভিমতের সাথে একাত্মতা জানিয়েও প্রকাশে অপারগ, এর কারণ আমার বোধগম্য হলো না। আমি মানসিক ধাঁধায় পড়লাম। তবু হাল না ছেড়ে করাচীতে দৈনিক ডন পত্রিকায় পাঠালাম। এক মাস পরে ডন থেকে রচনাটি সসম্মানে ফেরৎ আসে। কোন রচনা পত্রপত্রিকায় ছাপা হতেও পারে নাও হতে পারে। তবে তা ফেরত পাঠাবার রীতি আছে বলে জানতাম না। এটাও আমার মানসিক ধাঁধার অন্যতম উপকরণ। যা হোক, আপাততঃ নিরাশ হলাম এবং আরো রচনায় উৎসাহ হারালাম।

বেশ বিছুদিন পরে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে ঢাকা স্টেডিয়ামে ডন পত্রিকার সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসেনের (মরহুম) সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি এককালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন এবং বৃটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ডাইরেক্টর থাকাকালে তাঁর অধীনে কিছুকাল সরকারী সাংবাদিকতার কাজও করেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে আমার রচনাটির ঘাটে ঘাটে ধাক্কা খাবার কথা উল্লেখ করলাম। আমার লিখন অভ্যাস ও গুণগতমান সম্পর্কে আগে থেকেই তিনি অবহিত ছিলেন। রচনাটি পড়ে দেখতে চাইলেন। আমি তাঁর আবাসস্থলে তা পৌছে দিলাম। পরদিন নিজেই টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়ে লেখাটি করাচী নিয়ে গেলেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক সরকারের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ডনের বিশেষ সংখ্যায় আমার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রশাসনিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়। প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'নিপা' প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রেফারেন্স দলিলরূপে পুস্তিকাকারে তা প্রকাশ করে। পরবর্তী ইতিহাস রোমাঞ্চকর, যার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

www.pathagar.com

তিন তিনবার ব্যর্থতার পর ডনে রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার অমন সাফল্যে আমি আনন্দিত ও উদ্বুদ্ধ হই। আমার ঐ রচনার জন্য একটা মোটা অংকের সম্মানীও পাই। ঢাকার দুটি দৈনিক পত্রিকা রচনাটি মূল্যবান মনে করেও কেন প্রকাশ করলো না, আবার ডন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ যা প্রত্যাখ্যান করলো স্বয়ং সম্পাদক কেন তা প্রকাশের যোগ্য মনে করলেন এই পৌনঃপুনিক প্রশ্ন আমার মনে দুর্বোধ্য গভীর ধাঁধার সৃষ্টি করলো। এর পর আরো একাধিকবার অনুরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, তার দু একটি উল্লেখ করতে চাই।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর বিশ্লেষণমূলক একটি প্রবন্ধ দেশের একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় দিয়েছিলাম। সম্পাদক সাহেব আমার সাথে একমত প্রকাশ করলেন এবং সমর্থন সূচক আরো কিছু বাড়তি মতামত ব্যক্ত করলেন কিন্তু তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারবেন না বলে দুঃখ জানালেন। প্রবন্ধটি পরে অন্য একটি দৈনিকে ছাপা হয়। কিছু বিদগ্ধ পাঠক বন্ধু মন্তব্য করলেন যে অমন যুক্তিপূর্ণ লেখাটি অন্যকোন জনপ্রিয় পত্রিকায় ছাপাতে দিলাম না কেন? কী বুঝাতে চেয়েছেন বুঝলাম। উক্ত পত্রিকাটি না কি প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদী সংবাদপত্র। কিন্তু জনপ্রিয় ও নিরপেক্ষ প্রগতিশীল মতবাদের মুখপাত্রটি তো রচনাটি প্রকাশের যোগ্য মনে করলো না কিংবা প্রকাশ করতে সাহস পেলো না। পক্ষান্তরে প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিকটি তা ছেপে যে সৎসাহসের পরিচয় ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিচয় দিল, তার মূল্য উপলব্ধি হলো না। বিরুদ্ধ মতবাদী বলে কোন পত্রিকাকে অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশ করলে তার জন্য কৃতিত্ব দিতে কার্পণ্য কেন? রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রেক্ষিতে গ্রহণীয় বা বর্জনীয় হতে পারে এবং তা বোধগম্য। কিন্তু সামাজিক সমস্যা নিয়ে যুক্তি ও অর্থবহ রচনা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কাছে গ্রহণীয় হয় না কেন, তাও আমার জিজ্ঞাসা।

www.pathagar.com

আর একবার এক দৈনিক পত্রিকায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উপর লিখিত উপসম্পাদকীয় একটি রচনা আমাকে আকৃষ্ট করে। উহাতে ব্যক্ত কিছু সত্য মতামত আমার চিন্তাধারার সাথে মিলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহিত হয়ে উক্ত সত্যভাষণের সমর্থনে আরো কিছু তথ্য যোগ করে একটি রচনা (১২.৬১) প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করি। পত্রিকায় যা বলা হয়েছিল তা বাস্তব সত্য। এর সমর্থনে আরো নতুন তথ্য কেউ যোগ করলে তা অভিনন্দিত এবং সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রকাশিত হওয়াই অভিপ্রেত ছিল, যেহেতু বিষয়টি ছিল জাতীয় স্বার্থজড়িত। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যে সংশ্লিষ্ট সম্পাদক (রচয়িতা) সাহেব আমার রচনাটি পছন্দ করেও মনস্থির করতে দীর্ঘদিন সময় নেন। এক পর্যায়ে ছাপাবেন বলে আশ্বাস দিয়েও পরে পত্রিকায় স্থানাভাবের অজুহাতে তাঁর আশ্বাস প্রত্যাহার করে নেন, অবশ্য রচনাটি ফেরৎ দেননি। তার এই মানসিক দোদুল্যমানতার পর্যায়ে উপসম্পাদকীয় রচয়িতার নিষ্ঠায় আমার মনে খটকা জাগলো। হয়তো তাঁর রচনাটির উদ্দেশ্য ছিল একক অভিমত প্রকাশের কৃতিত্বের জন্য বাহবা অর্জন, যেন অপর কেউ অমন মূল্যবান কথন প্রকাশ করতে পারে না, এ যেন সত্যকথনের স্বত্ত্বাধিকারিত্ব ঘোষণা। অর্থাৎ বিশ্বাস না করেও নীতিকথা বলে প্রশংসালাভের লোভই ছিল কাম্য, অন্যায়ের প্রতিকার নয়। রাজনীতি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা জগতে এমন ধারা কপটতার উদাহরণ অবশ্য নতুন নয়। শুধু সে পেশাজীবীকে সনাক্ত করা সহজ নয়।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্বীকৃত ও প্রচারিত আদর্শ এবং সে আদর্শ অনুশীলনের মাঝে বিবৃত অসঙ্গতির রহস্য আমি আজো উদঘাটন করতে পারিনি। সমাজ, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত যা যা ঘটে তার সঠিক চিত্রায়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিণতি তুলে ধরে প্রতিকারের উদ্দেশ্যে অবদান রাখাই তো বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বলে আমি মনে করতাম। আমার এই ধারণা কি ভ্রান্ত? কে দেবে এ প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর? কি

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা, কি রাজনীতি, কি সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ঘোষিত আদর্শ ও নীতি এবং তার অনুশীলনে সঙ্গতি রক্ষায় কারো নৈতিক বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় না। পরিবর্তে উপস্থিত পরিস্থিতির সাময়িক সুযোগ গ্রহণ করে বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের প্রবণতাই বিরাজমান।

ইহার পরেও সরকারের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনে কেন কি ভাবে সময় ক্ষেপন হয়ে থাকে তার একটি বাস্তব নমুনাচিত্র (১২.৬০) রচনা করে উক্ত প্রসিদ্ধ দৈনিকে দিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন পরে স্থানাভাবের কারণে ছাপান যাবে না বলে জানানো হলো। রচনাটি ফেরৎ পাইনি। স্থানাভাবের যুক্তিটি সত্য হতেও পারে। কিন্তু নীতির মাপকাঠিতে আমি মনকে নিশ্চিত বিশ্বাস দিতে পারিনি। কারণ উহা অপেক্ষা দীর্ঘতর গল্প কাহিনী ঐ পত্রিকায় ছাপা হতে দেখেছি। ব্যাপারটি আমাকে বিমূঢ় করে দিল। যদি বলা হতো যে লেখাটি নিরর্থক বাক্যমালা (rubbish) এবং মানের দিকে পত্রিকায় ছাপা হবার যোগ্য নয়, অবাক হতাম না। কারণ, লিখকরূপে আমার খ্যাতি নেই। আমার মনের কুয়াশা আরো ঘনিভূত হয়ে পড়লো। কারো কাছে গেলে হয়তো আমার কিছু শিক্ষালাভ হবে এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ফলে মনের কুয়াশা কেটে যেতে পারে, এই ভরসা ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত এমন একজন খ্যাতিমান ব্যক্তির কাছে গিয়েও কোন ফল পাইনি। ইনি পূর্বোক্ত বিখ্যাত দৈনিকের মালিকও বটেন। তিনি আশাতীত সম্মান ও সৌজন্য দেখালেন, চা পানি আপ্যায়নে আমাকে মুগ্ধ করলেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা বা রচনার ওপর সরাসরি মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন। সাংবাদিকতা, সংবাদ মাধ্যম, রাজনীতি অঙ্গনে তাঁকে একজন নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ব্যক্তি মনে করেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর প্রত্যক্ষ পেশা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আমার অনুসন্ধিৎসাকে সৌজন্যের কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর প্রচারিত আদর্শ ও উহার বাস্তবায়নে আন্তরিকতায় আমার সংশয় সৃষ্টি হলো। নিরাশ হয়ে ফিরে আসি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বনাম বাঙালী জাতীত্ববাদ নিয়ে রচিত অপর একটি রচনা (১২.৪৮) ঐ আদর্শে বিশ্বাসী ও প্রবক্তা দুটি দৈনিকে প্রকাশের জন্য দিয়েও কোন প্রতিক্রিয়া পেলাম না। অবশ্য অন্য একটি দৈনিক পত্রিকা তা সাদরে গ্রহণ করে এবং প্রকাশ করে।

সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে আদর্শ প্রচার ও অনুশীলনের মাঝে এ ধরণের অসঙ্গতি সম্পর্কে আমার এই জিজ্ঞাসা দুজন প্রথিতযশা প্রবীণ সাংবাদিকের কাছে তুলে ধরেও কোন প্রতিক্রিয়া উদ্ধার করতে পারিনি। তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতি আমার ক্ষোভমিশ্রিত কটাক্ষও তাঁদের বিবেককে নাড়া দিতে পারেনি। সাংবাদিক না হয়ে সাংবাদিকতা নিয়ে "অবাঞ্ছিত ঘাঁটাঘাঁটি" অথবা অনধিকার চর্চার জন্য আমাকে কেউ তিরস্কার করারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। ইহার কারণ হতে পারে বিবিধ। যথা–প্রতিবেদক একজন খ্যাতিমান লিখক নন, অথবা গণ্যমান্য সমাজপতি কিংবা রাজনীতিক নন বলে না পড়েই পরিত্যাজ্য মনে করে রচনাটি ফেলে দিয়ে থাকবেন। অথবা পড়ে থাকলে অপ্রিয় এবং অপ্রচলিত সত্য মোকাবেলা করার সৎসাহস ছিল না, অতএব উপেক্ষা করাই নিরাপদ মনে করেছেন। এ অস্পষ্ট পরিবেশে ভুক্তভোগী লেখক যদি ধরে নেয় যে কি রাজনীতি, কি বুদ্ধিবৃত্তি অথবা সাংবাদিকতা, যে কোন ক্ষেত্রেই ঘোষিত নীতি ও উহার অনুশীলনের মাঝে সঙ্গতি বজায় রাখার নৈতিক দায়িত্ববোধ স্বাধীনতার ২৫ বৎসর কালেও এ দেশে গড়ে ওঠেনি, তবে কি তা মানবীয় গুণাবলীতে অবিশ্বাস (cynicism) বলে গণ্য হবে? আমার এ জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়ার অথবা প্রতিবাদ করার মত কোন সৎসাহসী সাংবাদিক ব্যক্তি অথবা আমার মানসিক জড়তা দূর করার মত কোন জ্ঞান-দিশারি আছেন কিনা তা দেখবার প্রতীক্ষায় রইলাম। সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক গোষ্ঠির সমক্ষে কেউ আমার এই বিলাপ বা প্রলাপ তুলে ধরবেন কি না তাও তাঁদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ।

www.pathagar.com

সমাজ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব

১২.৫০ সময়ে সময়ে সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণপত্র পত্রিকার মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত করে থাকেন। এ সকল মন্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে রূঢ় হলেও অপ্রিয় সত্য এবং প্রশংসনীয়।

পড়াশুনা করার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন। শিক্ষার হার বাড়ছে কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে দেশের শুভ পরিবর্তন হচ্ছে না। সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশুনা করলে শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে কর্মজীবনে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারতো। বর্তমানকালে শিক্ষার্থীরা সাধারণতঃ জনগণ ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ অনুভব করে না। সুতরাং এ সত্যটি শিক্ষার্থীদের বুঝাবার দায়িত্ব দেশের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত আছে মনে করি না। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় শিক্ষার্থীদের সে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে দায়িত্বশীল করে গড়বার জন্য তেমন দায়িত্ববান শিক্ষিত সম্প্রদায় কোথায়? যে শিক্ষা মানুষের অন্তরকে বিকশিত করে মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদা জন্ম দেয়, নীতি ও সততার দিকে এগিয়ে নেয়, বিবেককে বন্ধক দিয়ে অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে দেয় না, যে শিক্ষা জ্ঞানদান করে মানবিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে, সেই শিক্ষালাভ করেই শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভ করবে এবং তেমন শিক্ষায় শিক্ষিত জনের সমন্বয়ে গঠিত হবে শিক্ষিত সম্প্রদায়। তেমন শিক্ষা দেশে প্রচলিত আছে কি? প্রশ্নটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীগণ সাধারণতঃ ২০-২২ বৎসরের মধ্যে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। তার পর কেউ শিক্ষাদান, কেউ চাকুরী, কেউ সাংবাদিক, কেউ আইনজীবী বা রাজনীতিক, কেউ ব্যবসায় প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত হয়ে থাকেন। এঁরা

www.pathagar.com

সবাই সম্মিলিতভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়। সম্প্রতিকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবীগণের অধিকাংশের বয়সসীমা ৩৫-৬৫ বৎসরের মধ্যে। ব্যতিক্রম ছাড়া এর ঊর্ধবয়সী শিক্ষিতজন হালের বুদ্ধিজীবী সমাজে অনেকটা সেকেলে এবং গণনার বাইরে। হালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই মোটামোটি বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা লাভ করেছেন অর্থাৎ তাঁদের শিক্ষালাভের সময়কাল মোটামোটি স্বাধীনতা লাভের ২০ বৎসর পূর্ব হতে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত। এ সময়কালে, বিশেষ করে শেষের দিকের শিক্ষার মান ও রীতি কেমন ছিল বা আছে তাহাই বিবেচ্য। আগের দিনে বিদ্যার্থীগণ শিক্ষালাভ করতো বিদ্যালয়ে, যা দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত চালু ছিল। এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেই, তাই শিক্ষার্থীকে শিক্ষা ব্যবসায়ী প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট পরীক্ষাপাশ ও সার্টিফিকেট লাভের বিভিন্ন কলাকৌশলের পাঠ নিতে হয়। সুতরাং হালে জাতির মাঝে জ্ঞান শিক্ষা এবং চরিত্রগঠন শিক্ষা নেই। আছে ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট, যার অর্থ শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন নয়। ৪০-৫০ বৎসর পূর্বে বাল্যশিক্ষা পাঠ্যবইতে যে সকল নীতিকথা মুদ্রিত থাকতো ও শেখানো হতো এখন তা নেই। যেমন, সদা সত্য কথা বলবে, মিথ্যা বলা মহাপাপ, মাতাপিতা, শিক্ষক ও গুরুজনে ভক্তি করবে, পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ মনে করবে, না বলে উহা গ্রহণ করলে চুরি গণ্য হয়, চৌর্যবৃত্তি মহাপাপ, ইত্যাদি। পাঠশালায় নিষ্পাপ বালক বালিকা দলবেঁধে গানের সুরে সমস্বরে তা মুখস্থ আবৃত্তি করতো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোমল অন্তরে সে কথাগুলি বিশ্বাস দানা বেঁধে যেতো। আজকাল বাল্যশিক্ষা পাঠ্যবইতে ঐ সকল নীতিবাক্য নেই। প্রবঞ্চনা, মিথ্যা অর্থাৎ নকল, অপরের রচনা চুরি, হুমকি ধমকির বিনিময়ে পরীক্ষা পাশের নম্বর আদায় প্রভৃতি এখনকার শিক্ষার বাহন। এভাবে শিক্ষালাভ ও ডিগ্রী সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তিই আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পবিত্র পেশায় নিয়োজিত হয়ে থাকেন। ২৫-৪০ বৎসর পূর্বেকার পরিচালিত ও পরিচিত শিক্ষা আজকাল নেই। এ পরিস্থিতিতে সমাজ ও

www.pathagar.com

দেশের প্রতি শিক্ষার্থীগণকে দায়িত্ববোধ শিখাবার মত তেমন শিক্ষিত সম্প্রদায় পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

রাজনৈতিক আন্দোলনকালে ক্ষমতাসীন সরকার বিরোধী যে আচরণ ও ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী ঘটে থাকে তার পক্ষে রাজনৈতিক যুক্তি ও রাজনৈতিক সমর্থন থাকতে পারে এবং তা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যে সকল নির্দোষ নাগরিক সরকারের নীতি বা কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং আন্দোলনকারীদের সাথেও শত্রুতা নেই এবং যাদের জীবিকা অর্জনের অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে, নিজের পরিবার পালনের তাগিদে রাস্তায় বের হয় তাদের যানবাহন ও সরকারী অর্থাৎ জাতীয় ও অন্যান্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থার যানবাহন, মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি ধ্বংসকারিগণের পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক, সহযোগী ও সমর্থকগণ কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সদস্য নহেন? ১৯৯০- ও ১৯৯৫-৯৬ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলনে এমন ধ্বংসলীলা ঘটেছে। সারা দেশে এতগুলি সংবাদপত্রে জাতীয় সম্পদের এমন ধ্বংসলীলার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু নিন্দা খুঁজে পাইনি, যদিও ব্যক্তি পর্যায়ে কেহ কেহ ঐ ব্যাপারে জনবিবেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দাবীদাওয়া ও কর্মসূচী সমর্থন করা যেমন ব্যক্তিগত নাগরিক অধিকার, বিনাশত্রুতায় নিরপেক্ষ নাগরিকের প্রতি অশোভন আচরণ এবং জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের নিন্দা না করাও কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্বের পরিচায়ক?

পরিবর্তিত অবনতিশীল আর্থসামাজিক পরিবেশে ব্যক্তিচরিত্রে অবনতি বিস্তৃতির সাথে সাথে সমষ্টির চরিত্রেও উহার অশুভ প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যক্তি চরিত্র অবক্ষয়ের চাইতে সমষ্টিগত জাতীয় চরিত্রে অবক্ষয় গোটা জাতি ও দেশের জন্য মারাত্মক। এই অধঃপতন আসে মূলতঃ শিক্ষার মানে অবনতি এবং শিক্ষার প্রলেপে কুশিক্ষা প্রসারের ফলে। এখন ডিগ্রী থাকলেও জ্ঞানের শিক্ষা ও মানবিক দায়িত্বপালনের শিক্ষা পরিলক্ষিত নয়। সমাজে

www.pathagar.com

শিক্ষিত সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও সমাজের এ নিম্নমুখী ধাবমান ধস ঠেকাবার মানুষের দারুণ অভাব। মানবিক সত্ত্বার মেধা নিয়ে কেউ জন্ম নিলেও চলমান পঙ্কিল আবর্তে সে মেধা বিকাশের সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ স্রোত ঠেকাতে পারতো অধিক সংখ্যক চরিত্রবান ও প্রবীণ শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিক ও সমাজপতির সমষ্টিতে গঠিত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাঁদেরই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও চরিত্রবান প্রশাসন।

বর্তমান ব্যাপক অনিশ্চয়তার কারণে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মনে সংশয় নিয়েও সমাজের মঙ্গলকামীরূপে আশা পোষণ করছি যে সব দিন এ ভাবে কাটবে না। হয়তো মূল্য দিয়ে হলেও একদিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ আসবে এবং শুভ পরিবর্তন সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

জ্ঞানের ভুবনে জ্ঞাত জ্ঞান অজ্ঞাত জ্ঞানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর

১২.৫১ ১৯৯১ সালের ১০ জুলাই রাতে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে "বাংলাভাষায় বানান বিভ্রাট" এর উপর একটি মনোজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আনন্দের সাথে উপভোগ করছিলাম। তবে "বাংলাভাষার ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় বানান বিভ্রাট নাই" ব্যক্ত এ অভিমতের সাথে একমত পোষণ করতে পারিনি। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বাংলা ভাষাবিদ এবং পণ্ডিতব্যক্তি ছিলেন। পাছে তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় ভেবে নাম উল্লেখ করলাম না। পরিতোষের বিষয় কয়েকদিন পরে আলোচনাটির উপস্থাপকের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। আমার দ্বিমতের অন্তর্নিহিত যথার্থতা স্বীকারে তাঁর উদারতা ছিল, কুপমণ্ডুকাজনিত প্রতিবাদ ছিল না। দ্বিমতের কারণ ব্যাখ্যা করতে চাই।

জ্ঞান অর্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া। যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের সীমানা বা শেষ থাকতে পারে না। যা জানা হয়েছে তা যা জানা হয়নি তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এ চিরন্তন সত্য স্মরণে রেখে যদি বলা হতো যে পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় বাংলা ভাষার ন্যায় এমন বানান বিভ্রাট আছে কি না জানা নেই, তা হলে আপত্তি থাকতো না। অন্য ভাষায়ও যে বানান বিভ্রাট থাকতে পারে তার প্রমাণ ইংরেজী ভাষাতেই রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ভাষা যেমন ইংরেজী তেমন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষাও ইংরেজী। পৃথিবীর অন্য সকল দেশে যে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত তাও এ দু দেশ, দুজাতি ও ভাষা হতে উদ্ভুত। প্রথমটিকে খান্দানী (Kings English) এবং দ্বিতীয়টি উহা হতে প্রজাত সরলীকৃত ইংরেজী বলা যায়। এই দু বলয়ের (sphere) অধিবাসী আপন আপন অঞ্চলে অসুবিধা ভোগ না করলেও অন্য অঞ্চলের ইংরেজী বানান নিয়ে

www.pathagar.com

সঙ্কটে পড়া বিচিত্র নয়। ধরা যাক, একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর (beginner) মনে pillar বানানে 'একটি' না হয়ে দুটি হবে কেন প্রশ্ন জাগলে তার সন্তোষজনক উত্তর কি হবে? উভয় ইংরেজীর মাঝে যেমন বানান ব্যতিক্রম আছে তেমন ভাব প্রকাশেও পার্থক্য রয়েছে। আবার উচ্চারণেও ব্যত্যয় আছে। বানান, ভাবার্থ এবং উচ্চারণজনিত বিভ্রাটের একটু অভিজ্ঞতা পেশ করা হচ্ছেঃ

অপরাপর শিক্ষিত বাঙালীদের ন্যায় আমিও শিখেছিলাম বৃটিশ শাসনামলে খান্দানী ইংরেজী। 'শিক্ষিত' হওয়ার ২০ বৎসর পর যুক্তরাষ্ট্র সরকারে কর্মরত কালে বানান বিভ্রাটের বেড়াজালে আটকে পড়ে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে প্রথম প্রথম দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। উহা ছিল সাময়িক, নতুন পরিবেশে নতুন ইংরেজী (আমেরিকান) ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে সংকট কাটিয়ে উঠলেও স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে ইংরেজী ভাষায় গবেট আখ্যাজনিত বিপাকেও পড়তে হয়েছিল।

বৃটিশ ইংরেজী	আমেরিকান ইংরেজী
labour, colour, centre, armour,	labor, color, center, armor,
aluminium, behaviour, endeavour, favour, favourite, programme etc.	aluminum ,behavior, endeavor, favor, favorite, program etc.

বিকল্প বানান (variant)

realise, realize, realization, organise, organisation, organize, organization etc.	realize, realization, organize, organization etc.

ভাবার্থে পার্থক্য

Proper time সঠিক সময়	Appropriate time
Simple person সরল প্রকৃতি ব্যক্তি	Simple person নির্বোধ ব্যক্তি (harmless or devoid of understanding)

ইত্যাদি

www.pathagar.com

ঢাকা খুলনা রকেট জাহাজযোগে ভ্রমণকালে অপর বাঙালী সহযাত্রীদের সাথে গালগল্পকালে আমার সহকর্মী ও সহযাত্রী এক আমেরিকান মহিলা এক পর্যায়ে এক জনের Americans are simple people এই বন্ধুত্বপূর্ণ মন্তব্যে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর কাছে মন্তব্যটির অর্থ দাঁড়িয়েছিল–আমেরিকানগণ নির্বোধ জাতরূপে। অনিচ্ছাকৃত নিরীহ গোস্তাকী শোধরিয়ে দুজনের মাঝে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমার কিছু সময় লেগেছিল। বানানের ন্যায় উচ্চারণের বিভ্রাটও আছে। যেমন বৃটিশ Schedule (শিডিউল) আমেরিকান Skejool (স্কেজুউল), বৃটিশ (অফেন) আমেরিকান অফটেন, ইত্যাদি।

ভাষা ছাড়া জ্ঞানের অন্যান্য পরিমণ্ডলেও সীমারেখা নেই, যেমন ভূমণ্ডল (the globe) অথবা আবহমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান। মানুষের আয়ত্ত করা বিজ্ঞান বা শাস্ত্রসম্মত স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীতে আরও অজানা সত্য থাকতে পারে বলে সহজে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। ভুগোল শাস্ত্রে আমরা শিখেছি ঋতু পরিবর্তনের ফলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রায় পার্থক্য ঘটে। এ জন্য সংবৎসরে ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন অঞ্চলে বৃক্ষে ফল ধারণে ও ফুল ফোটার তারতম্য ঘটে। যে কারণে মৌসুমী ফল ও মৌসুমী ফুল বলা হয়ে থাকে।

অথচ এই স্বতঃসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ এবং ইহাই শেষ কথা নয়। ভূপৃষ্ঠে এমন স্থান আছে যেখানে ঋতুর পরিবর্তন হয় না বা হলেও অনুভূত হয় না, যার ফলে আবহাওয়ারও পরিবর্তন নেই। যাকে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বলা হয়। মধ্য আফ্রিকায় বিষুবরেখার সমান্তরালে এমন কোন কোন অঞ্চলে, যার মধ্যে উগাণ্ডা অন্যতম, উত্তাপ (গ্রীষ্ম) নেই, ঠাণ্ডাও (শীত) নেই, পাখা বা শীতাতপযন্ত্র নেই। যখন তখন ভাসমান রূপালী মেঘমালা হতে ঝর ঝর বৃষ্টির সাথে উত্তাপহীন ঝকঝকে রৌদ্র। সদা স্পর্শমধুর শীতলতা বিরাজমান। ফলে মৌসুমী ফল বা ফুল বলে কোন কথা নেই। সকল প্রকারের ফল এবং সকল রং এর ফুল সারা বৎসর ধরে ফলে ও ফোটে।

www.pathagar.com

একই সময়ে একই আমগাছে এক ডালে মুকুল, অন্যডালে কচি আম, পাশের ডালে পাকা আম প্রকৃতির বৈচিত্র্য ঘোষণা করে। একান্ত স্বাভাবিক দৃশ্য ও বাস্তব সত্য। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য (গ্রীষ্মকাল) মাস আম ধরে আম পাকে আমাদের মত এমন দেশে কেউ কি বিশ্বাস করতে পারবে এ বর্ণনা? সুতরাং ভূগোল শাস্ত্রে ভূমণ্ডল জ্ঞান অর্জনকারী যাঁরা ওসকল অঞ্চল ভ্রমণ করেন নি এবং বিবৃত দৃশ্য দেখেন নি তাঁদের কাছে ইহা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। প্রকৃত সত্য এই যে আমরা যা পৃড়েছি ও শিখেছি তা সত্য বটে তবে শেষ সত্য নহে। জানিনি ও শিখিনি এমন আরও কিছু থাকতে পারে তা মেনে নেয়াই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয়। কী বিচিত্র সৃষ্ট এ ধরণীমণ্ডল এবং বিচিত্র ও সীমাহীন বিশ্ব (universe) সম্পর্কে আমাদের অজানা জ্ঞানও কত সীমাবদ্ধ!! কত মহাজ্ঞানী উহার সৃষ্টিকর্তা !!! যিনি সৃষ্টিলগ্নেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন–"যে তিনি যা জানেন মানুষ তা জানে না"। এমন কি দেবদূতগণও জানেন না। মানবজাতির যাকে যতটুকু জ্ঞান তিনি দিয়েছেন ও শিখিয়েছেন তার বাইরে আরও অনেক অজানা জ্ঞান রয়েছে বিনীত চিত্তে তা স্বীকার করাই প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচায়ক।

www.pathagar.com

মানব সৃষ্টিধারা প্রবহমানে কন্যাসন্তানের অবদান

১২.৫২ মানব সৃষ্টির অবধারিত নিয়মে জন্মের পর মানব সন্তান স্বাভাবিক ভাবেই (automatically) দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। একটি বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে পুরুষ সন্তান, অপরটি প্রাপ্ত হয় কন্যা সন্তান। পুরুষ সন্তান বংশধারাকে মৌলিক খাতে অব্যাহত রক্ষাকল্পে পিতৃকূলেই জীবনক্ষেত্র স্থিতি রাখে। অপর দিকে মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতার প্রবাহ প্রসারকল্পে কন্যাসন্তান আপন পিতৃকূল ত্যাগ করে অজানা পরিবেশে স্বামীর গৃহে গিয়ে যৌথজীবন যাত্রায় ব্রতী হয়। বিধাতার নিয়মে এ উদ্দেশ্যেই কন্যাসন্তানের জন্ম এবং ইহাই তার জন্মের সার্থকতা। পিতৃগৃহে জন্মলাভ করলেও অনাগত নির্ধারিত লক্ষ্যেই মাতৃক্রোড়ে লালিত পালিত হয়ে থাকে। অচেনা অপরের গৃহে গিয়ে আপন ঘর বাঁধার জন্যই মাতার কাছে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কন্যা সন্তানের পিতামাতাও বিধাতার নির্ধারিত ঐ একই উদ্দেশ্যে কন্যাকে যথাসময়ে পরের হাতে তুলে দেবার উপযোগী করে আপন সন্তানকে গড়ে তোলেন। নিজের ধন অপরকে উপহার দেয়ার জন্য অতি আদর যত্নে তৈরী করে থাকেন, যাতে অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে পিতৃকূলের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে পর প্রজন্মের জন্য আদর্শ স্থাপন করতে পারে। এমন মহান আত্মত্যাগ কেবলমাত্র পিতামাতাই করতে পারেন। ইহা কন্যা সন্তানের জন্য পিতামাতার প্রতি বিধাতার নির্দেশিত কর্তব্য, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, ইহাই ধর্মীয় অনুশাসন, ইহাই পারিবারিক, সামাজিক ও মানবিক বিধি এবং স্রষ্টার বিধান। এজন্য মানব সমাজে কন্যাসন্তানকে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা–মাতৃত্বের সিংহাসন–প্রদান করা হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক দর্শনে সন্তানের বেহেশত মাতার পদতলে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সন্তানের কাছে পিতা ও মাতা উভয়েই সমতুল্য পূজনীয়। তা সত্ত্বেও যখন মহানবীকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করা

www.pathagar.com

হয়েছিল–পিতা এবং মাতার মধ্যে কার মর্যাদা বেশী, তিনি সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ বলেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজ্‌দা করার অনুমোদন থাকলে তিনি মাতাকেই সেজদা করার অনুমতি দিতেন।

জাগতিক ও সামাজিক নীতিবলে বিবাহের পর কন্যা সন্তানের পিতৃবংশ পরিচয় আপনা আপনি খসে পড়ে এবং স্বামীর বংশ পরিচিতি ও উপাধি তার ওপর বর্তায়। একজন ডাঃ রশীদের অবিবাহিতা কন্যা তাহমীনা রশিদ বিয়ের পর আহমদ হোসেনের স্ত্রী হয়ে মিসেস তাহমীনা হোসেন হয়ে যান। বিদেশীদের অনুকরণেই এই নীতি চালু হয়েছে বলে মনে হয়। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে মুসলিম সমাজে এ প্রথা ছিল কি না সন্দেহ রয়েছে। পিতা মাতাকে ছেড়ে স্বামীগৃহে গিয়ে মাতা হন, স্বামীর বংশে অন্যতম স্বত্ত্বাধিকারী সদস্য ও মর্যাদা অর্জন করেন এবং বংশধারা অর্থাৎ মানবসৃষ্টিধারা প্রবহমান রাখেন। পৃথিবীতে এবং মানব সমাজে একজন মানবসন্তান পিতা এবং পিতার পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারী হয়, মাতার পিতৃকূলের উত্তরাধিকারী হয় না, যদিও এর ব্যতিক্রম আছে এবং পরিস্থিতির বিরল পরিক্ষেত্রে সম্পদের স্বত্ত্বাধিকারী হতে পারে তবে বংশসত্তার উত্তরাধিকারী হয় না। পিতৃসম্পদ এবং স্বামী সম্পদ উভয় ক্ষেত্রে নারীর যুগপৎ উত্তরাধিকারিত্বের বিধান করে ইসলাম নারীকে পুরুষের অধিক মর্যাদা দিয়েছে। পুত্র–কন্যার সংখ্যা নির্বিশেষে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে কন্যাসন্তান পুত্র সন্তানের প্রাপ্য হিস্যার অর্ধেক পরিমাণ উত্তরাধিকারিত্ব বাধ্যতামূলক। আবার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৮ (দু'আনা) হিস্যা উত্তরাধিকারিত্ব বাধ্যতামূলক।

স্বামীর পিতৃকূল এবং স্বামীর গৃহই বিবাহিতা কন্যাসন্তানের স্থায়ী আবাস, আইনসিদ্ধ এবং নৈতিক কর্তৃত্বস্থল, ভাবি বংশধারার ভিত্তি এবং স্বামীর পরিজন অধ্যুসিত পরিবেশই তাঁর জন্য গৌরবময় কর্মক্ষেত্র ও নিবাস। আপন অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচিতি (identity) স্বামীর নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়, ফেলে আসা জন্মকূল পিতার নামে হয় না। জন্মদাতা পিতা এবং পালনকারিণী মাতার

www.pathagar.com

সাথে কেবলমাত্র স্নেহমমতা (filial) ও হৃদয়গত এবং মানবিক সম্পর্কই বজায় থাকে, কোন আইনসিদ্ধ বন্ধন থাকে না। আইনসিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় স্বামীর সাথে। অতঃপর সন্তান জন্ম হলে তার মাধ্যমে স্বামীর বংশের সাথে আইনসিদ্ধ ও সমাজবদ্ধ ঐতিহ্যগত সম্পর্ক, বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। পুত্র সন্তান জন্মালে স্বামীর বংশধারা বজায় রাখার কর্তব্যে তাকে গড়ে তোলেন আর কন্যা সন্তান হলে আপন জননীর মত পরের হাতে তুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে গড়ে তোলেন, স্বেচ্ছায় এবং অতি আগ্রহে আপন স্বার্থ ও আত্মত্যাগে নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করে থাকেন। ইহাই মাতৃত্বের ভূমিকা এবং সৃষ্টির প্রতি মাতৃজাতির মহান অবদান।

কন্যাসন্তানের প্রকৃত হিতৈষী পিতামাতা এ পবিত্র (divine) বাধ্যবাধকতা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে কন্যা সন্তানকে সেভাবে প্রশিক্ষণ দান এবং প্রস্তুত করে থাকেন। অনাগত অজানা ও ভিন্ন পরিবেশ গ্রহণে তাকে সাহায্য করেন। অর্থাৎ তাঁরা আপন সংসার যে ভাবে গড়েছেন কন্যাকেও সে নীতিতে নতুন জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন এবং তাই অভিপ্রেত ও স্বাভাবিক, যদিও কিছু কিছু ব্যতিক্রমও সমাজে দেখা যায়। যে পিতামাতা স্নেহে অন্ধ হয়ে অথবা আপন গোত্রীয় অহমিকার (family pride) বশবর্তী হয়ে কন্যার বিয়ের পর তাকে ধরে রাখতে অথবা নিজেদের দিকে আকর্ষণ করে স্বামীর বংশ পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন রেখে তাকে "কক্ষচ্যুত" করতে চান, তাঁরা প্রকৃত হিতৈষী পিতামাতা নন। স্বার্থ ও আত্মত্যাগী উৎসর্গমনা না হয়ে তাঁরা আধিপত্যমনা (possessive), প্রকারান্তরে স্বার্থপর পিতামাতা। কারণ, এ ধরনের পরিবেশে সে কন্যার সন্তান আপন পিতৃবংশের বৈধ, ন্যায্য গর্ববোধক প্রভাবলাভে বঞ্চিত হয়; "না ঘরকা না বাহের কা" অস্থিতিশীল আত্মসত্ত্বা প্রকৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠে। আপন জন্ম সত্ত্বা (filial link) উপলব্ধি এবং আত্মমর্যাদাবোধ করবার মানসিক দৃঢ়তা পায়

www.pathagar.com

না, ফলে তার অন্তরে আত্মবিশ্বাস ও বংশগৌরববোধ জন্মায় না। বয়প্রাপ্ত হয়ে সে পিতৃ বা মাতৃ কোন পক্ষকেই মনেপ্রাণে ও নিবিড়ভাবে আপন করে নিতে পারে না। ফলে স্বমুখী প্রবণতার পরিবর্তে বহির্মুখী চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের শিকার হয়। এমন পরিবেশে লালিত পালিত মানব সন্তান কিছুটা শিকড়হীন (rootless) প্রবণতা প্রাপ্ত হয়, স্বীয় বংশ ও গোত্র, আপন সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি কোন অনুরাগ এবং দায়িত্ববোধ অনুভব করে না। এ ধরনের পরিবেশে লালিত সন্তান পিতামাতার প্রতি আসক্তি হারিয়ে ফেলে। পুত্র সন্তান হলে ধীরে ধীরে মাতার প্রতি স্নেহের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

আধুনিককালের আত্মগত ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সামাজিক পরিবেশে অনেক পিতামাতা এবং তাদের কন্যাকে নিজেদের অজ্ঞাতেই উল্লিখিত অশুভ প্রবণতায় আচ্ছন্ন হতে দেখা যায়। কোন কোন বিত্তশালী গোত্রীয় অহমিকাগ্রস্ত অথচ সু-শিক্ষিত পরিবারে কন্যার বিবাহ প্রাক্কালে কন্যাকে এমন ধরনের বিকৃত প্রবণতায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রস্তাবিত পাত্রকে সে আধুনিক আদর্শে আকৃষ্ট প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রীপক্ষের মাপকাঠির 'সুপাত্র' নির্বাচনে অনিশ্চয়তা অথবা ভ্রান্তির দরুণ বয়স্থা কন্যার বিবাহে বিলম্ব ঘটে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরল প্রকৃতির পাত্র এমন ফাঁদে পড়লেও পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গরমিলের কারণে বিবাহোত্তর দাম্পত্যজীবনে দুর্বিসহ অশান্তি সৃষ্টি হয়, যা তাদের সন্তানের মানস মস্তিষ্কে এবং চরিত্রে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এবম্বিদ পরিবেশে জাত শিশুসন্তান পিতামাতার সম্মিলিত বিশুদ্ধ (unalloyed) অপত্যস্নেহে বঞ্চিত হয়ে দ্বিধারা আচরণে মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং পরিশেষে অপরাধপ্রবণ (dilinquent) হয়ে পড়ে। সৎ এবং সফল পিতার যোগ্যতা ও সৎচরিত্রের প্রভাব সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত হতে পারে একমাত্র স্বামীঅনুরক্ত স্নেহশীলা জননীর পরিচর্যার

www.pathagar.com

মাধ্যমেই। যেখানে উহার অনুপস্থিতি বা অভাব সেখানে সন্তান বিপথগামী হওয়া স্বাভাবিক।

পরিতাপের বিষয় এই যে সাম্প্রতিককালের শিক্ষিত এবং নব্য সম্ভ্রান্ত আধুনিক সমাজ ও পরিবারে সনাতনী নীতি আচরণের প্রতি সম্মান এবং তার অনুশীলন ধীরে ধীরে সেকেলে (obsolete) সুতরাং পরিত্যাজ্য সংস্কার বলে গণ্য হয়ে পড়ছে। যার বিরূপ পরিণতিতে পারিবারিক বাৎসল্যবন্ধন, বংশ মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে পারিবারিক কোন্দল, গৃহবিবাদ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্নেহের আকর্ষণ, আনুগত্য ও শ্রদ্ধার অনুপস্থিতি এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে সমাজে অশান্তি বেড়ে চলেছে। হয়তো এখনো সময় আছে বিবেকবান স্নেহশীল পিতামাতা এবং সদ্য বিবাহিতা কন্যা ও আগামী সন্তানের মাতাকে এ দিকে মনোনিবেশ করার ও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ শেষ হয়ে যায় নি বলে আশা রাখি। নিজেদের এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্তানদের মঙ্গলের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ স্থিতি রাখার উদ্দেশ্যেই তাদের ইহা কাম্য হওয়া উচিত।

অতএব যে কোন কন্যা সন্তানের স্নেহশীল ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পিতামাতা মানবজীবনের বিবৃত বৈশিষ্ট্যাবলী স্মরণে রেখে কন্যাসন্তানকে তার বিধেয় (rightful), স্বাভাবিক এবং বিধি নির্ধারিত ভূমিকা পালনে সহায়তাকরণকে আল্লাহতালার এবাদতের অন্যতম উপাদান মনে করতে পারেন। কন্যাকে নিজেদের দিকে না টেনে স্বামী ও স্বামীর পরিজন ও বংশের দিকে এগিয়ে দেয়াই হবে প্রকৃত মমতাময় হিতাকাঙ্খী পিতামাতার কর্তব্য। পাশাপাশি বিবাহিতা কন্যাকেও আপন পুত্র সন্তানের অন্তরে তার আপন বংশগৌরব উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে স্বামীর পরিবার ও বংশকে আপন জীবন, ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্ররূপে বরণ করে নিয়ে পুত্র সন্তানের হৃদয়ে মাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ঘনীভূত ও স্থায়ীকরণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে একটি দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ও কর্তব্য পরায়ণ স্বামী ও শ্বশুর পরিবারেই বিবৃত ও ইপ্সিত আদর্শ, মানবিক পরিবেশ ও পরিণতি আশা করা যেতে পারে। বর্তমানকালে যৌতুকের জন্য স্বামী ও শ্বশুর পরিবারে ক্রমবর্ধমান মানসিক নির্যাতন ও দৈহিক নিপীড়ন প্রবণতার কারণে বিবাহিতা কন্যা সন্তানের পক্ষে সৃষ্টিধারা রক্ষায় আদর্শ মাতৃত্বের অবদান রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। সমাজের সকল পরিবারে এ ব্যাপারে সচেতনতা ও শুভবুদ্ধি জাগরুক হোক, একামনা করি।

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ও সামাজিক তথ্যচিত্র

১২.৫৩ সময় কাল ১৯৪৯-৫০ সাল। বৃটিশ ভারত বিভাগের পূর্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেট জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেলার শাসন পদ্ধতি ও সামাজিক প্রথা বাংলা প্রদেশের সদৃশ ছিল না, কিছুটা ভিন্নতর এবং বিশেষ ধরনের ছিল। সমগ্র আসাম প্রদেশে সিলেট অধিবাসীগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত ও উন্নত ছিলেন বলে প্রশাসনে তাঁদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি জেলা ও মহকুমা প্রশাসক পদে দীর্ঘকাল একই কর্মস্থলে অধিষ্ঠিত থাকতেন। ফলে প্রশাসনে তাঁর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিফলিত হতো, যা ছিল ক্ষুদে স্বৈরতন্ত্র তুল্য (minidespotism) । বৃটিশ শাসনে প্রচলিত তিন বছর বা নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে কর্মস্থল পরিবর্তনের রীতি সিলেটে তথা আসামে সাধারণতঃ কার্যকর ছিল না। একজন জেলা বা মহকুমা প্রশাসক এক নাগাড়ে একযুগ কাল একই কর্মস্থলে থেকে একচ্ছত্র রাজত্ব করতেন বলে জানা গেছে। তাঁর অধীন কর্মকর্তা, আমলা নির্বাচন ও নিয়োগ তিনিই করতেন এবং তাঁরাও দীর্ঘকাল একই কর্মস্থলে একই কর্ম নির্বাহ করতেন, ফলে এক প্রকার গোষ্ঠি প্রশাসন (coterie system) বা পারিবারিক সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল।

১৯৪৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রথা পূর্বের মতই থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়, তবে সনাতনি প্রথা ও আচার নীতিই প্রাধান্য পাচ্ছিল। পাঞ্জাবী আইসিএস জেলা প্রশাসক জনাব খুরশীদ ব্যতীত সকল সরকারী কর্মকর্তা স্থানীয় এবং বহুকাল যাবত একই স্থলে কর্মরত থাকেন। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য স্থান হতে কোন কর্মকর্তা বদলী হয়ে

www.pathagar.com

সিলেটে আগমনকে স্থানীয়দের কাছে ঐতিহ্যবাহী নীতিভঙ্গ বলে বিবেচিত হতো এবং আগন্তুকের বিরূপ সংবর্ধনা মিলতো। স্থানীয় কর্মকর্তা, আমলা এবং জেলার অধিবাসিগণ আগত কর্মকর্তাকে অনভিপ্রেত বহিরাগত (alien) মনে করতো। এমনকি স্বয়ং জেলা প্রশাসক জনাব খুরশীদও নাকি দীর্ঘ ১৬ বৎসর একাধারে প্রশাসন চালাবার পর তাঁর স্থানান্তরের সরকারী নির্দেশকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। পাকিস্তান শাসনামলের প্রথম জেলা প্রশাসকরূপে জনাব হামীদ হাসান নোমানী খুরশীদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসলে প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে তাঁরই কাছে জেনেছি। প্রশাসনের সর্বত্র, এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই বহিরাগত বিদ্বেষ ছিল। বদলী হয়ে আগত সরকারী কর্মকর্তাগণ তাঁদের সন্তান বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে বেগ পেতেন। সরকারী জেলা স্কুলের সিলেট অধিবাসী প্রধান শিক্ষক গ্রন্থকারের পরিবারের ছেলেকে ভর্তি করতে অস্বীকার করেছিলেন, যদিও প্রশাসনিক চাপের মুখে তা টেকেনি।

সামাজিক কাঠামোও ছিল সামন্তপ্রথাভিত্তিক। গোটা জনগোষ্ঠি ছিল দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্তঃ আশরাফ (ভদ্র বা উচ্চ) ও আতরাফ (নিম্ন বা সাধারণ শ্রেণী)। জমিদার, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি স্বত্ত্বভোগী তথা কর্তৃত্বের অধিকারী ও প্রয়োগকারী এবং উচ্চস্তরের চাকুরী ও পেশাজীবীগণ সাধারণতঃ বলতে গেলে আশরাফ শ্রেণীভুক্ত। কৃষিকার্য, তুমি ব্যবহারকারী, ফসল উৎপাদনকারী, মৎস্যজীবী (fisheries)ও মৎস্য ব্যবসায়ী, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি ছিল আতরাফ শ্রেণীভুক্ত। কিছু বিরল ব্যতিক্রম হয়তো থাকতে পারে তবে তা পৃথকযোগ্য (discernible) ছিল না। প্রশাসন কাঠামো এবং সামাজিক আচার রীতিতে শ্রেণীবিভক্তি প্রতিফলিত হলেও সামাজিক প্রথা বা দেশাচারেই এর প্রতিফলন ছিল বেশী প্রকট। সামাজিক সামন্ত প্রথার ২/১ টি দৃষ্টান্ত উপভোগ্য হতে পারে বলে উল্লেখ করা হলোঃ

www.pathagar.com

ক) সরকারী পরিদর্শন ভ্রমণকালে সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধরমপাশা এলাকার জমিদার জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরীর আমন্ত্রণ রক্ষাকল্পে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে যাই। নদী হাওর বিল প্রধান এ অঞ্চলে একমাত্র জলপথেই ভ্রমণ করতে হতো বলে সাধারণতঃ বিভিন্ন বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা একত্রে সরকারী জলযানে (লঞ্চে) ভ্রমণ করতেন। আমার কর্তৃত্বাধীন একটি সরকারী লঞ্চ ছিল। সুতরাং মহকুমা সদরের আরোও কয়েকজন কর্মকর্তা আমার সরকারী সফরসাথী ছিলেন। হান্নান চৌধুরীর বৈঠকখানায় অভ্যাগত অতিথিজনের জন্য আসন ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সরকারী পদ এবং সামাজিক মর্যাদার রীতিতে (in order of precedence) সাজান হয়েছিল। আমাদিগকে সেই রীতিতে আসন গ্রহণ করতে সাহায্য করা হলো। স্থানীয় অভ্যাগতগণকে প্রবেশ দ্বার হতে মাথা নত বা কুর্নিশ করতে করতে অগ্রসর হয়ে নির্দিষ্ট আসনে বা স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখলাম। যার যার শ্রেণীভুক্ত আসন থাকলেও নিমন্ত্রণকর্তার (host) অনুমতি ইঙ্গিতের পূর্বে অথবা তিনি স্বয়ং আসন গ্রহণ করার পূর্বে বসবার রীতি ছিল না। ইহা অবশ্য সার্বিক (universal) সৌজন্যরীতি। সামন্তরীতিতে অনভ্যস্ত এ যুগের শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে মানুষে মানুষে এমন শ্রেণীভেদ দৃষ্টিকটু মনে হলেও অজপাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দর শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক আদবকায়দা (protocol) প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, সন্দেহ নেই।

খ) সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মৎস্যচাষ পেশাজীবী, স্থানীয় ভাষায় (মাহেগীর), সম্পদশালী ও মার্জিত আচার সম্পন্ন জনৈক ব্যক্তি লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। অন্য সকল সদস্য সামাজিক পর্যায়ে তাঁর চেয়ে উচ্চশ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তাঁদের সাথে সমমর্যাদা সম্পন্ন আসন পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত নয় বিধায় তিনি নিজেই তার ব্যবস্থা করেন, তাঁর ভৃত্য বাড়ী হতে একখানা চেয়ার অধিবেশনস্থলে বহন করে আনতো, তিনি তাতে আসন গ্রহণ করে সহ সভাসদদের সাথে কার্য নির্বাহ করতেন, সভাশেষে ভৃত্য চেয়ার নিয়ে যেতো।

www.pathagar.com

এধরনের বিসদৃশ কার্যপ্রকরণে কোন পক্ষই অপ্রতিভ বোধ করতেন না, যেন ইহা বিধাতার নির্ধারিত বিধান।

গ) হাওর এলাকা হতে জনভোটে নির্বাচিত জনৈক সংসদ সদস্য এবং পার্লামেন্টারী সচিব আতরাফ গোষ্ঠি বংশোদ্ভুত ছিলেন, তিনি উচ্চশিক্ষিতও ছিলেন। তথাপি সামাজিক সামন্ত দেশাচার তাঁর প্রতি আপোস মনোভাব দেখায়নি। স্থানীয় এক আশরাফগোত্র পরিবারে অভ্যাগতরূপে বসবার জন্য তিনি চেয়ারের পরিবর্তে বেতের মোড়া পেয়েছিলেন।

ঘ) একাধারে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য এবং পেশায় আইনজীবী জনৈক গণ্যব্যক্তি একবার দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে সরকারী লঞ্চে আমার সফর সঙ্গী ছিলেন। তাঁর সৌজন্যে তাঁরই শ্বশুরালয়ে আতিথ্যভোগ কালে বিস্তীর্ণ এলাকার কোথাও কোন বিদ্যালয় দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হই। সমবেত উৎসুক গ্রামবাসীদের দিকে ইঙ্গিত করে লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই কেন জানতে চাইলাম। তিনি নির্বিকারভাবে জানালেন যে, আ'মলোকের লেখাপড়া শিখবার নিয়ম নেই, তারা লেখাপড়া শিখলে সামাজিক কাঠামো এবং শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে।

ঙ) অন্যান্য বিরাজমান (extant) সামাজিক প্রথার মধ্যে খাদেমা বিবাহ এবং নানকার প্রথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। উচ্চশ্রেণীর পরিবারে একাধিক বিবাহের অন্যতম ছিল পরিচারিকা বিবাহ এবং সেই বধূ খাদেমা বিবি নামে আখ্যায়িত হতেন। তবে মজার ব্যাপার হলো যে খাদেমা বিবাহ আইন ও শরিয়ৎসিদ্ধ হলেও এ প্রকার বিবাহজাত সন্তান পিতার ভূসম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব সামাজিকভাবে স্বীকৃত হতো না। কেউ প্রতিবাদ কিংবা দাবী করে আইনের আশ্রয় নিতো বা নিয়েছে কিনা জানবার সুযোগ হয়নি।

www.pathagar.com

স্থায়ী ভৃত্যবৃত্তির ন্যায় ভূমিকর বা খাজনা না দিয়ে ভূমি ভোগদখলের বিনিময়ে ভূমির মালিকের পরিবারে স্থায়ী পরিচর্যা বৃত্তির ন্যায় পিতা মাতা পুত্র কন্যাকে বংশ পরম্পরায় পরিচারক পরিচারিকারূপে শ্রমদানের প্রথা প্রচলিত দেখেছি। স্মরণাতীতকাল হতে যা 'নানকার' প্রথা নামে অভিহিত। ইহা একটি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক স্বীকৃত প্রথা যাতে কোন কোন ক্ষেত্রে অতি মধুর স্নেহ ও মানবিক সম্পর্ক বিরাজ করতো। পঞ্চাশ দশকে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়। আন্দোলনের মুখে সেই সঙ্গে নানকার প্রথাও বিলোপ যায়।

বিবৃত উপাখ্যানসমূহ বর্তমানকাল (১৯৯৭) হতে ৫০ বৎসর এবং তারও পূর্বেকার সামাজিক চিত্র। ইহার সারকথা হলো প্রশাসনিক ও সামাজিক প্রথা প্রাচীন সামন্ত সংস্কারে আবৃত ছিল। অবশ্য আশরাফগোষ্ঠির মধ্যে সীমিত সংখ্যক উদারচেতা, নমস্য ব্যক্তিত্ব তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণে, লিখনে ও বাচনে সামাজিক দেশাচারের রক্ষণশীলতা পরিহার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের পক্ষে অবদান রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এঁদের মধ্যে দার্শনিক, সাহিত্যিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রয়াত সাংবাদিক সাহিত্যিক মকবুল হোসেন, গীতিকবিতা লেখক দেওয়ান হাসন রাজা, সদরের পাবলিক প্রসিকিউটার খান বাহাদুর আবদুল হাইর বিদূষী স্ত্রী বেগম জোবেদার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলের সাথে পরিচয় ও সাহচর্যলাভের সুযোগের মাধ্যমে আমার এ উপলব্ধি জন্মেছে। সময়ের বিবর্তন এবং বিভাগোত্তর দেশের অপরাপর অংশের সাথে প্রশাসনিক, বৈবাহিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতর মেলামেশার ফলে এতদিনে আগেরকার কালের দৃষ্টিকটু ও প্রকট সামাজিক শ্রেণী পার্থক্য তেমন হয়তো আর নেই। অবশ্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অধিবাসিগণের ন্যায় সিলেট অধিবাসীগণের স্থানীয় ভাষা, উহার উচ্চারণভঙ্গি ও স্বরধ্বনির (phonetics) নিজস্ব বৈশিষ্ট্যজনিত স্বাতন্ত্র্য বজায় রয়েছে এবং থাকবে। কুষ্টিয়ার অধিবাসী আমার এক ছাত্রবন্ধু জীবনে প্রথম

www.pathagar.com

একবার চট্টগ্রাম বেড়াতে গিয়েছিল। কোলকাতা ফিরে গিয়ে বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে আমাকে বলে, "চট্টগ্রাম তো বাংলা প্রদেশেরই একটা অংশ কিন্তু ওখানকার স্থানীয় লোক যে ভাষায় কথা বলে তাতো বাংলাভাষা মনে হলো না। উল্লিখিত তিনটি জেলার স্থানীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা দিয়ে তার বিস্ময় কৌতূহল নিরসন করলাম।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গঃ ব্ল্যাশফ্যামী বনাম মুরতাদ বা স্বধর্মত্যাগী

১২.৫৪ প্রসঙ্গটি আন্তর্জাতিক এবং সর্বকালব্যাপী। সাম্প্রতিককালে সালমান রুশদীর ভবেঘুরেমি (vagrancy) এবং পলায়নপরতা আন্তর্জাতিক রূপ নেয়ার পাশাপাশি তাসলিমা নাসরিনের অনুরক্তজন তার স্বোপার্জিত মর্মযাতনা তুলে ধরে স্তিমিত হয়ে পড়া প্রসঙ্গটিকে এ আঞ্চলিক পরিবেশে মাঝে মাঝে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস পায়। ভারতীয় পত্রপত্রিকা ইণ্ডিয়া টুডে এবং স্টেটসম্যান ১৯৯৬ মে মাসের সংবাদ মন্তব্যে জানা যায় ভারতের আহমেদাবাদের যশস্বী উর্দুকবি মোহাম্মদ আলভীর একটি গজলের অংশ বিশেষের ভাষা নিয়ে একই প্রসঙ্গে বিতর্কের ঢেউ ওঠেছিল। সকল দেশে সকল সমাজে কখনো কখনো একশ্রেণীর লেখাপড়া জানা ২/১ জন মানুষ থাকে যারা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বিতর্কের সৃষ্টি করে আপন বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচিতি প্রকাশ করে আনন্দ পেয়ে থাকে।

ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার অথবা ধর্মনিন্দাকেই ব্ল্যাশফ্যামী বলা হয়। ধর্মবিশ্বাস (Faith in the existence and authority of the creator), অবিশ্বাস (infidelity), বা বিধর্মী (heretic), স্বধর্মত্যাগ (apostasy), ধর্মান্তর প্রভৃতি শব্দনিচয় পরস্পর বিরোধার্থক অথচ সম্পৃক্ত। শাদা ও কালো যেমন পরস্পর বিপরীত বস্তু আবার একের অবর্তমানে অপর পরিচিতিহীন।

ধর্মবিশ্বাস কি এবং ধর্মবিশ্বাসী কে? বিশ্বচরাচর (the universe) স্রষ্টার অস্তিত্বে এবং সৃষ্টজগতের ওপর স্রষ্টার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে (Supreme Being) বিশ্বাস করণই ধর্মবিশ্বাস এবং তেমন বিশ্বাসকারী যে কোন মানব বা মানবসম্প্রদায়কে ধর্মবিশ্বাসী বলা হয়। এ নীতি সংজ্ঞায় ইহুদী, খৃস্টান, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি সকল মানুষই ধর্মবিশ্বাসী। তবে বিশ্বাসের উপলব্ধি, অনুভূতি ও প্রকারভেদে পার্থক্য থাকে যেমন, কোন

www.pathagar.com

কোন ধর্মানুসারী স্রষ্টার অস্তিত্বে এবং ক্ষমতায় বিশ্বাস করেও তার কর্তৃত্বপালনে অংশীদার (শেরেক) বা সহযোগী আছে বলেও আস্থা পোষণ করে থাকে। মূল অস্তিত্ব মতবাদে ঐক্য থাকলেও ইসলাম স্রষ্টার অংশীদারিত্ব মানে না এবং তাঁর কর্তৃত্বে এবং মৃত্যুর পরেও মানবের অনন্ত জীবন, জীবৎকালের কর্মফল ভোগ ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে। যে বা যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বা তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে না সে বা তারা অবিশ্বাসী বা atheist। আবার যে আপন ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে এবং উহার নীতিবাদকে প্রকাশ্যে নিন্দা করে (denounce) সে স্বধর্মত্যাগী (apostate), ইসলামিক পরিভাষায় "মুরতাদ" অর্থাৎ বিশ্বাসের পথ হতে প্রত্যাবর্তনকারী। (কোরআন-সুরা বাকারা আয়াত ২১৭)।

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বুদ্ধি বিবেক বিচার বিবেচনা শক্তি দিয়ে উহা ব্যবহারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। অন্যান্য সৃষ্ট প্রাণীকে তা দেন নি, এমন কি ফেরেশতাগণকেও না। এজন্য মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফউল মখলুকাত। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং নিরঙ্কুশ প্রভুত্বে স্বীকার করা না করায় যে কোন মানুষের স্বাধীন অধিকার আছে, যা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা। পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের সবাই বিশ্বাসী নয়, আবার সবাই অবিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবাইকে স্রষ্টা লালন-পালন করে থাকেন। ইচ্ছা করলে তিনি সব বিশ্বাসীগণকে রেখে সকল অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, তা করেন না, তাতে প্রভুত্বের একচ্ছত্রতা, সার্বভৌমত্ব এবং নিরপেক্ষতায় অপূর্ণতা থেকে যেতো। যে প্রভু অনুগত ভৃত্য এবং অবাধ্য ভৃত্য উভয়কে অন্ন যোগান তিনিই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ পালনকর্তা।

প্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে, তাঁকে কেউ না মানলে তাঁর কিছু আসে যায় না। তাঁর প্রভুত্বে কিংবা কর্তৃত্বেও কোন হেরফের হয় না। অপর কোন বিশ্বাসীরও তাতে আপত্তি করার অধিকার বা বাধ্যবাধকতাও নেই। যার যার ভিন্নমত পোষণ এবং ভিন্নপথ ও রীতি অবলম্বনের বিবেক স্বাধীনতা রয়েছে,

www.pathagar.com

তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার অপরের নেই, যতক্ষণ একমত পোষণকারী ভিন্নমত পোষণের ওপর হস্তক্ষেপ না করে। ইসলাম পরমতের প্রতি সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান মেনে নেয়। কিন্তু মৌলিক ধর্ম বিশ্বাসে আপস মানে না। অবশ্য স্রষ্টার প্রতি একজন বিশ্বাসীর আনুগত্য প্রত্যাহার প্রকাশ্যে স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণাতুল্য এবং স্বধর্মবিশ্বাস ত্যাগ স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বধর্মী অন্যান্য বিশ্বাসীগণের প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ্য অবমাননা (affront) ও বিদ্বেষপূর্ণ অসহযোগিতা। ইসলামের বিধানে স্বধর্মত্যাগ স্রষ্টার কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ। স্বধর্মত্যাগ ধর্মান্তর অপেক্ষাও গর্হিত কাজ। স্বধর্মত্যাগ ও ধর্মান্তরে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়ঃ স্বধর্মত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ ধর্মান্তর, বিশ্বাসহীনতা নয়। পক্ষান্তরে স্বধর্মত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ না করলে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা-"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম হতে ফিরে যায়, স্বীয় ধর্ম বিশ্বাস প্রত্যাহার ঘোষণা করে এবং সে অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার নেক আমলসমূহ ইহলোক ও পরলোকে বাতিল হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামী হয়ে যায় ও তথায় অনন্তকাল অবস্থান করবে।"

(কোরআন, সুরা-বাকারা, আয়াত ২১৭)

উল্লিখিত সরাসরি দণ্ড প্রদানের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ স্বয়ং এবং তা স্বধর্মত্যাগীর মৃত্যুর পরবর্তীকালের জন্য অপেক্ষায় থাকে। তবে পরোক্ষ বা রূপক দণ্ড তথা সামাজিক নিন্দা, মর্যাদাহানি, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিগ্রহ, দৈহিক নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি জীবদ্দশাতেই শুরু হতে পারে। যেমন হচ্ছে সালমান রুশদী ও তাসলিমা নাসরিনের ক্ষেত্রে। এ অনানুষ্ঠানিক দণ্ডের যাতনা তারা ভুগতে থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত, যদি না ইতোমধ্যে ধর্মনিন্দা প্রত্যাহার ও অনুশোচনা ঘোষণা (তওবা) করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

স্বধর্মত্যাগের প্রকারভেদে সমাজ ও সধর্মীগণের কাছে প্রাপ্য শাস্তিরও প্রকারভেদ রয়েছে। ধর্মবিশ্বাসত্যাগী যদি সমাজ হতে নিজকে দূরে রেখে

www.pathagar.com

একান্তে নির্লিপ্ত ও নিরুপদ্রব জীবন যাপন করে, অপরের ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ অনুশীলনে হস্তক্ষেপ না করে এবং ধর্মীয় বিধান নীতি বিরূপ বা বিরোধী সমালোচনা না করে তবে তাকে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষাকরণ অথবা সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্নকরণে সীমাবদ্ধ থাকাই বিচক্ষণতার কাজ। এক অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে উহা নিয়ে সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে আর একটি সামাজিক অশান্তির জন্ম না দেয়াই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে ধর্মবিশ্বাস ত্যাগকারী ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র বিশ্বাসত্যাগের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে কথায় ও কাজে, বাচনে, ভাষণে ও লিখনে প্রকাশ্যে স্বীয় বিকৃত জ্ঞান জাহির করে অপর বিশ্বাসীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় অনধিকার চর্চার প্রয়াস পায় এবং উহাকে আপন ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে স্পর্ধা দেখাতে ও বিশ্বাসীগণকে ভ্রান্তপন্থী আখ্যা দিতে দুঃসাহসী হয়ে অন্যকে প্ররোচিত করে তাহলে সে ব্যক্তি অন্যের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাতকারী এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টির অপরাধে দেশের প্রচলিত আইনে দণ্ডনযোগ্য হয়। সে ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে।

মরণের পরে অপেক্ষমান চরম দণ্ড ছাড়াও দুনিয়ায় জীবদ্দশায় 'মুরতাদের' শরিয়ৎ বিধান শাস্তি হতে পারে। যা হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকারিত্ব হতে বঞ্চিত, মুসলমান অবস্থায় থাকাকালীন সকল সৎকার্য বিনষ্ট, জানাজা ও মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন নিষিদ্ধ। এ সকল ধর্মীয় বিধান সম্মত দণ্ড প্রদানের অধিকার একমাত্র ইসলামিক রাষ্ট্রের, যেখানে কোরআন ও শরিয়তের বিধানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র হলেও ইসলামিক রাষ্ট্র নয় এবং শরীয়ৎ বিধানে পরিচালিত হয় না। সুতরাং শরিয়ৎ বিধানে ইহার বিচার দাবী ও শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের ওপর চাপ দিলে সরকার বিব্রত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

দুনিয়াতে যেমন ফেরেশতাতুল্য আল্লাহপ্রেমিক মানুষ আছেন তেমন শয়তানতুল্য আল্লাহদ্রোহীও আছে। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে এমন কিছু

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা প্রকাশ্যে স্বীয়ধর্ম ত্যাগ বা ধর্মদ্রোহিতা ঘোষণা না করেও কথায়, ভাষণে ও লিখনের মাধ্যমে স্বীকৃত ও স্বঘোষিত স্বধর্ম বিরোধিকে (মুরতাদকে)প্রত্যক্ষ সমর্থন দিয়ে এবং ধর্মীয় বিধান, অনুশাসন ও আচার নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা করে মুরতাদের সংজ্ঞায় পরিচিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা সমাজে সুপরিচিত এবং চিহ্নিত। আমি নাম করবো না, কারণ কারো প্রতি বৈরিতা নেই এবং কাউকে কাউকে শ্রদ্ধাও করি। তাঁরা মুসলমান পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন, মুসলমান নাম ধারণ করেন এবং অনেকেই বাল্যকালে মুসলিম শিক্ষা-সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে মুসলমান পিতৃকূলের নামে পরিচিত হয়েছেন এবং মুসলমান সুবাদে পদমর্যাদা লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শিক্ষিত হয়েও তাঁরা উপলব্ধি করেন না যে পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ, অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন বা নিন্দা ব্যক্তকরণ পিতামাতা ও পিতৃকূল এবং জন্মসূত্রকে অস্বীকারতুল্য। দুএকটি প্রগতিবাদী পত্রপত্রিকাও তাঁদের ধর্মবিরোধী মতবাদ এবং উহার পক্ষ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে মুরতাদ শ্রেণীভুক্ত হয়ে গেছে।

উপরোল্লিখিত শিক্ষিতজন 'বুদ্ধিজীবী' বলে অভিহিত অর্থাৎ বিদ্বান সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানীব্যক্তি হবেন বলে আশা করা যায়। বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে বিদ্যা ও জ্ঞান আর শিক্ষা এক নয়। বিদ্যা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি নিজ নিজ অধীত ও অর্জিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে বিদ্যা ও জ্ঞানের সাথে বিবেক যুক্ত হয়ে শিক্ষার ব্যাপ্তিশীলতার ক্ষেত্র সংকীর্ণতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। সুতরাং সকল বিদ্বান ও জ্ঞানীজনই শিক্ষিত নন তবে সকল শিক্ষিত জনই বিদ্যান ও জ্ঞানী। প্রমাণঃ তাঁরা গণতন্ত্রের প্রবক্তা অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির বিপক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরুদ্ধাচরণ যে অগণতান্ত্রিক তা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান বা বিবেক আছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে লিখতে পড়তে জানা (literate) ৩০-৩৫ শতাংশ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৪-৫ শতাংশ বাস্তব অর্থে শিক্ষিত। পূর্বোক্ত চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠি এ ৪-৫ শতাংশের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ, বড় জোর কয় ডজন। সংখ্যায় অল্প হলেও বিদ্বান এবং গুণীজন বলে তাঁদের মতামতের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষরজ্ঞানহীন সরলমনা ধর্মপ্রাণ জনগণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, যা অনভিপ্রেত। নিরুপদ্রব স্বধর্মত্যাগী অথবা বিধর্মী এমন কি শান্তিপ্রিয় নাস্তিকের চেয়েও তাঁরা ভয়ঙ্কর। যে কোন বিবেকবান নিরপেক্ষ ব্যক্তি অনুধাবন করবেন যে ইসলামবিদ্বেষভাবাপন্ন এ মুষ্টিমেয় বিদ্যজ্জন নিজ সামাজিক মর্যাদা ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে গরিষ্ঠ দেশবাসীর ধর্মীয় বিশ্বাস, অনুভূতি ও আচার নীতি নিয়ে এ ধরনের দাহ্য খেলা হতে বিরত থাকাই মঙ্গলজনক হতো। মসজিদ হতে মোয়াজ্জিনের ভেসে আসা আজান ধ্বনির প্রতি জনৈক বরেণ্য বুদ্ধিজীবীর শ্রুতিকটুতা ও অবজ্ঞা প্রকাশের স্পর্ধা দেখে তাঁরই অনেক অনুরক্তজনকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রত্যাহার করে নিতে দেখা গেছে। জন্মগত ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকারের অজুহাতে তাঁরা কোন ধর্মমতে বিশ্বাস না করে অথবা স্বীয় পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করে নির্লিপ্ত (secluded) নিরুপদ্রব জীবনযাপন করতে পারেন, তাতে কারো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় শাস্ত্রে অজ্ঞতাজনিত উপলব্ধিকৃত অবিশ্বাস (atheism) এবং ধর্মদ্রোহী মতবাদ প্রচার করে সংখ্যাগুরু মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হেনে সমাজে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস নিলে তা কারো জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। তাঁদের এ ধরনের কার্যকলাপ ও প্রচারণা ধর্মীয় উন্মাদনায় (fanaticism) উসকানী জাগিয়ে পাল্টা আক্রমণ ডেকে এনে নিজেদেরকে সংখ্যাগুরু ধর্মপ্রাণ অধ্যুসিত সমাজ বিরোধী ও ধর্মদ্রোহীরূপে প্রচারণার শিকারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস অথবা অবিশ্বাস নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হোক তাই কামনা করি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানবচরিত্র বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র উপাখ্যান

তৃতীয় স্তবক

অনধিকার চর্চা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনধিকার চর্চার
কৈফিয়ৎ

প্রসঙ্গঃ প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশে দেশের ভবিষ্যৎ কি?

যার যে কাজ বা বৃত্তি নয় সে সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্তকরণ অনধিকার চর্চাতুল্য। আলোচ্য প্রসঙ্গগুলি রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্কিত। আমি একজন সাধারণ নাগরিক, রাজনীতি করি না, সমাজপতিও নই। এককালে প্রশাসন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকলেও এখন বিগত সুতরাং সম্পর্কহীন। অতএব আমার চিন্তাভাবনা এবং অনাহুত অভিমত প্রকাশন অনধিকার চর্চা বিবেচিত হতে পারে মনে করে এই একটু কৈফিয়ৎ

রাজনীতি ও প্রশাসন পদ্ধতি এমন বিষয়বস্তু যার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও তাঁর তাপ বা প্রভাব (effects) সকল স্তরের সচেতন নাগরিককে স্পর্শ করে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেককে নাড়া দিয়ে থাকে। মূলতঃ স্বদেশপ্রীতি এবং মানবকল্যাণ বাসনার কারণেই চলমান রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং প্রশাসনিক পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে যা অনুভব উপলব্ধি করেছি তাহাই প্রকাশ করলাম। ইহা সমস্যা নিরসনে আমার কোন ব্যবস্থাপত্র নয়, যাঁরা রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে জড়িত এবং যাঁরা প্রচলিত রীতিতে প্রশাসন পরিচালনা করেন ও তাঁর আরো উৎকর্ষের কথা ভাবেন তাঁদের চিন্তার খোরাকরূপেই বিচার বিবেচনার জন্য আমার এ সেবা নিবেদন।

২৫ বৎসরের রাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছা নিরোধক রক্ষাকবচ সম্বলিত প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি অথবা নির্বাচনে অর্জিত

www.pathagar.com

আসন সংখ্যার ভিত্তির পরিবর্তে সর্বাধিক ভোট প্রাপ্তি জনপ্রতিনিধিত্বশীল একক দলীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন পরিশোধিত সংসদীয় পদ্ধতি উদ্ভাবনার ধারণা, উহার উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা যায় কি না তা বিবেচনার জন্যই আমার এই অনধিকার চর্চা প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

- গ্রন্থকার

১২.৫৫ অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

যারা মাথা নেই তার আবার মাথা ব্যথা! এমন এক ব্যক্তি আমি। রাজনীতি করি না অথচ আলোচ্য প্রসঙ্গটি মূলতঃ রাজনৈতিক এবং কার্যতঃ রাষ্ট্রনৈতিক। তাহলে এ অনধিকার চর্চা কেন? দেশ, দেশবাসী এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে ছাত্রজীবন হতেই ভাবনাচিন্তার অভ্যাস। রাজনীতি না করলেও ছাত্রজীবনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছি, পরিণত জীবনে দেশ বিদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্রচর্চা নিয়ে পড়াশোনা করে আসছি; গভীর আগ্রহ নিয়ে স্বদেশের চলমান রাজনীতি অবলোকন করি, অনুধাবন করি, রাজনীতিকগণের আচরণ, ভাষণ, কার্যকরণ লক্ষ্য করে শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জন করে থাকি। ইহা কর্মজীবনে ছিল আমার পেশাগত গবেষণার বিষয় আর অবসর জীবনের অলস সময় কাটানোর সখ। এর মূল উৎস স্বদেশপ্রীতি ও মানবপ্রেম।

মানুষ যেমন আপন প্রসন্নভাগ্য কামনা করে সৃষ্টিকর্তাও তাঁর সেরা সৃষ্টি মানব সম্প্রদায়ের প্রসন্নভাগ্য চান এবং সে লক্ষ্যে এক এক সময়ে এক এক মানবগোষ্ঠিকে আপন ভাগ্যগড়নের সুযোগ (নেতৃত্ব) দিয়ে তাদের অভিপ্রায়ের নিষ্ঠা, সততা এবং যোগ্যতা যাচাই করে থাকেন। মানব ইতিহাসে তার ভুরিভুরি প্রমাণ রয়েছে। বাংলাদেশেও একের পর এক রাজনৈতিক গোষ্ঠিকে (দল) এক একবার দেশগঠনের সুযোগ দিয়ে

www.pathagar.com

চলেছেন, অন্যদেশেও তাই করে যাচ্ছেন। এই রীতিতে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই পটপরিবর্তনের পঞ্চমধাপে (১৯৯৬) অন্যতম রাজনৈতিক গোষ্ঠি আওয়ামী লীগের ওপর এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। জনভোটারদের একাংশের সমর্থন ও আস্থা-আকাঙ্খা বিধাতার আশীর্বাদসিক্ত এ দায়িত্বকে দৈব অবদান বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্র চালু রয়েছে। চালু রীতি ও প্রকৃতির সাথে বাস্তবগণতন্ত্রের কতটুকু সামঞ্জস্য আছে তা নিয়ে অনেকের মনে ও মুখে জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে আছে। গণতন্ত্রের মৌলিক অর্থঃ "সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি সমান ব্যবহারমূলক সরকার" পদ্ধতি–a form of goverment by the people, for the people and of the people. গণতন্ত্র এমন একটি রাষ্ট্রনীতি বা দেশশাসন কৌশল (mechanism) যার সফল বাস্তবায়ন কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে বাস্তবায়নকারী জননির্বাচিত নেতৃত্বের স্বদেশপ্রেম ও প্রজ্ঞার ওপর। যে দেশে অধিকাংশ অধিবাসী শিক্ষিত সে দেশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণও স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত হয়ে থাকেন। সে দেশে তাঁদের হাতে গণতন্ত্র–তা সংসদীয় বা প্রেসিডেনসিয়াল যাই হোক, নিরাপদ রাষ্ট্রনীতি এবং তা জনকল্যাণকর হতে বাধ্য। সুতরাং "শিক্ষিত" জনসমাজেই সংসদীয় গণতন্ত্র বাস্তব অর্থে কার্যকর হতে পারে এবং দেশের জন্য কল্যাণকর অবদান রাখতে পারে। শিক্ষাহীন সমাজে অধিকার সচেতনতার অভাবে গণতন্ত্রের নামে তাঁর অপপ্রয়োগের আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কেমন? একটু খতিয়ে দেখা যাকনা।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সামরিক, প্রেসিডেন্সিয়াল এবং সংসদীয় এ তিন ধরনের রাষ্ট্রপদ্ধতিতে তিনটি রাজনৈতিক দল এ যাবৎ দেশ শাসন করে আসছে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে চারটি সক্রিয় দলের তিনটির অস্তিত্ব জনমনে বজায় রয়েছে, অপরটি জনপ্রতিনিধিত্ব হতে মুছে গেলেও রাজনীতির অঙ্গনে বহাল রয়েছে। এই দল হারানো প্রতিনিধিত্ব

www.pathagar.com

ফিরে পাবে কিনা তা নির্ভর করবে টিকে থাকা তিন দলের নীতি ও আচরণের ওপর। টিকে থাকা তিন দলের কোনটিই একচেটিয়া জনসমর্থন অর্জন করেনি এবং গরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী প্রথম দলও নিরঙ্কুশ তিন ভাগের দুই গরিষ্ঠতা পায়নি। সক্রিয়, সংগঠিত এবং জনসমর্থিত এই তিন দলের দু'দলীয় সরকারের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার, পারফরমেন্সের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে দেশবাসী পেয়েছে। দেখা গেছে কোন সরকারই আপন দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধে নয়, পূর্ববর্তী সরকারের ভালো কাজের স্বীকৃতি দেয়ার রাজনৈতিক সাধুতা দেখাতে পারেনি, তাই কোন সরকারই শ্রেষ্ঠতর ও জনপ্রিয় হতে পারেনি। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের পালা শেষ হবে চার বছর পরে, ২০০১ সালে। দেশ পরিচালনায় দেশবাসীর কাছে পরীক্ষা দেয়ার আর কোন রাজনৈতিক দল অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতাসীন দলের জন্য এটা যেমন শেষ সুযোগ দেশের জন্য তেমন শেষ ভরসা। এরপর শুরু হবে আবার পাঁচ বছর মেয়াদী নির্বাচন এবং ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পালা। সাধারণ দেশবাসী ভোটারগণ শিক্ষিত না হলেও নির্বোধ নয় এবং মানুষ চিনতে ভুল করে না, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৯৬ এর নির্বাচনে। একটি রাজনৈতিক দল বিশেষের একটি ঘাঁটি এলাকায় সমর্থকগণ আপন দলের অনভিপ্রেত আচরণে বিক্ষুব্ধ এবং হতাশ হয়ে বিপক্ষদলের প্রার্থীকে বিজয়ী করার নজির স্থাপন করেছে। অথচ বিজয়ীদল এমন দুর্লভ সমর্থন প্রাপ্তির কারণ এবং সমর্থকগণের আস্থা ও প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করে চলেছে। সুতরাং আগামীতে ভোটারগণ কোন্ দলকে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দেবে তা কেউ বলতে পারবে না। সামগ্রিক জনকল্যাণকর উদার রাজনীতির পরিবর্তে প্রচলিত শ্রেণী ও দলীয় স্বার্থপুষ্ট সংকীর্ণ রাজনীতির ফলে অবশেষে বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ জনগণের অরাজনৈতিক আর্থসামাজিক সেবা সংগঠন সমূহের দিকে ঝুঁকে পড়ার আশংকা আছে কি না তা ভেবে দেখার সময় হয় নাই কি? এভাবে পাঁচ বছর পর পর দলীয় সরকার গঠন ও বদল দেশের জন্য কি মঙ্গল বয়ে আনবে–যদি গণতন্ত্রের মৌলিক লক্ষ্য অর্জিত না হয়?

www.pathagar.com

১৯৯১ সাল হতে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে। সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার যে কোন এক দলীয় হতে বাধ্য এবং যে দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন অর্জন করে (তা প্রান্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও) সে দল ক্ষমতা লাভ ও প্রয়োগের আইনসিদ্ধ অধিকার পায়। ঐ সরকার একদলীয় হলেও যাদের ভোটে ক্ষমতা লাভ করে আর যারা ভোট দেয় না এ উভয় জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক মত ও পথ অনুসারী নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী ও দেশের সরকার হয়ে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ "সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি সমান ব্যবহারমূলক সরকার"। সুতরাং নিজদলীয় স্বার্থের উর্ধে জাতীয় স্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামগ্রিক জনকল্যাণসাধন হয়ে পড়ে একদলীয় সরকারের বাধ্যতামূলক ও নৈতিক দায়িত্ব সেক্ষেত্রে পক্ষ, বিপক্ষ, নিরপেক্ষ সকল দল ও মতের নির্যাস নিয়েই জাতীয় সমস্যা সমাধানে সরকার পরিচালনা করতে হয়। একটি দলীয় সরকারের পক্ষে তেমন সর্বজনস্বীকৃত ভূমিকা পালন দুরূহ বটে তবে তাহাই গণতন্ত্রের ম্যাণ্ডেট। বিগত ২৫ বৎসর দেশের রাষ্ট্রনীতিতে সে ম্যাণ্ডেট প্রতিপালিত হয়েছে কী?

আমাদের দেশে আনুমানিক শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, ৩০ ভাগ অক্ষর জ্ঞান রাখে। তার মধ্যে ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষিতের হার ২-৩ ভাগ। এক বেসরকারী জরিপের প্রতিবেদনে জানা যায় ১৯৯৬ সালে ১২ জুনের জাতীয় নির্বাচনে সংসদ পদপ্রার্থীর মাত্র ৪০% গ্রাজুয়েট ছিলেন। তার মধ্যে কতজন নির্বাচিত হয়েছেন জানা যায়নি। শিক্ষা প্রসঙ্গে আরো বলা যায় যে গ্রাজুয়েট হলেই একজন "শিক্ষিত" হয়েছেন কি না তা নির্ভর করবে তাঁর মানবিক আচরণ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর। একজন গ্রাজুয়েট অবশ্যই ডিগ্রীধারী এবং তাঁর অধীত বিষয়ে বিদ্বান ও জ্ঞানীও বটে। তবে মনে রাখা চাই যে বিদ্যা, জ্ঞান আর শিক্ষা এক নয়। বিদ্বা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তি নিজ নিজ অধীত বিষয়ে ও অর্জিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে বিদ্যা ও সাথে বিবেক যুক্ত হলে শিক্ষার

www.pathagar.com

ব্যাপ্তিশীলতার ক্ষেত্র সংকীর্ণতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, সুতরাং সকল বিদ্বান ও জ্ঞানীজনই শিক্ষিত নন তবে সকল "শিক্ষিতজনই" বিদ্বান ও জ্ঞানী। এ প্রেক্ষিতে ৪০% গ্রাজুয়েট প্রার্থী সবাই নির্বাচিত হয়ে থাকলেও গ্রাজুয়েটের নিচুমানের অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি একটি দেশের সর্বোচ্চ বিধানপীঠে কি ধরনের আচরণ ও দেশ পরিচালনার মাত্রার অবদান রাখতে পারেন তা বিগত ২৫ বৎসরের রাষ্ট্রনীতি ও শাসন পদ্ধতি বাস্তবায়নের চিত্র পর্যালোচনা ও বিবেচনা করলেই উপলব্ধি করা যাবে।

যে দল ক্ষমতা পায় তাঁরা নির্বাচিত সরকার আর যাঁরা ক্ষমতা পান না তাঁরাও নির্বাচিত এবং জনপ্রতিনিধি। বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় বিভাগে পাশের নিয়ম রয়েছে। পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর পেয়ে যে পরীক্ষার্থী ৩য় বিভাগে পাশ করে আর ৩২% পেয়ে যে ফেল করে এই দুইজনের মাঝে গুণগত মানে কোন পার্থক্য গণ্য বা গ্রহণযোগ্য হয় কি? জাতীয় নির্বাচনে এ যাবত ১৯৭৩ ছাড়া কোন দলই ১ম বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করার নজির নেই। সবাই ৩য় বিভাগী। ৫ম সংসদে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে ৩১% জনসমর্থন পায়, ৬৯% সমর্থন দেয়নি। ৭ম সংসদে (বর্তমানে) ক্ষমতাসীন দল ৩৮% জনসমর্থন পেয়েছে, ৬২% রয়েছে বিপক্ষে। এক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ কিংবা এক আসনেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতার অধিকার হওয়া যায়, তা বিধানসিদ্ধ হলেও জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয় কী? অন্ততঃ ৫০% জনভোট না পেলে কোন দলীয় সরকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয় না, যদিও কিছু আসন বেশী পেয়ে গরিষ্ঠ দল হওয়া যায়। এভাবে ক্ষমতাগ্রহণের পরে এবং সরকার পরিচালনায় এ যাবত সকল ক্ষমতাসীন দলই বিপক্ষে অবস্থানকারী অধিক জনমতকে আমলে নেয়নি। কোন সরকারই পূর্ববর্তী সরকারের কোন ভালো কাজের স্বীকৃতি দেয়নি। আপন দল যা করে তাই ঠিক সুতরাং সকল ভালো কাজের কৃতিত্বের অধিকারী বলে দম্ভোক্তি করে এসেছে, নয় কী? ইহা কি "শিক্ষিত" মানুষের রাজনীতি?

www.pathagar.com

দলীয় সরকার পদ্ধতির এ ধরনের অস্বাভাবিকতার (anomally) মাঝে "সকলশ্রেণীর প্রতি সমান ব্যবহারমূলক সরকার" পরিচালনার গণতন্ত্রের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের একমাত্র পন্থা সামগ্রিক জাতীয় ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য যা সাম্প্রতিককালে যত বেশী প্রকাশ ও প্রচার হয়েছে বাস্তবে তা অনুসৃত না হওয়ায় "জাতীয় ঐকমত্য" কথাটি ইতোমধ্যে গুরুত্ব হারাতে বসেছে।

পাঁচ বৎসর পর পর নির্বাচন হবে, ২৫ বৎসরের পরিচিত, পরীক্ষিত এবং সক্রিয় তিন/চারটি রাজনৈতিক দলের যে কোন একটি নির্বাচনে "কিছু" আসন অধিক পেয়ে গরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং একই নিয়মে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হতে থাকবে। পূর্ববর্তী সরকারের কুকীর্তি গাথা ছাড়া কোন ভালো কাজের স্বীকৃতি থাকবে না; সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জাতীয় আদর্শ ও পরিচিতির নাম ও রং বদলাতে থাকবে, দেশের কোন স্থায়ী নীতি, আদর্শ বা মান (Standard) অথবা বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত কোন আচরণ গড়ে ওঠতে পারবে না। কারণ, কোন দলীয় সরকারই নির্বাচনে ৫০% এর অধিক ভোট পেয়ে জন প্রতিনিধিত্বের অধিকারলাভের যোগ্যতা দেখাতে পারেনি, আগামীতে পারবে কী?

স্বদেশ প্রেমিক, বিবেকবান, "শিক্ষিত" পাঠকগণ একবার ভেবে দেখবেন কি যে এভাবে বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে সংসদীয় রাজনীতির দাবা খেলা কি চলতেই থাকবে? না কি উহার কোন সুরাহা খুঁজে দেখার সময় হয়েছে? এ জিজ্ঞাসা উত্থাপনকারী একজন নগণ্য ও অভাজন ব্যক্তি উপেক্ষণীয় হলেও প্রশ্নগুলি কি একেবারেই অর্থহীন এবং উপেক্ষণীয়?

অভিপ্রেত সুরাহার খোঁজে স্বদেশপ্রেমী "শিক্ষিত" রাষ্ট্রবিদ, চিন্তাবিদ ও বিবেকবান নাগরিকের মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যেই আমার এ অনধিকার চর্চাপ্রয়াস তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আমার এ চিন্তাভাবনা কয়েকটি প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

(aspect) বিভক্ত, যেমন (১) সাম্প্রতিক প্রসঙ্গঃ জাতির জনকের শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন, ছবি ঝুলানো ও নামানো (২) সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সরকার পদ্ধতির একটি পর্যালোচনা (৩) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা (৪) ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন (৫) দক্ষপ্রশাসনের উপাদান (ACR) (৬) প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা চিত্র (৭) জনসংখ্যাবৃদ্ধিরোধ আন্দোলন।

১২.৫৬ সাম্প্রতিক প্রসঙ্গঃ 'জাতির জনক', তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন ও ছবি ঝুলানো/নামানো।

শেখ মুজিবকে জাতির জনকরূপে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার মাধ্যমে ২১তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপনের (১৫ আগষ্ট ৯৬) পাশাপাশি তাঁর ছবি ঝুলানো ও নামানো নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় বিতর্ক চলছে/হয়েছে। শেখকে নিয়ে যাদের মনে দ্বিধা (scruples) বা বিরূপ ধারণা রয়েছে তাঁদেরও কেউ কেউ মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব পালনে উৎসাহীদের কাতারে সামিল হতে দেখা গেছে। তাঁহাদের সেই ভানের (hypocrisy) কারণ হচ্ছে শেখের পক্ষ এখন ক্ষমতায় আসীন। পঙ্কিল রাজনৈতিক পরিবেশেই ক্ষমতার পটপরিবর্তনজনিত সময় ও পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে ওরকম স্বমত ত্যাগ (turn coat) অথবা গিরগিটিসুলভ যে বহুরূপী প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে তাতে বিজয়ে উদ্বুদ্ধ ক্ষমতাসীন দলের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাহোক, সমগ্র দেশবাসী না হোক অন্ততঃ উহার অধিকাংশ মানুষ শেখ মুজিবকে জাতির জনক পদে বরণ করে নিলে ছবি লটকানো/নামানো নিয়ে বিতণ্ডা হওয়ার কথা নয়। যে কোন সময় যে কোন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তাদের প্রয়াত নেতাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন, সরকারী কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছবি স্থাপন করতে পারে। সকল যুগের ক্ষমতাসীন দলই তা করতে পারে। মেয়াদান্তে আবার অন্যদল ক্ষমতাসীন হয়ে ঐ ছবি নামিয়ে তাদের

www.pathagar.com

নেতাকে তেমন মর্যাদা দিয়ে ছবি টাঙাতে পারে। গাঁট (snag) বাধে বেসরকারী বা ব্যক্তিগত অঙ্গনে তাদের সম্মতির পরোয়া না করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সুবাদে ছবি টাঙালে, যেমন ঘটেছে ডায়াবেটিক হাসপাতালে ছবি টাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে। এতকাল ক্ষমতার আবর্তনের সাথে সরকার প্রধানের ছবি আবর্তনের প্রথা প্রচলিত ছিল। এবার (১৯৯৬) ক্ষমতাসীন দল সে প্রথার বদলে দলীয় নেতার ছবি টাঙিয়ে নতুন ট্রাডিশন স্থাপন করলো। দোষণীয় বা আপত্তিকর হতো না, যদি সকল রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে দেশব্যাপী শেখমুজিবকে জাতির জনক বলে গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয় ক্ষমতা পরিবর্তন হলেও জাতির জনকের ছবি স্থায়ীভাবে ঝুলানো থাকতো।

প্রশ্ন জাগে–যা একটি জাতীয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও বটে–জাতির জনক উপাধি ও মর্যাদা নিয়ে। জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া কাউকে জাতির জনক বানানো অথবা কোন জাতীয় সমস্যা সমাধানও যে সম্ভব নয় এ সত্য মেনে নিয়ে দেশবাসী অথবা তার অধিকাংশ মানুষ যাতে মনেপ্রাণে তাঁকে তেমন শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে সর্বাগ্রে সে প্রক্রিয়া অবলম্বন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা হতো না কী?

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্জনে একক কৃতিত্বের রাজনৈতিক দাবী অপর সকলের সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও অবদানকে পরোক্ষ নাকচের সামিল নয় কি? তেমন মনোভাব জাতির জনককে গ্রহণের পক্ষে অবদান রাখে না। ২১ বছরের সরকারগুলো কোন ভালো কাজ না করে কেবল অকাজ করেছে, প্রথম সাড়ে তিন বছরেই যা কিছু ভাল কাজ হয়েছে বলে অতীত নিয়ে টানাটানি করলে এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হবে কাদের নিয়ে? নিজেদেরকে একমাত্র গণতান্ত্রিক আর অন্যদেরকে স্বৈরাচারী বল্লে কি তারা শেখ মুজিবকে জাতির জনক মানবে?

১৯৭০ সালে অখণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে জাতির জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ম্যাণ্ডেট পেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও জনগোষ্ঠির বিরাট অংশ (৬৬%)

www.pathagar.com

মুজিবকে জাতির জনক বলে বরণ করতে অনীহা কেন? তাঁর ছবি নামিয়ে দেয় কেন? তার কারণ অনুসন্ধান ও অনুধাবন না করে জোর জবরদস্তির আচরণ নেতার প্রতি বিরুদ্ধবাদিগণের বিভ্রান্ত মনে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে উসকানী দিতে পারে না কি? এ জন্য দায়ী কে বা কারা? ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে বন্দী দশা হতে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার প্রাক্কালে শেখকে যাঁরা জাতির জনকের আসনে অধিরোহনের সিঁড়ি হতে নামিয়ে একক দলের জনক রূপে পুনর্বাসিত করেছেন তাঁরাই দায়ী নন কি? মুক্তি সংগ্রামের দিশারি হওয়া ছাড়াও জাতির জনক হবার মত তাঁর আরো যে সকল অবদান দেশবাসীর কাছে অজানা রয়ে গেছে, মুজিবের রাজনৈতিক পক্ষ বিপক্ষ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসী তাঁর সে সকল অবদানের সুফল ভোগ করে যাচ্ছে, জান্তে ও অজান্তে। পরিতাপের বিষয় মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদিগণ অজ্ঞতা হেতু তার ওসকল অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে যথাপ্রাপ্য মর্যাদা দেয় না, যা রাজনৈতিক সততার রীতিতে তাঁর অবশ্য প্রাপ্য। আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পক্ষবাদিগণ তাঁর প্রকৃত অবদান চেপে রেখে অবান্তর কাহিনী অবতারণা করছে।

এ ধরনের পক্ষীয় (partisan) রাজনীতির মানসিকতা এবং সকল কৃতিত্বের একক স্বত্ত্বাধিকারীত্ব নীতির ফলে ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনকেও বিতর্কিত করা হয়েছে। এটর্নী জেনারেল এ নির্বাচন চ্যালেঞ্জকারী হাস্যকর মামলাটিকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেছেন। দলমত নির্বিশেষে সবাই তাঁর সাথে একমত হবেন। মামলাটি খারিজ হলেও বচসার অবসান হয়নি। আপিল হবে বলে শোনা গেছে। হোক বা না হোক, নিষ্কলুষ বিচারপতির গায়ে কালিমা যা লাগার লেগে গেছে। এ জন্য দায়ী কে? বিবেচনা করে দেখা যাক। দলীয় সরকার পদ্ধতির প্রচলিত রীতির বিপরীতে একজন নির্দলীয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৩৮% ভোটারের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারী দল তাঁকে আনুষ্ঠানিক মনোনয়নের পূর্বে অবশিষ্ট

www.pathagar.com

৬২% এর প্রতিনিধিত্বকারী দলের মতামত যাচাই করে ঐকমত্যের (consensus) ভিত্তিতে মনোনয়ন দিলে এ বিতর্ক সৃষ্টি হতো না, কোন একক ব্যক্তিস্বার্থক্ষুণ্নের মামলা করতেও হয়তো উৎসাহ যোগাতো না। কারণ সকল দলই তাঁকে নিরপেক্ষ মনে করেন। বিএনপি তো নেপথ্যে তা প্রকাশও করেছে। এর পরিণাম কি সুখকর হয়েছে না কি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে? ক্ষমতাসীন দলের বারে বারে প্রচারিত জাতীয় ঐক্যের মহান নীতি প্রতিষ্ঠার অপূর্ব সুযোগ এসেছিল। ক্ষমতাসীন দল তাঁর শুভসূচনা করতে পারতো সর্বজনস্বীকৃত নির্দলীয় বিচারপতি সাহাবউদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিনা প্রতিরোধে নির্বাচিত হয়ে তিনি সর্বসম্মত ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হতে পারতেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও আন্তরিকতার অভাবে তা ভেস্তে গেলোনয়কি? দলীয় ছাপ রয়েই গেলো, যেমন বঙ্গবন্ধুকে দলীয় নেতৃত্বে আটকে রেখে জাতীয় নেতা বা জাতির জনক হতে দেয়া হয়েছিল না।

কথা হচ্ছিলো জাতির জনক প্রসঙ্গ নিয়ে। একাধিক রাজনৈতিক দলের দেশে কোন একটি রাজনৈতিক দলের নেতা জাতির জনক হতে পারেন না। সে জন্য শেখ মুজিবকে দলীয় রাজনীতি ও দলীয় নেতৃত্বের বন্ধন হতে মুক্তি দিয়ে জাতির জনক শ্লোগান বাদ দিয়ে মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার মূলে তাঁর সুদূরপ্রসারী ও অজানা অবদানসমূহ তুলে ধরে তাঁর সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও বিরুদ্ধবাদিজনের মনে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেই তাঁর প্রতি অনুসারিগণের খাঁটি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সত্যায়িত হবে। তা করা হলে জাতির জনককে মেনে নিতে কেউ দ্বিধা করবে না এবং রাজনৈতিক পট ও সরকার পরিবর্তন হলেও জাতির জনকের ছবি আর কেউ নামাবে না। কিছু জন (৩৮%) মানবে, অপর কিছু জন (৩৫%) মানবে না আর ২৭ % উপেক্ষা করবে, তা হলে তো জাতির জনক হওয়া যায় না। জনক বা নেতা কাউকে বানানো যায় না, হতে হয়। কেন মানছে না? কেন ছবি নামায়? কোন হেতু আছে

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই। মুক্তি সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্ব দান বা মূল অবদান প্রচারের প্রয়োজন নেই, দেশবাসী তা জানে। বরঞ্চ উহা ছাড়া যা যা অমূল্য অবদান এখনো চাপা ও অজানা রয়ে গেছে তা জানিয়ে অর্থাৎ প্রথম ৩.৫ (সাড়ে তিন) বৎসরে দলীয় নীতির ভুল স্বীকার করে তাঁকে পুনঃমূল্যায়নের সুযোগ খুলে দেয়া হোক। দেশ ও জাতির জন্য শেখ মুজিবের সেরা অবদান হচ্ছে নবজাত রাষ্ট্রকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার রাহুগ্রাস হতে মুক্তকরণ। কী করে তিনি তা করেছিলেন? তাঁকে ঘিরে সে সব প্রশ্ন, বিতর্ক ও সংশয়ের অজানা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে গ্রন্থকারের রচিত সদ্য প্রকাশিত "না বলা সত্য বচন ও না শোনা সত্য কথন" শিরোনামের বইটিতে। উৎসুক পাঠককূল বইটি পড়ে দেখে নিজেরাই লুকানো সত্য জানতে পারবেন।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে মুজিব ও জিয়াকে নিয়ে বিতর্ক বিরাজমান। অথচ দুজনেরই মূল্যবান অবদান রয়েছে বেশী কিংবা কম তুলনা করা দেশপ্রেম নয়। যাদের কোন অবদান নেই তারাই একজনকে বাদ দিয়ে অপর জনকে তুলে ধরে। শেখ ও জিয়ার মাঝে দেশপ্রেম প্রশ্নে বিরোধ ছিল না, তাঁদের অনুসারীদের মাঝে বিভেদ কেন? দেশে অসংখ্য মানুষ আছে যারা মুজিবকে বঙ্গবন্ধু রূপে ভালোবাসে কিন্তু তাঁর অনুসারীদের রাজনীতির সমর্থক নয়। তারা আবার জিয়াকেও দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা বলে ভালো বাসে। তেমনি অসংখ্য মানুষ জিয়াকে ভালোবাসে তবে তাঁর দলের অনুসারী নয়। উপরন্তু মুজিবকেও ভালোবাসে। প্রমাণ ১৯৯৬ সালে ১২ জুনের জাতীয় নির্বাচনঃ প্রদত্ত ভোটের ৩৮% মুজিবের দলের পক্ষে, ৩৪% জিয়ার দলের পক্ষে ১৬% তৃতীয় দলের পক্ষে। অবশিষ্ট ১২% সকল দলকে উপেক্ষা করেছে অর্থাৎ কোন পক্ষকে সমর্থন করেনি। তবে এদেরও অনেকে জিয়া মুজিব দুজনকেই ভালোবাসে। সরকারী ও প্রতিপক্ষের সম্মিলিত জনশক্তি দেশের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ। অথচ তারা জাতীয় স্বার্থ প্রশ্নে ঐকমত্য হতে পারছে না, উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভাজন নীতির কারণে।

www.pathagar.com

জিয়ার রাজনৈতিকদল মুজিবকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেয় না, মুজিবের অনুসারিগণ জিয়ার অবদানকে স্বীকার করে না। এমন কি পার্লামেন্টে প্রয়াত নেতাদ্বয়কে কলঙ্কিত (disgrace) করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। দুজনকে কেন্দ্র করে, দুটি চিন্তাধারা জাতির মন মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ দুধারার সমন্বয়/সমঝোতা (adjustment) না হলে জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে। যে দলই ক্ষমতায় থাকনা কেন মাতৃভূমির মঙ্গল রাজনীতির বক্তৃতা, ভাষণ ও প্রচারপত্রেই থাকবে। এ দুদলের নেতৃত্ব প্রকৃতই দেশপ্রেমিক হয়ে থাকলে এবং দেশের মঙ্গল চাইলে আর সময় অপচয় না করে একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ পরিহার করে সমঝোতা ও সহনশীলতা নিয়ে উভয় নেতার প্রতি পরস্পর শ্রদ্ধাশীল চিত্তে উভয়ের অবদানের কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে সর্বাগ্রে দ্বিপাক্ষিক ঐকমত্যে উপনীত হলে তৃতীয় পক্ষ এবং নিরপেক্ষ জনও আকৃষ্ট/অনুপ্রাণিত হবে আশা করা যায়। ফলে সত্যিকার জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হতে পারে। তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতির জনক জাতীয় স্বীকৃতি পাবেন তাঁর ছবি ওঠবে। রাজনৈতিক দলীয় সরকার পরিবর্তন হলেও ছবি আর নামবে না। স্থায়ীভাবে ঝুলানো থাকবে। রাজনৈতিক দলসমূহের স্বকীয়তা বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থ সমস্যা সমাধান সহজ হবে বলে বিশ্বাস রাখি।

২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দল দেশ শাসন ও দেশবাসীর সেবার সুযোগ পেয়েছে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষু হঠাৎ ভালো খাদ্য পেয়ে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করলে বদহজমি হয়। অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি (পার্লামেন্টে বক্তৃতার প্রকাশিত ভাষায় টানাটানি) করে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম সাড়ে তিন বৎসরের শাসনামলে অপ্রীতিকর স্মৃতি পুনর্জাগরণের উসকানি দানের বদলে পূর্ববর্তী তিনটি সরকারের যা কিছু ভাল কাজ ও কৃতিত্ব ছিল তা স্বীকার করে তার চেয়েও অধিকতর যোগ্যতা প্রমাণের নির্ভরযোগ্য প্রচেষ্টা চালানোই হবে সঠিক পন্থা। ম্যানিফেস্টো/প্রতিশ্রুতি ভিত্তিতে আগে কোনটা পরে কোনটা'

www.pathagar.com

প্রাইঅরিটি তালিকা ধরে ধীরদৃঢ়–সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া হতো অভিপ্রেত। ক্ষমতার আসন সংহত এবং ক্ষমতা বাস্তবায়নের দণ্ড সুদৃঢ় হওয়ার আগেই অতি উৎসাহ স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিসঙ্কুল কাজে হাত দেয়ার আবেগ কি বিজ্ঞতার পরিচায়ক হচ্ছে? কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোবেনা তো? সূচনা ও যাত্রা আশাপ্রদ সত্ত্বেও বর্ণচোরাগর্তে পদস্খলন পরিলক্ষিত হচ্ছে, একক কৃতিত্ব দাবী ও প্রকাশ্যে ছিদ্রান্বেষণের অভ্যাস যায়নি বলে মনে হচ্ছে।

দলীয় নেতারাই বলেছেন যে কোন জাতীয় সমস্যা সমাধানে জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন। কথাটা ঠিকই তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে দলীয় সরকার প্রথায় জাতীয় ঐকমত্য সংগ্রহ যে সহজ নয় তা উপলব্ধি করে ঐ লক্ষ্যে অরাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করাই রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। জনসভায়, সংসদে ভাষণে, বক্তৃতায় সহযোগিতা চাওয়া ও দেয়ার রাজনৈতিক চমক বিপক্ষকে অপ্রতিভ অবস্থায় নিক্ষেপ করে এবং আকৃষ্ট না করে আরো বিরূপ করে তোলে। তার পরিবর্তে ব্যক্তিপর্যায়ে চা পানের সামাজিক সৌজন্য সংলাপ (dialogue) এবং যুদ্ধকালিন শত্রুর সাথে পরামর্শের (parley) ন্যায় অরাজনৈতিক কূটনীতিক কৌশল (diplomatic strategy) অবলম্বন অধিকতর ফলপ্রসু হওয়ার ভুরিভুরি প্রমাণ অতীত রাজনীতির ইতিহাসে বিরাজমান।

অতীতের ভুলত্রুটি থাকলে ক্ষমা চেয়ে দলীয় নীতি ও কর্মসূচীর শুভ পরিবর্তনে আশান্বিত হয়ে ভোটারগণ যে সুযোগ দিয়েছে তা এখনো আশার গণ্ডি অতিক্রম করে বাস্তব ফল দেখতে পায়নি। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে ৩৮% ভোটারের আশাকে আস্থায় পরিণত করার পরই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিসঙ্কুল কার্যক্রমে হাত দিলে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা আছে এবং আশা ও আস্থাকে আগামীর জন্য স্থায়ী বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে অবশিষ্ট ৬২% এর অনেককে আকৃষ্ট করতে পারে।

www.pathagar.com

১২.৫৭ সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সরকার পদ্ধতি

-একটি পর্যালোচনা-

সাম্প্রতিককালের কিছু কিছু রাজনৈতিক মন্তব্য হতেই পর্যালোচনা সূত্রপাত করা যাক। (১) পঞ্চম সংসদীয় দলীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান পরামর্শ দিয়েছেন–তিন বছর দলীয় রাজনীতি মুলতবী রেখে ঐকমত্যে কাজ করুন (২) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এক বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেছেন–কোন একদলের পক্ষে দেশের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, তাই সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে (৩) প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের প্রাক্কালেই "জাতীয় ঐকমত্যের" সরকার দর্শনের কথা বলেছেন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন দলীয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে এবং জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক ঐকমত্য অপরিহার্য বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং দায়িত্বগ্রহণের প্রথম দিনেই দুটি প্রধান দলের নেত্রীদ্বয়কে সে পরামর্শ দিয়েছেন। ওদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নিম্নকক্ষ লোকসভার স্পীকার পূর্ণ সংমা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলির উচিত তাদের বিরোধের অবসান ঘটিয়ে একটি জাতীয় সরকার গঠন।

এ সব উক্তি-যুক্তি-অভিমতের তাৎপর্য কী? এবং তা কোন দিকে ইঙ্গিত করে? মনে হয় সবাই উপলব্ধি করেন যে সংসদীয় দলীয় সরকার পদ্ধতি দেশের মঙ্গল করতে সক্ষম নয় এবং শিক্ষাহীন সমাজে তা উপযোগীও নয়। তবে কথাটা সোজাসুজি না বলে ঘুরিয়ে বলেন, কারণ রাজনীতি। এবার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

www.pathagar.com

১৯৯৬ এর ১২ জুনের সংসদীয় নির্বাচনোত্তর আশু সঙ্কট এবং উহার নিরসন প্রসঙ্গঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের লিখিত কেতাবী গুণাবলী সম্পর্কে আমরা অবহিত। তার মধ্যে কোন অসঙ্গতি বা স্ববিরোধিতা যে থাকতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য করি না। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলীয় সরকার এবং শিক্ষাহীন পরিবেশে সে দলীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে পরস্পর বিমুখী এবং জাতীয় স্বার্থের বদলে শ্রেণী স্বার্থমুখী। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের অন্যতম নিয়ামক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্বাচনে বিজয়ীদলের অর্জিত আসন সংখ্যা। সংখ্যা গরিষ্ঠ প্রথম এবং দ্বিতীয় দলের মাঝে অর্জিত আসন সংখ্যা পার্থক্য খুব কম হলে তৃতীয় দলের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি ন্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য শতকরা ভোট নয়, অর্জিত আসন সংখ্যাই নির্ধারক। ১৯৯১ এর নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার দ্বিতীয় দলের প্রাপ্ত হারের চেয়ে কম থাকা সত্ত্বেও অধিক আসন লাভকারী দল সরকার গঠনের "বৈধ" অধিকারী হয়। অধিক জনতা যে দলকে ভোট দিলো সে দল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। সংসদীয় পদ্ধতির এ অসঙ্গত নীতির এ বৈধতা কি প্রকৃত গণতান্ত্রিক? এমন অসঙ্গতি যে সংসদীয় পদ্ধতির মারাত্মক ত্রুটি তাতে কি সন্দেহ আছে? এ সংখ্যা বৈষম্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটো অস্বীকারসূচক বা নেতিবাচক (negative) হাতল নিহিত থাকে। প্রথম দলের গরিষ্ঠতা নিরঙ্কুশ না হলে সরকার স্থিতিশীলতা পায় না, সুতরাং অন্যদলের সাথে সমঝোতা বা কোয়ালিশনের প্রয়োজন হয়, এবং তা কখনো কখনো করতে হয় নীতিভঙ্গ করে। সমর্থনকারী দলের শর্ত, আবদার এবং দরকষাকষিতে সরকারী দলের আদর্শ বিসর্জনের আশঙ্কা থাকে। আবার প্রথম দল যদি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ হয় তাহলে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা থাকে, ক্ষমতার দম্ভে অপরাপর দলের অবদান উপেক্ষা করে দেশের সামগ্রিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী পালনে পরান্মুখ হতে

www.pathagar.com

পারে, যদি না সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকে অথবা যদি সরকারী দলের অধিকাংশ সদস্য শিক্ষিত ও বিবেকবান না হন।

বাংলাদেশে ১৯৯৬ এ ইতিহাসের স্বচ্ছতম, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফলে এমন ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হতে পারে বলে অনুমিত হয়েছিল। ৮১ টি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে তিনটি ছাড়া অন্য সকল দল মুছে যায়। আওয়ামী লীগ প্রথম, বি ন পি দ্বিতীয় এবং জাতীয় পার্টি তৃতীয় হয়ে দর কষাকষির সুযোগ লাভ করে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের বিধিসম্মত অধিকার পায় বটে তবে সামগ্রিক জাতীয় ইস্যুসমূহ সুরাহার প্রশ্নে বিদ্যমান বিধি পরিবর্তন/সংশোধন করে নতুন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দুই ভাগের তিন ভাগ গরিষ্ঠতা পায় না। বি-এন-পি রানার-আপ (৩৪%) হয়। নির্বাচন প্রাক্কালে আওয়ামী লীগনেত্রী আবেদন রেখেছিলেন যে অতীতে ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিয়ে একবার দেশসেবার সুযোগ দিতে। দেশবাসী (৩৮%) সে সুযোগ দিয়েছে সতর্কতার সাথে চ্যালেঞ্জরূপে। সুতরাং সরকার গঠন করতেই হয়, তাই তৃতীয় দলের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সহযোগিতার সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগ এবং বি-ন-পি উভয়ের সামনে উপস্থিত হয়। যেই গ্রহণ করে। তৃতীয় দলের সমর্থনের জন্য কোন্ দল নীতি পরিহার করবে? কারণ তৃতীয় দল শুধু ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারীই নয় পূর্ববর্তী নয় বৎসরের রাজনীতিতে প্রথম দু দলেরই বিচারে স্বৈরাচারী সুতরাং উভয়ের রাজনৈতিক শত্রু, অতএব নীতির প্রশ্নে বর্জ সুতরাং গ্রহণযোগ্য নয়। অধিকন্তু, বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের নেতাকে যে কোন মূল্যে মুক্তকরণ এবং দলকে পতিত অবস্থা হতে পুনরুদ্ধারকরণ ছাড়া আপাততঃ তৃতীয়দলের অন্যকোন নীতি/আদর্শ থাকার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে News Week (১৯৯৬, ২৪ জুন) এর প্রতিবেদক টনী ক্লিফটন জাতীয় পার্টির সাথে শেখ হাসিনার কোয়ালিশনের ফলে রূপকাহিনীতে বর্ণিত বোতলে আবদ্ধ ভয়াল দৈত্যের মুক্তি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন (If she has to form a coalition with Ershad's Jatiya Party, she will be letting a fearsome

www.pathagar.com

genic out of its bottle)। যাহোক, রাজনীতিতে নীতির (principles) কোন স্থায়ী সংজ্ঞা নেই অর্থাৎ গরজের কোন বালাই নেই। তবে সচেতন জনগোষ্ঠির মানসিক প্রতিক্রিয়া উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

বিজয়ী (প্রথম) দল "জাতীয় ঐক্যের" সরকার ঘোষণা দিয়েছিল। যা অর্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল প্রথম দলের বিজয়ে কৃতজ্ঞ উদারতা প্রদর্শন এবং দ্বিতীয় দলের প্রান্তিক পরাজয়ের সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে উভয় দলের প্রচারিত কমন কর্মসূচীগুলো যৌথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশরক্ষা ও দেশগড়ায় হাত মেলানো। খেলাশেষে বিজয়ীদল এবং রানার আপের হাত মেলানো একটি সর্বজনীন অনুকরণীয় প্রথা। বৃটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭ সালে প্রথম সংসদীয় পদ্ধতির নির্বাচনে ত্রিপক্ষীয় প্রতিযোগিতায় একে ফজলুল হক (মরহুম) নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিপক্ষদল মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলায়ে সরকার গঠন করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৯১ এর পার্লামেন্ট নির্বাচন ফলাফল পরিস্থিতি স্মরণযোগ্য। ঐ নির্বাচনে বি-এন-পি এবং আওয়ামী লীগের অর্জিত আসন সংখ্যার মাঝে পার্থক্য ছিল ১৯৯৬ এর চেয়ে বেশী। উপরন্তু বিজয়ী দলের আসন সংখ্যাও ছিল বেশী এবং চতুর্থ একটি দলের সাথে নির্বাচনের পূর্বেই সহযোগিতার সমঝোতা হয়েছিল। কাজেই বিএনপি দ্বিতীয় দলকে উপক্ষো করেছিল।

www.pathagar.com

চালু পদ্ধতি এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাভাবনা

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স ২৫ বৎসর। এ সময়কালের মধ্যে দেশের সংবিধান (এবং সরকারও) অদল–বদল হয়েছে কয়েকবার, যদিও ওপরের কভার অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। ১৯৭২-৭৫ জানুয়ারী সংসদীয় পদ্ধতি, ১৯৭৫ জানুয়ারী-আগষ্ট একদলীয় বাকশাল, ১৯৭৫ নভেম্বর-১৯৯১ জানুয়ারী প্রেসিডেনসিয়াল এবং ১৯৯১ তে উহা পরিবর্তন করে আবার সংসদীয় পদ্ধতি। এর মাঝে কিছুকাল ২ দফায় সামরিক শাসন ছিল যখন সংবিধান বস্তুতঃ কার্যকরী ছিল না। এ সর্বশেষ পরিবর্তনের ফলাফল ভাল হয়েছে কি মন্দ তা নিয়ে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা রয়ে গেছে, যার মধ্যে আমিও একজন। এ জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি ঘটেছে সূচনায় উল্লিখিত রাজনৈতিক উক্তি ও মন্তব্যে। প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সংসদীয় পদ্ধতি গ্রহণের ফলাফল সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত না করে গত পাঁচ বৎসরে অনুসৃত সংসদীয় পদ্ধতির একটি আবেগহীন ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা (review) ও মূল্যায়ন করার সময় এসেছে বলে মনে করি। সদ্য (১৯৯৬) অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু বৈধজাত (legitimate) এবং প্রাসঙ্গিক (pertinant) প্রশ্ন অবতারণার মাধ্যমে দেশকল্যাণকামী চিন্তাশীল পাঠকের বিচার বিবেচনার জন্যই এই পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হলো।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে বলে দাবী করা হয় এবং আন্দোলন, পাল্টা আন্দোলন সবই গণতন্ত্রের নামে করা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রে জনগণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতেই সরকার পদ্ধতি স্থির করতে হয়। কাজেই সরকার পদ্ধতি এবং জাতীয় নির্বাচন গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া। ইহা অনস্বীকার্য এবং কারো দ্বিমত নেই। তাহলে প্রথমে বিচার্য প্রশ্ন জাগে যে বিগত ২০/২২ বছরে ৪/৫ বার সংবিধান ও সরকারপদ্ধতি পরিবর্তন

www.pathagar.com

দেশবাসীর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছিল কি না? তাত্ত্বিক উত্তর মিলতে পারে তবে তথ্যভিত্তিক উত্তর সম্ভব নয়। কারণ পরিবর্তন জনগণ করেনি, পরিবর্তন করেছেন নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ এবং মিলিটারী শাসকরাও সংবিধান অকার্যকর রেখেছে। আগে পরিবর্তন করে পরে জনগণের সমর্থন আদায়করণ (referendum) বাস্তবে জনমতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন নয়। ১৯৯১ সালের সর্বশেষ পরিবর্তনটিই-প্রেসিডেনসিয়াল হতে সংসদীয় পদ্ধতি - বিবেচনা করে দেখা যাক।

দেশবাসী এ পরিবর্তন চেয়েছিল না, পরিবর্তনের কোন প্রয়োজনও ছিল না। দেশব্যাপী ঐক্য আন্দোলন হয়েছিল এরশাদ সরকারের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য নয়। একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া অপর রাজনৈতিক দল বি-এন-পি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত-প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতির প্রবক্তা ও অনুসারী ছিল। আওয়ামী লীগই মনেপ্রাণে সংসদীয় পদ্ধতি কামনা করতো এবং ৯১ এর নির্বাচনকে ৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে গণভোট আখ্যা দিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছিল। তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে দেশবাসী সে দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং বি-এন-পিকে জয়ী করে, যদিও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যায় আওয়ামী লীগ অগ্রণী ছিল। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনের শর্ত পালনে বাধ্য হয়ে সংসদীয় পদ্ধতিতে অনাস্থা মনে রেখেই বি-এন-পি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ সত্ত্বেও নিজ আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের "গণভোট" জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানকে বি-এন-পি নাকচ করে আওয়ামী লীগের দাবীকে পুনর্বাসন করে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা না কি উদারতার পরিচয় দিয়েছে তা তাঁরাই জানেন। তবে এ দল বিগত শাসনামলের শেষ বছরের অধিককাল আপন কর্মের খেসারত কামিয়েছে। একমাত্র সরকারপদ্ধতি পরিবর্তন ছাড়া আর কোন কার্যক্রমেই আওয়ামী লীগের সমর্থন বা সহযোগিতা পায়নি।

www.pathagar.com

এভাবে সংসদীয় পদ্ধতি গ্রহণ কি জনসমর্থনে হয়েছে বলা যায়? গণভোটে দেশবাসীর নিরঙ্কুশ সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল কি? বিশ্লেষণ করে দেখা যাক না।

সংসদীয় পদ্ধতি গ্রহণের সমর্থনে ১৯৯১ এর গণভোটে মোট ৬.৩০ কোটি ভোটারের মধ্যে ২.২৯ কোটি অর্থাৎ মাত্র ৩৫% শতাংশের সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। প্রত্যক্ষ বিরোধিতা-"না" -করেছে ৩৩ লক্ষ ভোটার। অবশিষ্ট ৪ কোটি ভোটার গণভোটে অংশগ্রহণ করেনি অর্থাৎ গণভোট উপেক্ষা করেছে। ৩৩ লাখ বিরোধী এবং ৪ কোটি ভোটার গণভোটে অংশগ্রহণ করেনি অর্থাৎ গণভোট উপেক্ষা করেছে। ৩৩ লাখ বিরোধী এবং ৪ কোটি উপেক্ষাকারীর মিলিত ৬৪% শতাংশ ভোটারের বিপক্ষে মাত্র ৩৫% শতাংশের সমর্থনে কি সত্যি সত্যি অধিকাংশ জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছিল? এবং তা কি খাঁটি গণতন্ত্রকে সত্যায়িত করে? কেহ কেহ যুক্তি দেখিয়ে বলতে চান যে কোন দেশেই নির্বাচনে বা রেফারেন্ডামে একশত ভাগ ভোটার অংশ গ্রহণ করে না। তা সত্বেও আসন সংখ্যার তারতম্যের কারণে অধিক সংখ্যক ভোট পেয়েও সরকার গঠনের অধিকার পায় না। যেমন ১৯৯১ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চেয়ে শতকরা কম ভোট পেয়েও বিএনপি দেশ শাসনের অধিকার পেয়েছিল। এক্ষেত্রে অনুধাবন করতে হবে যে সরাসরি নির্বাচন আর রেফারেন্ডাম এক নয়। নির্বাচনে একাধিক প্রার্থীর মধ্য হতে বাছাই করে আপন পছন্দমত যে কোন একজনকে ভোট দেয়ার স্বাধীন অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে রেফারেন্ডামে একমাত্র প্রার্থীকে গ্রহণ বা বর্জন ছাড়া বাছাই এর অবকাশ থাকে না। অধিক সংখ্যক জনসমর্থন পেয়েও আসন সংখ্যার তারতম্যের কারসাজি সংসদীয় পদ্ধতির অন্যতম অসঙ্গতি এ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় না কি? তা ছাড়া যে ৩৫% হ্যাঁ বলেছিল তারা কি উভয় পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য কি তা সম্যক বুঝেই হ্যাঁ বলেছিল? যে ভোটে প্রার্থী নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, প্রতিযোগিতা নেই, কর্মসূচীর প্রতিশ্রুতি নেই, প্রার্থীর

www.pathagar.com

স্থানীয় অবদানজনিত ব্যক্তি প্রীতি, পরিচিতি বা আকর্ষণ নেই সে ভোটের পক্ষে বা বিপক্ষে হ্যাঁ বা না বলার তাৎপর্য বা মাধুর্য উপলব্ধি করবার অবকাশ কোথায়? "বিষয়টি" কি তা বুঝুক বা না বুঝুক সরলমনা ভোটারগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইঙ্গিত, উৎসাহে হ্যাঁ বল্লেই দায়সারা হবে মনে করেই সমর্থন দিয়েছে। সুতরাং জনগণ যে সংসদীয় পদ্ধতি চায় বা চেয়েছে নৈতিকতার নিক্তিতে এ দাবী প্রশ্নাতীত নয়। অবশ্য রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রশ্ন অবান্তর। ফলকথা হলো, কাগজে কলমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত ভোটের অধিকাংশ সংসদীয় পদ্ধতিকে সমর্থন দিয়েছে। অতএব কেউ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারুক বা না পারুক ইহাই হয়ে গেছে বিধিবদ্ধ স্বীকৃত পদ্ধতি। যেমন, বিচারালয়ে এফিডেভিট বা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য/বক্তব্য দেয়ার পূর্বে "শপথ (হলফ) নেয়ার নীতিও আইনসিদ্ধ পদ্ধতি। এ দু পন্থায় শপথ নেয়ার পর যত ডাহা মিথ্যা ব্যক্ত করা হয় সবই আইনসিদ্ধভাবে সত্য হয়ে যায়। অসত্যকে সত্যে রূপান্তরিত করার কি অপূর্ব আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা!

আনুমানিক ৬.৩০ কোটির ৮০ ভাগ নিরক্ষর জনসাধারণ গণতন্ত্রের তাৎপর্য, সরকার পদ্ধতি কিংবা সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, গণতন্ত্র কি বস্তু তাও সম্যক বুঝে না। না বুঝেই তারা নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকে। তাদেরকে বুঝানো হয়, শেখানো হয়–ঠিক পথ না কি ভ্রান্তপথ তাও উপলব্ধি করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দল এবং নির্বাচনে প্রার্থীরাই পথ প্রদর্শক যাঁরা সংখ্যায় অতি নগণ্য। সারকথা, মুষ্টিমেয় পড়ালেখা জানা রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতাকর্মীগণ নিরক্ষর বিশাল জনগোষ্ঠীর বেনামীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের নিজেদের যখন যা প্রয়োজন (expedient) তেমন সরকার পদ্ধতি গ্রহণ বা বর্জন এবং ইচ্ছামত সংবিধান পরিবর্তন করে এসেছেন। জনগণের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ভূমিকা এ ধরনের গণতন্ত্রে নেই। নৈতিক ও বাস্তব অর্থে ইহা কি গণতন্ত্র? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো -জনমতের বরাত (plea) দিয়ে জনগণের লঘিষ্ঠাংশের হ্যাঁ এবং না গণভোটের আবরণে সর্বশেষ পরিবর্তন-

www.pathagar.com

প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতি পরিত্যাগের পরিণাম (outcome) কী হয়েছে? তাৎক্ষণিকভাবে যে জাজ্জ্বল্যমান পরিণতি মিলেছে তা হচ্ছে প্রায় দু বৎসর কাল যাবত বয়কট ও পদত্যাগের মাধ্যমে পার্লামেন্টকে অকার্যকর করে গণতন্ত্রকে তামাসার বিষয়ে পরিণতকরণ। সংসদীয় পদ্ধতিতে পার্লামেন্টে বিরোধীদল রাষ্ট্র পরিচালনায় (statecraft) সাংবিধানিকভাবে অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ বিধানের অপপ্রয়োগের ফলে ১৯৯১ এর সুষ্ঠু নির্বাচনকে করা হলো অসিদ্ধ ও অকার্যকর আর পার্লামেন্টকে করে দিল পঙ্গু। এ নেতিবাচক কার্যক্রমের অবশ্য একটা ইতিবাচক সম্ভাবনা ছিল সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠান। তেমন মধ্যকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠানই ছিল বাস্তব ও ন্যায়সম্মত পন্থা। ক্ষমতাসীন দল তা না করে রাজনীতিতে সততার প্রতিষ্ঠা করেনি। সংসদীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীনদের প্রান্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দুর্বল অজুহাতে তা হতে দেয়া হলো না। গণতন্ত্রে এ ধরনের সংখ্যার দাবাখেলা একমাত্র শিক্ষাবিহীন সমাজের পিচ্ছিল সংসদীয় পদ্ধতিতেই সম্ভব।

১৯৭৫ সালে ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ঘন্টাখানেক স্থায়ী পার্লামেন্ট অধিবেশনে কোন আলোচনা বা বিতর্ক ছাড়াই সংসদীয় পদ্ধতির সংখ্যাধিক্য অস্ত্রের সাহায্যে সংসদীয় পদ্ধতিকেই হত্যা করে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে এবং একদলীয় (regimental) শাসন-বাকশাল প্রচলনের মাধ্যমে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যার পেছনে জনগণের সমর্থন ছিল না। ইহা এক ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বৈরাচার বই কি? এই কাজটি সংবিধানের মূলনীতির সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। সংসদীয় পদ্ধতির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের আরো কিছু নমুনা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা যাক।

১৯৩৬ সালে বৃটিশ সরকার অবিভক্ত ভারতে এবং বিভিন্ন প্রদেশে সর্বপ্রথম সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে। উপমহাদেশে উহা ছিল সংসদীয় পদ্ধতির প্রথম পরিচিতি এবং বাস্তবায়ন। এ রাষ্ট্রনীতিতে বাংলায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কৃষকপ্রজা,

www.pathagar.com

কংগ্রেস, তপসিলী হিন্দু সম্প্রদায় প্রভৃতি ৫/৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। কোন দলই সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায় না, সুতরাং কোয়ালিশনের প্রয়োজন হয়। কৃষক প্রজাদলের নেতা জনাব এ কে ফজলুল হক নির্বাচনে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন করে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। নীতিগতভাবে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু দল কংগ্রেস সরকার গঠনে অংশীদারিত্ব না পাওয়ায় অন্যান্য অসন্তুষ্টগোষ্ঠি সমন্বয়ে বিরোধী দল গঠিত হয়। এ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শুভ ছিল, যার কৃতিত্ব হক সাহেবেরই প্রাপ্য। এ সরকার আমলে মুসলমানদের কল্যাণকর অনেক কাজ হয়েছিল। ইতিহাস বিচিত্র এবং দীর্ঘ। যাহোক, তিনবছর স্থায়ী হক মন্ত্রীসভা শুরু হতেই কংগ্রেসও অন্য সকল স্বার্থান্বেষীদের পক্ষ হতে ইহার পতনের জন্য প্রবল প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও শেষের দিকে মি. জিন্নাহর সাথে হক সাহেবের মতভেদের ফলে বিত্তবান স্বার্থান্বেষী সমন্বয়ে সংঘবদ্ধ বিরোধীদল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ প্রচেষ্টার গুপ্ত উপকরণ ছিল–অর্থের বিনিময়ে সদস্য ভাগিয়ে নেয়া বা ছিনতাই অথবা ভোটের সময় সংসদ অধিবেশনে অসুস্থতার অজুহাতে অনুপস্থিতি। সংসদ সদস্য ক্রয় করার কৌশল একমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রী পন্থায় কার্যকর হতে পারে। দলত্যাগ আইন ছিল না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে হক মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলো। নীতির প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী বিভিন্ন দলীয় সদস্যগণের সহযোগিতা সংগ্রহ করে হক সাহেব আবার শ্যামা-হক নামে দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করলেন ১৯৪১ সালে। একই প্রক্রিয়ায় সদস্য বেচাকেনা এবং ধরে রাখার প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে ১১ মাস পরে এ মন্ত্রীসভার পতন ঘটলো। এবার খাজা নাজিমউদ্দিন তৃতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করেন, যা টিকেছিল ১৯৪৫ পর্যন্ত। ১৯৪৬ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ৪র্থ সংসদীয় সরকার মন্ত্রীসভা। ৮ বৎসরের ভেতর ৪ বার সরকার গঠন ও পতন হয় সংসদীয় পদ্ধতির সংসদীয় প্রক্রিয়ার সংসদ সদস্যগণের ভোটে। বলিহারি সংসদীয় গণতন্ত্র।

www.pathagar.com

ফজলুল হক সাহেবের প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু "প্রিয় জনগণ" উহাকে রক্ষায় অসহায় ছিল। "সংসদীয় পন্থা জনগণের কাছে জবাবদিহী"- এ প্রচারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলো। ইহা স্বতঃসিদ্ধ নীতি বটে তবে শতকরা ৮০ নিরক্ষর জন অধ্যুষিত সমাজে তা বাস্তবরূপ নিতে পারে না। শিক্ষিত সমাজে তা সম্ভব। সরকার যত জনপ্রিয় বা সরকারপ্রধান যত যোগ্য হোন না কেন সংসদীয় গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় এক ভোটের ব্যবধানেও সরকারের পতন হতে পারে। সে ভোট কিন্তু জনগণের নহে, তাঁদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের ভোট। নির্বাচন বিজয়ের পর এ দু-পক্ষের সম্পর্কে মরীচা ধরে যায়, জনগণের প্রতিনিধিগণ তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যান। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের (৯৫-৯৬) পার্লামেন্ট বয়কট ও পদত্যাগ এবং তজ্জনিত শাসনতান্ত্রিক সংকটের সাথে জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না বা তাদের কোন মতামতও ছিলনা। জনগণের (নির্বাচকমণ্ডলী) অভিমত না নিয়েই তাঁদের প্রতিনিধিগণ তাঁদের অর্পিত আস্থা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের জন্য সংকট সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে ৩৩% ভোটারের প্রতিনিধিত্বকারী ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবিমৃষ্যকারিতায় বিরোধীদলবিহীন পার্লামেন্টে ডানাকাটা সংসদীয় সরকারী ক্ষমতার দণ্ড ধরে ঝুলতে থাকে। বাস্তব গণতন্ত্র চর্চা ও বাস্তবায়নের স্বার্থে কাম্য ছিল পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা। তা করলে বি-ন-পিরই ভাবমূর্তি বাড়তো এবং নির্বাচনের রায় তাদের অনুকূলে বহমান হতো এবং সৃষ্ট পার্লামেন্ট সংকটের দায় বয়কটকারী বিরোধীদলের ওপর পড়তো, নয় কি? এধরনের সদস্য সংখ্যার নেতিবাচক দাবাচাল কি সত্যিই জনকল্যাণকর গণতন্ত্র?

ভারত বিভাগপূর্ব (১৯৩৭-৪৭) আলোচ্য সময়কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ ছিল হিন্দু-মুসলিম, জমিদার-প্রজা, উঁচু-নিচুবর্ণ প্রভৃতি শ্রেণী স্বার্থ সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আইন পরিষদের ভেতরেই বিভিন্ন স্বার্থশ্রেণীর (vested group) পক্ষেবিপক্ষে লড়াই হতো–এখনকার মত

www.pathagar.com

রাস্তায় বা ময়দানে জনসভায় কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় নয়, অথবা হরতাল, ভাংচুর ও সম্পদ ধ্বংসের মাধ্যমে নয়, কোন আদর্শ নিয়েও নয়। যার যার শ্রেণী ও গোষ্ঠীর স্বার্থের মাপকাঠিতে সদস্য বেচাকেনা, ছিনতাই, অনুপস্থিতি ইত্যাদি চলতো। প্রয়োজনীয় অর্থও একই নীতিতে যোগান হতো। হালে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ ভিন্নঃ দলত্যাগ নিরোধ আইনের কারণে সদস্য স্থানান্তর বা দলত্যাগ চলে না বটে তবে সংসদীয় পদ্ধতির স্থিতিহীনতা বৈশিষ্ট্য-গুণ বা দোষ যাই বলুন–চালু হতে বাধা নেই। স্বাধীন রাষ্ট্রে দেশ ও জাতির সামগ্রিক স্বার্থের আদর্শে দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়, যদি রাজনীতি ক্লেদমুক্ত থাকে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেশপ্রেম থাকে। এ দেশে আদর্শের বদলে এখন প্রধানতঃ দ্বন্দ্ব ক্ষমতা দখল নিয়ে। ১৯৯০ সালে সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এরশাদ সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে, আন্দোলন ছিল যৌথ এবং ঐক্য, তবে ক্ষমতায় যাওয়ার আকাংক্ষা ছিল একক। কোন আদর্শগত বা দেশের মঙ্গল লক্ষ্যে তাদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল না। ১৯৯৫-৯৬ এর আন্দোলনেও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আদর্শগতঐক্য ছিলনা। এ যাবতকাল যে কয়টি রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করেছে দেশসেবার আদর্শ পালনে না হলেও দলীয় ভাবমূর্তি জনপ্রিয় করণ এবং দলীয় স্বার্থ ভিত্তিকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে সব সরকারই কিছু না কিছু ভাল কাজ করেছে। কিন্তু কোন সরকারই অপর সরকারকে ভাল কাজের সামান্য কৃতিত্ব স্বীকৃতি দিয়ে রাজনীতিতে সততা ও প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। ফলে দিন দিন রাজনীতি পঙ্কিল হতে পঙ্কিলতর হয়ে পড়েছে এবং তা হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে এবং শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণের সরলতা ও সহনশীলতার সুযোগ নিয়ে। সংসদীয় পদ্ধতি চালু না থাকলে '৯১ এর ইতিহাসের নিরপেক্ষতম সুষ্ঠু নির্বাচনকে প্রহসনে পর্যবসিত করে পার্লামেন্টকে পঙ্গু করা যেতো না, আবার প্রান্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসে থাকাও চলতো না, ফলে সমগ্র দেশ ও দেশবাসী

www.pathagar.com

বৎসরাধিককাল যাবত শাসনতান্ত্রিক সংকটজনিত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতো না।

বস্তুতঃ সংসদীয় এবং প্রেসিডেনসিয়াল–উভয় পদ্ধতিই গণতান্ত্রিক। প্রমাণ - ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা। উভয় পদ্ধতির পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামত ও যুক্তি রয়েছে। বিচার্য–কোন্ দেশে ও কোন্ পরিবেশে কোন্টা উপযোগী। সমস্যা অথবা সমাধান আসলে পদ্ধতিতে নয়। উহা নিহিত থাকে পদ্ধতি বাস্তবায়নে এবং যাঁরা বাস্তবায়ন করেন তাঁদের চরিত্রে, আচরণে এবং অভিপ্রায়ে। যে কোন দেশে শিক্ষিত বিবেকবান নাগরিকের সংখ্যা এবং বিরাজমান রাজনৈতিক পরিবেশ শাসন পদ্ধতি ও উহার বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে থাকে। আমাদের পার্লামেন্ট সদস্যগণ পাঁচবৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। দেশ এবং নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে অথবা রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কাজ করলেও তাঁদের সদস্যচ্যুতির বিধান নেই, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের জন্য আর্থিক সুযোগ–সুবিধা ও মর্যাদাভোগের গ্যারান্টি। পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন সরকার পাঁচ বৎসর টিকে থাকবে এমন গ্যারান্টি নেই। আবার এক ভোটের সংখ্যাধিক্যের নীতিতে টিকে থাকলেও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনায় নির্বিঘ্ন থাকতে পারে না।

১৯৩৭-৪৮ সালের ৮ বছরে ৪ বার সরকার গঠন ও পতন হয়েছিল সংসদীয় পদ্ধতির সংসদ সদস্যগণের অবস্থান বিনিময় (shuffling) প্রক্রিয়ায়। সর্বশেষ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা পরাজিত হয়েছিল বৃহত্তর বাংলা বনাম খণ্ডিত বাংলা প্রশ্নে। তদানীন্তন বঙ্গীয় আইন পরিষদে হিন্দু সদস্যগণ এক জোটে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশেম-শরৎবসু প্রস্তাবিত বৃহত্তর বাংলার (Greater Bengal) বিরুদ্ধে ভোট দেয়। আবার প্রস্তাবিত ও গঠিতব্য পূর্বপাকিস্তান আইন পরিষদ নেতা নির্বাচনে সিলেট জেলার সকল সংসদ সদস্য একজোটে সোহরাওয়ার্দীর বিপক্ষে নাজিমুদ্দিনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এ বিবৃত বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শতকরা ৮০ উপর নিরক্ষর জনঅধ্যুষিত

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জন্য কোন্ পদ্ধতি উপযোগী তা নিয়ে পর্যালোচনা ও বিবেচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। কেউ চান প্রেসিডেনসিয়াল, কেউ চান সংসদীয় পদ্ধতি। দুই পদ্ধতির মাঝে বহুবিধ ব্যতিক্রম বা প্রকারভেদ (variations) আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী শিক্ষিত নয় বলে গণতন্ত্র, সরকারপদ্ধতি প্রভৃতি কেতাবী (academic) মতবাদ সম্পর্কে সচেতন নয় এবং কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ তা বিচার ক্ষমতা রাখে না। সংবিধান, সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা আছে বলে সচেতন এবং মতামত পোষণ করে থাকেন যে শিক্ষিত সমাজ তাদের সংখ্যা এক চতুর্থাংশেরও কম। চতুর্থাংশ শিক্ষিত জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আচরণকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন আরো ক্ষুদ্রতম সংখ্যক দলীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। সংখ্যায় অকিঞ্চিৎকর হলেও জ্ঞানী এবং বিবেকবান ও দেশপ্রেমিক শিক্ষিত নির্বাচিত জন প্রতিনিধির হাতে উভয় পদ্ধতিই নিরাপদ হতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষায় সক্ষম। পক্ষান্তরে উক্ত গুণাবলী বর্জিত, সন্দেহভাজন (questionable) চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সদস্যের হাতে কোনটাই কার্যকর হতে পারে না।

সংবিধান মানুষ কর্তৃক প্রণীত বলে উভয় পদ্ধতিতে ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি–একহাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে একনায়কত্ব অর্থাৎ স্বৈরাচার সৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে স্বৈরাচার নেই কেন? সংবিধানে কংগ্রেসের হাতে স্বৈরাচার প্রতিরোধক রক্ষাকবচের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ রাখা আছে বলে। এ রক্ষাকবচ সঠিকভাবে প্রয়োগকল্পে কংগ্রেস সদস্যগণকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন জনসাধারণ ভোটারগণ, যাঁদের ৯০% জন শিক্ষিত। সুতরাং তাঁদের নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক রাজনৈতিক দাবা খেলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ সংবিধানে অমন রক্ষাকবচ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ ভোটার এবং তাঁদের প্রতিনিধি কংগ্রেস সদস্য উভয়েই

www.pathagar.com

সচেতন ও দায়িত্বশীল। নিজেদের সুবিধামত জনগণের নামে আগে কাজ সিদ্ধি করে পরে অনুমোদন চলে না।

প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতি স্থিতিশীল, যা শত শত রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শে বিভক্ত অসংখ্য দল উপদলে সমৃদ্ধ একটি দেশ শাসনে উপযোগী পদ্ধতি। উপরন্তু রাজনৈতিক পরিবেশ যদি ক্লেদমুক্ত থাকে এবং কল্যাণমুখী হয় আর রাজনীতিবিদগণ যদি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকেন তবে স্বৈরাচার টিকে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে সংসদীয় পদ্ধতি স্থিতিশীল নয়, আবার গতিশীল ও নয়। এ পদ্ধতিতে পার্লামেন্টের মেয়াদ থাকলেও সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদ সংবিধানে লিখিত থাকা সত্ত্বেও সংসদ সদস্যগণের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। যখন তখন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত অথবা অচল করে দেয়া যায় এবং পার্লামেন্টকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে–যেমন ঘটেছে বাংলাদেশে ১৯৯৫-৯৬ সালে। দেশ বাঁচলো কি গোল্লায় গেল সেদিকে লক্ষ্য না করেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য একজোট হতে পারলেই হলো। চাই কি সাংবিধানিক বৈধ প্রক্রিয়ায় দেশের স্বার্থহানিকর পদক্ষেপও নেয়া যেতে পারে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণহীন প্রেসিডেনসিয়াল পদ্ধতিতেও স্বেচ্ছাচারিতার আশংকা থাকে, যেমন রাশিয়ান পদ্ধতি। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি এ ত্রুটিমুক্ত, যা হতে পারে অনুকরণীয়।

ইংল্যাণ্ডের সংসদীয় পদ্ধতি কোন সংবিধানে লিপিবদ্ধ নেই–কনভেনশন-অর্থাৎ পার্লামেন্ট সদস্যগণের মতের ঐক্যের (consensus) ভিত্তিতে স্বীকৃত ও প্রচলিত প্রথা চালু রয়েছে। আমাদের দেশের মত দুই নির্বাচন মধ্যবর্তী পার্লামেন্টের নির্দিষ্ট মেয়াদকালে সরকারের পতন বা বদল হয় না, যুদ্ধের ন্যায় কোন এমারজেন্সী ছাড়া। পার্লামেন্টের মেয়াদান্তে নির্বাচনের পরেই সরকার পরিবর্তন হতে পারে। এর একমাত্র কারণ, পার্লামেন্ট সদস্যগণের নৈতিকতা এবং শিক্ষিত ভোটার জনগণের সচেতনতা। তবে

www.pathagar.com

ব্যতিক্রমও নিকট অতীতে দেখা গেছে। নির্দিষ্ট মেয়াদকালের পূর্বে শাসকদল ক্ষমতা হারানো বা দলের অভ্যন্তরিন বিভক্তির কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচন ও সরকার বদলের নজির রয়েছে। সংসদীয় পদ্ধতির বিবৃত মারাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো অশিক্ষিত সমাজেই কার্যকর হতে পারে। শিক্ষিত সমাজে নয়। আলোচিত দোষত্রুটি অথবা মঙ্গলের মরীচিকা সম্বন্ধে ১৯৯১ সালের বা তৎপূর্বেকার নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ অবহিত ছিলেন বা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না জানা যায়নি তবে সীমিত আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে আত্মহারা হয়ে বি-এন-পি জাতীয় স্বার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় পেয়েছে বলে মনে হয় না। তাই দলীয় আদর্শ পরিহার করে বয়কটকারী বিরোধীদলের চেয়ে এ দল দেশের কম ক্ষতি করেনি। বি এন পি তার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য খেসারত দিয়েছে সে সাথে দেশবাসীকেও খেসারতের অংশীদার করেছে।

বাংলাদেশের একাধিক সমস্যার মধ্যে মূখ্য ও প্রাসঙ্গিক (pertinent) সমস্যা দুটি। প্রথম মুখ্য সমস্যাটি হচ্ছে জাতির জন্মসত্তা নিয়ে। শতকরা ৮৮ জন অধিবাসীর ধর্মীয় সংস্কৃতি সংহতিকরণ এবং উহার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ সংরক্ষণ। একটি নবজাত স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের কাছে স্বীয় জাতীয়সত্তা (national identity) বা জন্ম উৎস সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণায় ঐক্য না থাকলে দেশ পরিচালনায় সঠিক সমন্বিত (consensus) নেতৃত্ব আশা করা যায় না। স্বাধীনতা অর্জন প্রাক্কালে জন্ম প্রাপ্ত বর্তমান উঠতি প্রজন্মের কাছেও আপন জাতীয় সত্তার দ্ব্যর্থহীন পরিচিতি নেই। ২৫ বৎসর বয়সী বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। যার সুনির্দিষ্ট সীমাঘেরা ভৌগোলিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং তা পৃথিবীর মানচিত্রে বিরাজমান। সুতরাং সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় ভৌগোলিক অস্তিত্বের স্বীকৃতিবাহী নাগরিকত্ব, জাতিত্ব বা জাতীয়তা থাকা অবিশ্বম্ভাবী, যা নিয়ে দ্বিধা, সংশয় বা মতবিরোধ থাকার কথা নয়। অথচ বাংলাদেশে

www.pathagar.com

এখনো, এ স্বতঃসিদ্ধ সত্য নিয়ে ঐকমত্য নেই। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতিতে প্রভাবকারী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজে এ নিয়ে ঐকমত্য নেই। দেশের ভবিষ্যতের জন্য ইহা মারাত্মক এবং গণতন্ত্রের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদের চেয়ে ধ্বংসাত্মক। জাতীয় সত্তা নিয়েই যদি ভ্রান্তি (confusion) থাকে সত্যিকার গণতন্ত্র বুঝবার এবং বুঝাবার মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে? সংখ্যাধিক্যের মতামতই যদি গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হয়ে থাকে তবে ৮৮% জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসমতে অনুভূতি, আচরণ ও সংস্কৃতি কি অগণতান্ত্রিক? দ্বিতীয় মুখ্য সমস্যাটি হচ্ছে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এ জন্য প্রয়োজন একটি জনকল্যাণকামী স্থিতিশীল সরকার যে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হবে গোষ্ঠি বা শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধে এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে একক জাতীয়কল্যাণমুখী এবং দেশপ্রেমী। অথচ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার একটি রাজনৈতিক দলীয় সরকার হতে বাধ্য। যার পক্ষে বিভিন্ন (heterogeneous elements) মত ও দলের স্বার্থের পরিবর্তে দল নিরপেক্ষ সমদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সরকার হওয়া কি সম্ভব? আবার কোন দলীয় সরকারকে স্থিতিশীল হতে হলে পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা চাই, যা হতে পারে দেশের অধিকাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বসূচক বা জন আস্থার প্রতীক। অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ পার্লামেন্ট সদস্য সমর্থিত এমন সরকার আবার শিক্ষায় পশ্চাৎপদ সমাজে স্বৈরাচারী হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, যেমন হয়েছিল ১৯৭৫ জানুয়ারী বাকশাল প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে। ৫ম সংসদে ১৭০ আসন নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এ ধরনের প্রান্তিক গরিষ্ঠ সরকার একদিকে যেমন নাজুক অন্যদিকে সংখ্যার নিক্তিতে ক্ষমতাসীন থাকতে পারলেও বাস্তবে এবং নৈতিক বিচারে জনপ্রতিনিধিত্বশীল হয় না, যদিও আইন সিদ্ধ বৈধ সরকার। একমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রেই এমন অসঙ্গতি থাকতে পারে এবং দেশবাসীকে সে আইনসিদ্ধ কারচুপি ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হজম করতে হয়।

www.pathagar.com

গণতন্ত্র এমন একটি রাষ্ট্রনীতি বা কৌশল (mechanism) যার বাস্তবায়নের সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে বাস্তবায়নকারী নেতৃত্বের দেশপ্রেম ও প্রজ্ঞার তারতম্যের ওপর। যে দেশে অধিকাংশ অধিবাসী শিক্ষিত সুতরাং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগণও হয়ে থাকেন শিক্ষিত সে দেশে তাঁদের হাতে গণতন্ত্রতা সংসদীয় হোক বা প্রেসিডেনসিয়াল–নিরাপদ রাষ্ট্রনীতি এবং জনকল্যাণকর হতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষিত জনসমাজেই সংসদীয় গণতন্ত্র বাস্তব অর্থে কার্যকর হতে পারে এবং দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর অবদান রাখতে পারে। শিক্ষাহীন সমাজে অধিকার সচেতনতার অভাবে গণতন্ত্রের নামে উহার অপপ্রয়োগের আশংকা থাকে। বাংলাদেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ নিরক্ষর, ৩০ ভাগ অক্ষরজ্ঞান রাখে, তার মধ্যে ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষিতের হার ২-৩ ভাগ। সাম্প্রতিক এক বেসরকারী জরিপের প্রতিবেদনে জানা যায় যে ১৯৯৬-১২ জুনের জাতীয় নির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থীগণের মাত্র ৪০% গ্রাজুয়েট ছিলেন। তার মধ্যে কতজন নির্বাচিত হয়েছেন তা জানা যায়নি। এ প্রেক্ষিতে গ্রাজুয়েশনের নিচু শিক্ষামানের ৬০% জনপ্রতিনিধি একটি দেশের সর্বোচ্চ বিধানপীঠ পার্লামেন্টে কী ধরনের আচরণ এবং দেশ পরিচালনা নীতি প্রণয়নে কী মাত্রার অবদান রাখতে পারবেন তা স্বাধীন বাংলাদেশের ২৫ বৎসরের শাসনপদ্ধতি বাস্তবায়নের চিত্র স্মরণ ও বিবেচনা করলেই অনুমান করা যাবে।

শিক্ষার মান ছাড়াও বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্যের প্রার্থীও নির্বাচিত হয়ে থাকবেন। বিবৃত ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্বদেশপ্রেমিক, বিবেকবান এবং নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দায়িত্বশীল হবেন আশা করা যায়। তাহাই সরলপ্রাণ দেশবাসীর ভরসা। সূচনাতেই বলা হয়েছে এ পর্যালোচনাটি একটি ব্যক্তিগত চিন্তাধারা ও অভিমত, প্রতিপাদ্য বা সত্যায়ন। নয়। দেশপ্রেমিক জ্ঞানী চিন্তাশীল সুধীসমাজ এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষে মাতৃভূমির সামগ্রিক মঙ্গলকে

www.pathagar.com

লক্ষ্য রেখে উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলো এবং সংশ্লিষ্ট ভাবার্থ অনুধাবন করে বিচার বিবেচনা করে সংসদীয় এবং প্রেসিডেনসিয়াল–উভয় পদ্ধতির নির্যাসের সমন্বয়ে ৭০% শিক্ষাবিহীন সমাজের উপযোগী কোন রাষ্ট্রনীতি উদ্ভাবন করা যায় কি না ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

১২.৫৮ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা

বিগত (১৯৯৬ জুন) পার্লামেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে মতবিনিময়, সেমিনার, আলোচনা, তর্কবিতর্ক তুঙ্গে ওঠেছিল এবং ভবিষ্যতে সকল নির্বাচনেও হবে। নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন প্রার্থী ও নির্বাচকমণ্ডলী মহলে উৎসাহ উদ্দীপনা, আশা আকাঙ্খা ও আশঙ্কা, পরিকল্পনা ও আকাশ কুসুম কল্পনাও ব্যাপক হয়ে থাকে। নির্বাচন কমিশন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য অনুসরণীয় কিছু আচরণ নীতি গ্রহণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিগত ৬টি সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণের আচরণ বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতার আলোকে দেশবাসী জ্ঞানী চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদগণ ভোট দাতাগণের চিন্তাভাবনা ও বিবেচনার উদ্দেশ্যে প্রার্থীগণের চরিত্র বৈশিষ্ট্য এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগণের সম্ভাব্য আচরণ নীতি, ইপ্সিত ন্যায়পরায়ণতা ও রাজনৈতিক নৈতিকতার (integrity) ওপর কিছু আলোকপাত করাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য।

বলা হয়ে থাকে, জনগণ ক্ষমতার উৎস এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি। অর্থাৎ তাঁরা সংসদে দেশের মঙ্গল ও কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করবেন, সে আইন জনকল্যাণে নির্বাহী পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় কি না তা তদারকি করবেন, ভোট দাতাগণের সমষ্টিগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান এবং উন্নয়নসাধন ও ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দশা নিরসনে হিতৈষী মুখপাত্র বা মুরব্বীরূপে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী মহলে পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। সরল বিশ্বাসী দেশবাসীর ইহা স্বাভাবিক

www.pathagar.com

প্রত্যাশা এবং নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের জন্য ইহা নৈতিক কর্তব্য। অন্যকথায়, ভোটপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতার ঋণ (obligation) । তবে স্বাধীনতা প্রাপ্তি উত্তর ২৫ বৎসর কালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সাধারণতঃ বাস্তব পরিস্থিতি বিপরীত। বিরল ব্যাতিক্রম ছাড়া নির্বাচনের পরে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কাউকে সচরাচর কাঙ্খিত বা প্রতিশ্রুত ভূমিকায় বড় একটা দেখা যায় না। যাঁরা সাধারণতঃ শহরে বসবাস করেন এবং প্রার্থীরূপে নির্বাচনকালে গ্রামে নামেন নির্বাচিত হবার পর তাঁরা কালেভদ্রে পল্লী অঞ্চলে পদার্পন করে থাকেন। আর যাঁরা সচরাচর শহরে বসবাস করেন না তাঁরাও নির্বাচিত হয়ে আভিজাত্য অর্জন করে নেতা হয়ে রাজধানীতে এসে বসতি গ্রহণ করে পল্লীবাসী ভোটদাতাগণের নাগালের বাইরে চলে যান। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনসেবকের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া দূরের কথা, অর্থব্যয় করে রাজধানীতে না এলে সাক্ষাৎ পাওয়া দুস্কর। শুধু কি তাই? সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও কোন সাহায্য, উপকার বা সেবা পেতে হলে সেবার আর্থিক মূল্যও (service fee) যে দিতে হয় তারও নজির রয়েছে। অতিরঞ্জণ মনে হতে পারে তাই বক্তব্যের সমর্থনে দুএকটি দৃষ্টান্ত নমুনা নজির রূপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. জনৈক সরকারী কর্মকর্তা কর্মস্থলে স্থানীয় রাজনৈতিক দলীয় চাপ এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বারে বারে বদলী, আবার বারে বারে বদলী বাতিল জনিত দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন। তাঁর আপন এলাকার সংসদ সদস্য, যিনি স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং ভালমন্দের অভিভাবক হওয়ার কথা, তাঁর সাহায্য কামনা করা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মাধ্যমে বিষয়টির ন্যায্য নিষ্পত্তি করে দিবার ফিস বাবত কিছু নগদ অর্থ আদায় করলেন বটে তবে মন্ত্রীর কাছে বিষয়টি আর উপস্থাপন করেন নি কিংবা সুযোগ পান নি অথবা উপস্থাপন করার সাহস তাঁর হয়নি। ভুক্তভোগী কর্মকর্তা অনুধাবন করলেন যে একজন পার্লামেন্ট সদস্য কর্তৃক তিনি প্রতারিত হয়েছেন। মর্মাহত এবং দিশেহারা হয়ে গ্রন্থকারের কাছে ভোগান্তির কাহিনী শোনালেন। অর্থের বিনিময়ে জন

www.pathagar.com

প্রাতিনিধির পৃষ্ঠপোষকতা ক্রয়ের (ঘুষ প্রদান) মত অনাচারক্রিয়ায় 'সহযোগিতা' করার জন্য তাঁকে তিরস্কার করলাম। যেহেতু বিষয়টি ন্যায়বিচারের দাবী রাখে আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের গোচরে নিয়ে ন্যায়নিষ্ঠ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে দিই।

২. প্রচলিত নিয়ম বিধিমতে ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এবং প্রস্তাবিত বাজেট উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর বরাদ্দ অর্থের ছাড়পত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করার পূর্বশর্তরূপে অনুমোদিত বাজেটে স্থানীয় এলাকা হতে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যের প্রতিস্বাক্ষরের (endorsement) নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা কেন তা জানা যায়নি এবং প্রতিস্বাক্ষরের জন্য কোন মাসুলও (ফি) দেয় ছিল না। তবু অলিখিত ও অনির্ধারিত এ ফি না দিলে না কি প্রতিস্বাক্ষর সময়মত সংগ্রহ করা যেতো না–দরাদরিতে দেরী হতো ফলে কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক বিড়ম্বনায় পড়তো। এই প্রতিস্বাক্ষর ফি না কি দস্তুর মাফিক দেয় হয়ে পড়েছিল। উন্নয়ন কর্মসূচীতে স্থানীয় এমপির প্রতিস্বাক্ষর প্রথা তারপরও চালু ছিল (৫ম সংসদ কাল) তবে পূর্বসুরীর ফিস গ্রহণ প্রথা পরবর্তী উত্তরসুরীগণ অনুসরণ করছেন কি না জানা যায়নি। অবশ্য কোন পরিষদ চেয়ারম্যান বিরোধী দলভুক্ত বা নির্দলীয় ব্যক্তি হলে সরকারী দলভুক্ত এমপি আপন দলভুক্ত জনের পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে প্রতিস্বাক্ষরকে ভেটোর কাজে লাগাতে পারেন। নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত প্রজেক্ট কমিটিই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার বিধান। জনাব এমপি মহোদয় প্রতিস্বাক্ষরদানের শর্তরূপে নির্বাচিত সদস্যের অতিরিক্ত সরকারী দলভুক্ত কোন প্রভাবশালী এবং চেয়ারম্যানের প্রতিপক্ষীয় ব্যক্তিকে প্রজেক্ট কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার নজির রয়েছে, যার ফলে বিপরীত স্বার্থ ও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কোন্দলে প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে পারেনি বলে জানা গেছে।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছেই বিবৃত পরিস্থিতি জানতে পারি চতুর্থ সংসদ মেয়াদকালে। পরিষদের প্রাপ্ত বা প্রাপ্য অর্থের কত অংশ কি কি অলিখিত ও বাজেট বহির্ভূত খাতে অদৃশ্য হয়ে (diversion) যাওয়ার পর আসল তহবিল এবং বরাদ্দ অঙ্কের মাঝেকার গরমিল (shortfall) কি ভাবে মিমাংসা (adjustment) করা হতো সে সম্পর্কেও কিছু জ্ঞান লাভ করেছি আমি এ নির্ভীক চেয়ারম্যানের কাছে।

৫ম সংসদ মেয়াদকালে উপজেলা কর্তৃক বাজেট অনুমোদন সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তিত হয়ে জেলা প্রশাসকের দায়িত্বে স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল। ইহাকে জনপ্রতিনিধিদের হাত হতে ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতে পুনরায় ফেরৎ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলে গুঞ্জনও শোনা গিয়েছিল। এ পরিবর্তনের বিস্তারিত এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি জানবার সুযোগ হয়নি। তবে যথেষ্ট অনিয়ম ও দিক নির্দেশনার অভাব রয়ে গেছে বলে শুনতে পেয়েছি। বৃহত্তর নোয়াখালী এলাকায় দিনেমার (Danish) সরকারের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (Nrdp) বাস্তবায়ন করা হতো উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ মাধ্যমে, যার নির্বাহী ও প্রশাসনিক তদারকী দায়িত্ব পালন করতো পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং কারিগরী পরামর্শ প্রদান করতো ড্যানিশ মিশন (DANIDA)। এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ অননুমোদিত ভিন্ন খাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট (diversion) হয়ে যেতো বলে বিদেশী মিশন কর্মকর্তাগণ আমার সাথে আলোচনা কালে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ লক্ষ্যভ্রষ্টের পেছনে কখনো কখনো কোন কোন সংসদ সদস্যের অবদানের (role) কথাও বিদেশীগণের জানা ছিল, যা আমাদের জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ককর বৈশিষ্ট্য বলে তাঁরা মনে করতেন।

দরিদ্র পল্লীবাসিগণের উপকারার্থে ১৯৮৮ সালে প্রতি ইউনিয়নে রেশন প্রথা চালু করা হয়েছিল। খাদ্য বিভাগের নিয়মিত ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কাঠামো এবং কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও বিধান করা হয় যে রেশন ডিলার নিয়োগের চূড়ান্ত

www.pathagar.com

নির্বাচনের "পবিত্র" বা গুরুদায়িত্ব পালন করবেন জেলা কমিটির নামে পার্লামেন্টে স্থানীয় সদস্য। এ জন্য ফিস প্রদানের কোন বিধান ছিল না। তথাপি এ ক্ষেত্রেও অলিখিত অঙ্কের (ফি) বিনিময়ে ডিলার নির্বাচনকার্য নির্বাহ করা হয় বলে নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলারগণের কাছে জানতে পারি। প্রতি ইউনিয়নে রেশন ডিলারের সংখ্যা সীমিত করে দেয়া হলেও প্রার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই ছিল ততোধিক। সুতরাং সবাই প্রতিযাগিতা করেন। যিনি যত বেশী ফি এর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন তিনি নাকি নির্বাচিত হওয়ার ততবেশী যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। অবশ্য ব্যর্থ এবং সফল প্রার্থী নির্বিশেষে সবাই না কি সম্মানী (honorarium) দিয়েছেন। একজন ডিলার বিশহাজার টাকা ব্যয় করেছেন বলে জেনেছি, যা তাঁকে পুনরোদ্ধার করতে হবে। দরিদ্রের জন্য সরবরাহকৃত রেশন সামগ্রী অবৈধভাবে হস্তান্তরের মাধ্যমে উসুল না করলে কী ভাবে তাঁর ঐ অর্থ আদায় হবে? জনকল্যাণের কী অপূর্ব ব্যবস্থা। গণনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের ছত্রছায়ায় জননির্বাচিত জনপ্রতিনিধির পৃষ্ঠপোষকতায় এমন জনসেবার বিরুদ্ধে কি প্রতিবাদ চলে? যা হোক, পরবর্তী সরকার পল্লী রেশন প্রথা বাতিল এবং উপজেলা পরিষদ লোপ করে দিয়েছে। ৭ম সংসদীয় সরকার উপজেলা প্রথা পুনঃচালু করতে পারেন। বলে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া চলছে।

শিক্ষিত জনসমাজেই গণতন্ত্র জনকল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষাবিহীন জনসমাজে অধিকার সচেতনতার অভাবে গণতন্ত্রের নামে উহার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকে। আমাদের গণতন্ত্রে সে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও জন প্রতিনিধি নির্বাচন অনিবার্য। বিভিন্ন চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, তাই দেশবাসীকে নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচনকালে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। এক এক সময়কালে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন থাকলেও নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যগণ রাজনৈতিক ও আদর্শ নির্বিশেষে সবাই একই দেশের সন্তান। একই মাটি একই আবহাওয়া এবং ব্যাপক শিক্ষাবিহীন

www.pathagar.com

সমাজ পরিবেশজনিত একই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। লক্ষ লক্ষ টাকা নির্বাচনে ব্যয় করে থাকেন। এই অর্থ জনসেবার পুণ্যলাভের আশায় "সদ্‌কা" হিসাবে ব্যয় করা হয় না কি মুনাফা সমেত ফেরৎ পাওয়ার আশায় আগাম বিনিয়োগ করা হয় তার জওয়াব পাওয়া যেতে পারে এ যাবতকালের নির্বাচিত সদস্যগণের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পারিশ্রমিক সুযোগ সুবিধা ভোগের আচরণে এবং উহার প্রতি রাজনৈতিক দলের মনোভাবে। এ প্রসঙ্গে ৫ম পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে কিছু গ্লানিজনক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা যাক।

১৯৯২ সালে পার্লামেন্ট সদস্যগণের ভাল এবং সম্মানজনক রোজগারের (remuneration) আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। তাঁরা নিজেরাই আইন পরিষদে এ বিশেষ পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন, যা ছিল সরকারী-বিরোধী নিরপেক্ষ সকল সদস্যের ঐকমত্যের সুফল। মোটা অঙ্কের নির্দিষ্ট (প্রায় ১৪,২০০ টাকা) মাসিক বেতনের অতিরিক্ত ৭৫,০০০ টাকা সম্মানী, ৩ লাখ টাকার জীবন বীমা, শুল্কবিহীন গাড়ী, বিনা ভাড়ায় দেশব্যাপী স্থলে জলে আকাশে ভ্রমণ অথবা মাসিক ৩০,০০০ টাকা ভ্রমণভাতা, সংসদ অধিবেশনে এবং কমিটি মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য টি এ ডি এ প্রভৃতি ধরনের অভূতপূর্ব আর্থিক সুযোগ–সুবিধা ভোগের বিনিময়ে তাঁরা আপন দায়িত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্বের প্রতি মর্যাদাশীল সচেতন থাকবেন বলে স্বাভাবিকভাবে আশা করা গিয়েছিল।

১৯৯২ সালের পরিবর্তিত গণতান্ত্রিক পরিবেশে যাঁরা জনপ্রতিনিধিত্বের মর্যাদা অর্জন করেছেন তাঁদের নির্বাচন ছিল পূর্বেকার সকল নির্বাচনের তুলনায় অবাধ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত। সুতরাং তাঁদের যাত্রা ছিল নিষ্কলুষ, দায়িত্বপালন, নৈতিকভাবে বাধ্যবাধকতামূলক এবং পবিত্র ও গুরু। জাতির এ প্রত্যাশার প্রতি তাঁরা কি সম্মান প্রদর্শন করেছেন? না নিষ্কলুষ পদবৃত্তি (membership incumbency) পবিত্র রেখেছেন?

www.pathagar.com

মাসিক (১৪,২০০) টাকা বেতনের সাথে টেলিফোন বিল বাবদ ৪,০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করেও কোন কোন সংসদ সদস্য বিল পরিশোধ করেন নি বলে অপবাদ প্রচলিত এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে। একজনের নাকি ৯ লাখ টাকা আর একজনের ৮ লাখ টাকা ফোন বিল বাকী ছিল। পার্লামেন্ট অধিবেশন বয়কট/পদত্যাগ করে অনুপস্থিত থেকে সদস্যপদ হারিয়েও বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করেছেন, যে জন্য ১৯৯৫ সালের প্রথম ৫ মাসে বিমান নাকি ৯ লাখ টাকার বিল সংসদ সচিবালয়ে পাঠিয়েছে। আবার কেহ ভ্রমণপাশ গ্রহণ না করে নগদ ৩০,০০০ টাকা ভ্রমণভাতা গ্রহণ করেছেন তবে আদৌ ভ্রমণ করেছেন কি না জানা যায়নি। সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে হাজিরা রেজিষ্টারে সই করতেও বিবেকে বাধেনি। জাল দলিলে সই করে বা সই জাল করলে প্রতারণা বলা হয়। অনুপস্থিত থেকে হাজিরা রেজিষ্টারে সই করার সাথে পার্থক্য কিছু আছে কি? পার্লামেন্ট অধিবেশন বয়কট বা সদস্যপদ ত্যাগ করে অনুপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন অবহেলা বা ভোট দাতাগণের ম্যানডেট উপেক্ষা করেও বেতন গ্রহণ ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগকরণ কে অবৈধ মনে করেন নি।

একদিকে স্পীকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র প্রত্যাখ্যানে আপত্তি অন্যদিকে অনুপস্থিতির কারণে একাউন্টেন্ট জেনারেল কর্তৃক বেতন বিল পাশ না করায় দোষারূপ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর চাপ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। অর্থাৎ তাঁরা পদত্যাগ সঠিক এবং সত্য দাবী করেন কিন্তু পদত্যাগজনিত আসন শূন্য তথা অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বেতন গ্রহণকে অবৈধ মনে করেন না। কী বিচিত্র গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের রাজনীতি। এবং সে রাজনীতির নেতৃত্বের কী অনুকরণীয় আদর্শ!

অতীতে কোন কোন সংসদ সদস্যের কর্মকাণ্ডে এবং আচরণে জনপ্রতিনিধিত্বসুলভ সম্মানাস্পদ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে অনুকম্পা বিতরণকারীর ভূমিকাই প্রতিভাত হয়েছে। আর আলোচ্য (১৯৯২-৯৫) পার্লামেন্টে

www.pathagar.com

সদস্যগণের উল্লিখিত অশোভন (unbecoming) চরিত্র বৈশিষ্ট্যে জাতীয় পার্লামেন্টের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং সদস্যগণের সম্ভ্রম যে কত মহান সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় কি? সম্মানের মর্যাদা হতে নিজেরাই কি নিজেদের নিচে নিক্ষেপ করেন নি? পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী ঘৃণাভরে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করতে পারে বলে মনে করা যেতে পারে না কি? পার্লামেন্ট সদস্যগণ শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাশীল নাগরিক এবং সম্মানার্হ সমাজপতিরূপে তাঁদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, আচরণ জনগণের অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া অভিপ্রেত নয় কি? তরুণ-যুবক ছাত্র সমাজকে সমাজ ও দেশের ভবিষ্যৎ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আলোচ্য দৃশ্যপটে সে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের এ সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুকরণে উৎসাহী হবে না কী? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সমাজপতি পাঠকগণের বিবেচনার ওপর এ সকল জিজ্ঞাসার উত্তর ছেড়ে দেয়া হলো।

১২.৫৯ ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন

প্রতি ৫ বছর অন্তর ইউনিয়ন পরিষদ ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের কাছে প্রশাসনের নিকটতম প্রতীক ও বিরাজমান সরকারের অস্তিত্বের প্রমাণ। ইউনিয়ন পরিষদ রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক উন্নয়নের চাবিকাঠি এবং গ্রামীণ জনতা তথা পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নতির রচনাক্ষেত্র।

পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমরূপে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, যাতে পল্লীবাসী ১৯৯১ সালে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ও ১৯৯৬-১২ জুন পার্লামেন্ট

www.pathagar.com

নির্বাচনের ন্যায় স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে আপন পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন রাজনৈতিক দলীয়ভিত্তিক না হলেও সকল রাজনৈতিক দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। জনসাধারণের কাছেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অপেক্ষা প্রশাসনের ভিত্তিস্তর ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং উহার নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেশী। পার্লামেন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক, যা জনসংখ্যার শিক্ষিত ও রাজনৈতিক সচেতন অতি ক্ষুদ্রাংশের সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে চার তৃতীয়াংশ পল্লীজনতা তাদের দৈনন্দিন আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইউনিয়ন পরিষদকেই ভালমন্দের প্রতিভূ মনে করে থাকে। এ কারণেই পার্লামেন্ট নির্বাচনে পল্লীবাসীর মাত্র একাংশ অংশ নিয়ে থাকলেও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচলেন সমগ্র গ্রামবাসী অতি উৎসাহে ও আগ্রহে স্বেচ্ছায় জড়িত হয় এবং অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে সৎ ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যাই অধিক। তবে তারা নিরীহ, নির্জীব ও অসহায়। সমাজের এ রকম অবস্থার জন্য সাধারণ গ্রামবাসী দায়ী নয়। এর কারণ মূলতঃ (১) আর্থিক দুর্গতি, (২) শিক্ষিত সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণের গ্রামীণ জীবনের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য, (৩) সরকারের জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ ও প্রচার এবং বাস্তবায়নের মাঝে অসংগতি, (৪) সম্ভ্রমশীল ব্যক্তিগণের গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হওয়া। এ সবের ফলে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অভাব, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় টাউট বাটপার শ্রেণীভুক্ত গ্রামীণ পাতি-নেতাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং ন্যায়বিচারভিত্তিক প্রশাসনের অনুপস্থিতি বা তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জনগণের মনে সংশয়। নির্বাচিত ও সরকার অনুমোদিত ইউনিয়ন প্রশাসন যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও আর্থিক স্বার্থ, পারিবারিক কলহ এবং জমিজমা সংক্রান্ত কোন্দলে ইন্দন যোগান, একের পিছে অপরকে লেলিয়ে ঝগড়া, মারপিট ঘটিয়ে সালিশের

www.pathagar.com

আয়োজন ও জরিমানা আদায় করে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা এক শ্রেণীর গ্রাম্য নেতাদের পেশা হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জননির্বাচিত প্রতিনিধিগণও এসব কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগী হয়ে থাকেন। কারণ অধিক ক্ষেত্রেই নির্বাচন বিজয়ের প্রধান উপকরণ হয়ে থাকে শিক্ষা, সততা ও সমাজমর্মিতার পরিবর্তে অর্থ ব্যয়, জোর জবরদস্তি ও স্বার্থপর শ্রেণী গোষ্ঠির সমর্থন। এ ধরনের সার্বিক নোংরা পরিস্থিতি সৃষ্টি ও পুষ্ট হয়ে থাকে জেলা ও থানা শহরভিত্তিক রাজনৈতিক সমর্থন ও আশ্রয়ের ফলে। সাধারণ নিরীহ ভাল মানুষ সবাই এ রকম সামাজিক দুর্নীতির শিকার এবং এরই মাঝে বসবাস করে, কিন্তু মনেপ্রাণে এমন পরিস্থিতি চায় না। তারা চায় সৎ ও জনদরদী শিক্ষিত ব্যক্তি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত হোক এবং গ্রাম পর্যায়ের উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করুক। কিন্তু বিরাজমান কুটিল ও ক্লেদময় পরিবেশে ভাল ও মানসম্মানসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচনে আগ্রহী এবং প্রার্থী হন না। কে সৎ ও সমাজ দরদী, কে দুর্নীতিবাজ গ্রামের মানুষ তা ভাল করে চিনে ও জানে এবং তাদের পছন্দের ব্যক্তি নির্বাচিত হোক তা চায়। এজন্যে চাই শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বাধীন ভাবে যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দিতে পারবার নিশ্চিত অধিকার। সকল রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ভাষণে, উপদেশে এমনকি সংসদে এসকল নীতিকথা ঘোষণা করে থাকেন বটে। কিন্তু বাস্তবে সে রাজনৈতিক মহলের প্রশ্রয়েই ওসব অঘটন ঘটে থাকে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না।

ইতোপূর্বকালে অর্থ ও বাহুবলের কারণে তা সম্ভব হয়নি। পূর্বেকার সকল ধরণের সকল নির্বাচনে রক্তাক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভোট ডাকাতি, কেন্দ্র দখল, সশস্ত্র আক্রমণ ও বাধা, ব্যালটবাক্স ছিনতাই, নির্বাচনী কর্মকর্তা অপহরণ ইত্যাদি ছিল নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘকাল পরে শুভ ব্যতিক্রম ঘটেছে ১৯৯১ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী ও ১৯৯৬ এর ১২ জুনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও এ শুভ ব্যতিক্রম ধারা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ

www.pathagar.com

নির্বাচন নিশ্চিত করা চাই, যাতে সৎ ও জনদরদী ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পান এবং আগামীতে সকল প্রকার নির্বাচনে এ ব্যতিক্রম ধারা যেন স্থায়ী ধারা রূপে জাতীয় চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনও তা চান এবং সে আশা ব্যক্ত করে থাকেন। তবে ব্যক্ত আশার সফলতার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ না নিলে নিরাশার সম্ভাবনা রয়ে যায়। ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ন্যায় ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থা নির্বাচনেরও কিছু নির্বাচনী নীতি ও আচরণবিধি নির্ধারণ, প্রয়োগ ও তা যথাসময়ে ঘোষণা একান্ত বাঞ্ছনীয়। পার্লামেন্ট নির্বাচনে অন্যান্য আচরণবিধির মধ্যে একটি ছিল কোন ইউনিয়ন এলাকায় নির্বাচনকালে আইন শৃঙ্খলা ও নির্বাচন কার্য বিঘ্নিত হলে সে ইউনিয়ন পরিষদ বাতিলকরণ। অভিপ্রায় ভাল হলেও এ বিধির পূর্ণ বাস্তবায়ন যে সম্ভব নয় তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কারণ ইউনিয়ন পরিষদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বা ক্ষমতা প্রয়োগে বাধ্যকারী বাহিনী থাকে না। নৈতিক ও আইন সমর্থিত দায়িত্ব এবং ইচ্ছা থাকলেও বিধি লংঘন প্রতিহত করার ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের নেই। ফলে যে কয়টি ইউনিয়নে অকাম্য পরিস্থিতি ঘটেছে সে সব পরিষদ বাতিল করা হয়েছিল। পরিষদের কেরানীকে প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে প্রহসনের পরিচয় দেয়া হয়েছে। গ্রন্থকারের অধ্যুসিত ইউনিয়নটি এগুলোর অন্যতম। দীর্ঘকাল যাবত এ সকল ইউনিয়নে কোন পরিষদ কর্তৃপক্ষ থাকে না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকে। চুরি, ডাকাতি, অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়। অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়ে পড়ে। একটা বিধানসিদ্ধ নির্দেশ কার্যকরের ফলে নিরীহ ইউনিয়নবাসী অন্যায় ও অরাজকতার শিকার হয়ে পড়ে। সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যক্তিগত স্বার্থে ও অনুপ্রেরণায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অস্ত্রধারী মুষ্টিমেয় দুস্কৃতিকারীর অন্যায় আচরণের জন্য অপরাধ না করেও সমগ্র ইউনিয়নবাসী শাস্তি পেয়ে থাকে। প্রার্থী বিশেষের ক্রীড়নকরূপে তারই স্বার্থে এবং পক্ষে অর্থের বিনিময়ে দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক সংগঠিত দুষ্কার্য আইনের দৃষ্টিতে গর্হিত হলেও প্রকৃত অপরাধী তো সে প্রার্থী ব্যক্তি, যাকে

www.pathagar.com

দায়ী করার কোন বিধান ছিল না। শাস্তি প্রাপ্য ছিল তার, তা না করে ইউনিয়নের অধিবাসীগণকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যে প্রার্থীর পক্ষে দুষ্কৃতি ঘটানো হয় তাকে দোষী করার বিধান থাকলে কোন প্রার্থী অমন অপকর্ম করতে সাহসী হতো না। বিষয়টি স্থির মস্তিষ্কে গভীরভাবে বিচার করে অভিমতটি যুক্তিপূর্ণ বিবেচিত হলে ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন আচরণবিধিতে যে প্রার্থীর পক্ষে আইন শৃঙ্খলা লংঘিত হবে তাকেই প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্থকরণ, নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা এবং নির্বাচিত হলেও কেন্দ্রবিশেষের প্রাপ্ত ভোট বাতিল গণ্য হওয়ার বিধান নির্ধারণ ও ও প্রয়োগ করা হোক। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে বিধি লংঘনে বিরত রাখার ব্যবস্থা না করে স্থানীয় প্রশাসনকে শৃঙ্খলা রক্ষার একক দায়িত্ব দিলেও ফল হবে না।

১২.৬০ দক্ষ প্রশাসনের অন্যতম উপাদান বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট

(ACR)

গণতন্ত্রী, গণমুখী ও গণকল্যাণকামী সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল এবং প্রশাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও সংস্কারকার্যে লিপ্ত কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ ও বিবেচনার জন্য এ রচনায় আমি নতুন কিছু বিষয় তুলে ধরবো। বিষয়বস্তু সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসনের অপরিহার্য উপাদান চিহ্নিত করে তার উৎকর্ষ সাধন, পন্থা নির্ধারণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসম্পাদনার মূল্যায়ন নিয়ে এ আলোচনার অবতারণা। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর সার্বিক মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র (welfare state) বলা হয়ে থাকে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রী সরকারই কল্যাণকামী সরকার হতে পারে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রকে কল্যাণব্রতী হতে চলে চাই একটি আদর্শ প্রশাসন নীতি এবং দক্ষ প্রশাসন, যার প্রধান উপকরণ হচ্ছে নীতি নির্দেশকারী

www.pathagar.com

ও তদারকীর উচ্চতম স্তর হতে নিম্নতম স্তরে নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। দক্ষ ও গতিশীল প্রশাসন মূলতঃ নির্ভর করে এঁদের সকলের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মনিষ্ঠা এবং একাউন্টেবিলিটির ওপর। কার্যকরী দক্ষ প্রশাসনের স্বার্থে সর্বস্তরের কর্মীগণকে দায়িত্বসচেতন ও কর্মনিবিষ্ট রাখতে দক্ষতা, যোগ্যতা ও নিবেদিত কর্মনিষ্ঠাকে পুরস্কৃত করা যেমন প্রয়োজন, কর্তব্যে অবহেলা ও অযোগ্যতার জন্য তেমন তিরস্কার ও শাস্তির বিধান থাকাও আবশ্যক। যতই কর্তব্যনিষ্ঠ হোক না কেন তার স্বীকৃতি ও যথাযথ পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকলে কর্তব্যনিষ্ঠার মানসিকতা ও দায়িত্ব পালনে আগ্রহ হারিয়ে যেতে বাধ্য। তিরস্কার, পদাবনতি, পদচ্যুতি বা চাকরিচ্যুতি হচ্ছে শাস্তি প্রকরণ, আর পদোন্নতি, মর্যাদা ও বাড়তি সুযোগ সুবিধা হলো পুরস্কার। সরকারী চাকুরি বিধিতে শুধুমাত্র সিনিয়রিটির কারণে পদোন্নতির নিয়ম নেই। তার সাথে কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য গুণাবলীও থাকা চাই। তা সত্বেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পদোন্নতি উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তির মূল্যায়ন, অন্য কথায় খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল। সরকারী কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠা অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। এজন্য কর্মদক্ষতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে কর্মসম্পাদনার নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন (evaluation) প্রয়োজন। কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসম্পাদনার মূল্যায়ন সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসনের পূর্বশর্ত (prerequisite)। পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল এবং বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রশাসনিক পদ্ধতিতে সরকারী কর্মচারী কর্মসম্পাদনার এ মূল্যায়ন রীতি প্রচলিত আছে। তবে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (objective), পদ্ধতি (procedures) এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে এটি বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এ, সি, আর) বলে অভিহিত। এসিআর পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় বৃটিশ শাসনামলে এবং এর উদ্দেশ্য কর্মদক্ষতা যাচাই বা মূল্যায়ন ছিল না, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ভারতবাসী সরকারী কর্মচারীদের রাষ্ট্র তথা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি আনুগত্য যাচাই কিংবা ইংরেজ শাসন

www.pathagar.com

বিরোধী তৎপরতা (sedicious activities) ও আচরণ খুঁজে বের করাই ছিল মুখ্য লক্ষ্য। এদেশী চাকররা কি করছে তা গোপনে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো। সেই সাথে অবশ্য দক্ষতা যাচাইও ছিল দ্বিতীয় (secondary) উদ্দেশ্য। এ কারণে রিপোর্টের বিষয়বস্তু, কর্মচারীর সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য গোপন রাখা হতো, তাকে জানতে দেয়া হতো না। এসিআরএ লিপিবদ্ধ মন্তব্যের ওপর অর্থাৎ সরকারের প্রতি আনুগত্যের জন্য পুরস্কার বা পদোন্নতি কিংবা রাজদ্রোহিতার (treason) বা অবিশ্বস্ততার (perfidy) জন্য শাস্তি, পদাবনতি বা চাকুরিচ্যুতি নির্ভর করতো।

বৃটিশভারত বিভাগের পর স্বাধীন পাকিস্তান এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশে উল্লেখিত কারণ ও উদ্দেশ্য আর থাকেনি তথাপি তখনকার পদ্ধতি বহাল রাখা হয়েছে। কর্মদক্ষতা যাচাই এবং কর্মসম্পাদনা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা এবং গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে, সন্দেহ নেই। তবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মাপকাঠিরূপে তার ব্যবহারের অবকাশ নেই। সুতরাং কর্মকর্তা সম্পর্কে মতামত গোপন রাখার যৌক্তিকতা তো নেই বরঞ্চ ন্যায়নীতির নিরিখে তা অসঙ্গত (improper)। প্রতিবেদন রচনাকালে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সব সময় পক্ষপাতহীন (dispassionate) কষ্টিপাথরে যাচাই করতে পারেন না। প্রতিবেদনকারী কর্তা ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও মানবীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। অধস্তন কর্মীব্যক্তি প্রতিবেদনকারীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে ভাল মন্তব্য আশা করতে পারেন। অন্য কোন কারণে সম্পর্ক খারাপ হলে গোপনীয় মন্তব্যে তাঁর অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এসিআর এর গোপনীয়তা প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধির পরিবর্তে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ, সহকর্মী নির্যাতনের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিভা দমনের মোক্ষম অস্ত্ররূপেও কাজে লাগান হয়ে থাকে। দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও

www.pathagar.com

উপরওয়ালা অসন্তুষ্ট থাকলে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের শিকার হয়ে কর্মকুশলী সরকারী কর্মচারীকে নিগৃহীত হওয়ার নজির বিরল নয়। আমাদের দেশে ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন সহকর্মীর মাঝে প্রতিভার বা মেধার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ উচ্চ ও হীনমনস্কতার ব্যাধি অতি প্রকট। এমন পরিবেশে সরকারী কর্মক্ষেত্রে গুণের স্বীকৃতির পরিবর্তে সচরাচর লাঞ্ছনাই মিলে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে এসিআর একটি প্রশ্নাতীত নিষ্ঠুর উপকরণ। অধিকন্তু, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন খুব কম ক্ষেত্রেই আপনা হতেই নিয়মিতভাবে বছরান্তে লিখিত হয়ে থাকে। একাধিক বছরের অলিখিত রিপোর্ট পদোন্নতি বিবেচনাকালে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদের ফলে একসঙ্গে লিখিত ও সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তখন এটি আর ন্যায় বিচারপ্রসূত ধীর বিবেচনায় লিখিত না হয়ে বিরক্তিমাখা দায়সারা রেকর্ড হয়ে থাকে। ফলে সত্যিকারের মূল্যায়ন হয় না, সুতরাং প্রতিবেদনাধীন কর্মচারীর প্রতি নিশ্চিত সুবিচার হয় না।

উন্নত প্রশাসন পদ্ধতিতে কর্মচারীর দক্ষতা মূল্যায়ন রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাছে গোপন রাখা হয় না এবং একে 'গোপনীয়' বিশেষণও দেয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রশাসনে ইহাকে Efficiency Report (ER) এবং জাতিসংঘ চাকুরিবিধিতে (Performance Evaluation Report (PER) বলা হয়। যেহেতু একজন কর্মকর্তার দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, অপরের প্রতি আচরণের (work relationship) গুণীয় (qualitative) এবং মাত্রিক (quantitative) কার্য সম্পাদনার বিচার ও নিরুপণই লক্ষ্য এবং যেহেতু মূল্যায়নকর্তা একজন রক্ত মাংসের মানুষ, অতএব ভুলভ্রান্তি (misconception) হওয়া স্বাভাবিক। সেহেতু মুল্যায়ন গোপন রাখা হয় না। যার কার্যসম্পাদনের মুল্যায়ন তার অবগতি এবং তার সম্বন্ধে উপরওয়ালার অভিমত সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার অধিকার দেয়া হয়ে থাকে। সন্তোষজনক এবং প্রশংসনীয় কার্যনির্বাহের স্বীকৃতি জেনে পরিতৃপ্তি লাভ এ খোলাখুলি মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। কর্মচারী/কর্মকর্তা

www.pathagar.com

আপন প্রতিক্রিয়া ও অভিমত ব্যক্ত করার জন্য রিপোর্ট ফরমে একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকে। জাতিসংঘ প্রতিবেদন পদ্ধতি আরও উদার, গণতান্ত্রিক এবং বস্তুগত (objective)। এ রিপোর্ট পদ্ধতিতে রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে সরাসরিভাবে বিজড়িত (involvement) রাখার বিধান রয়েছে। The system allows a staff member to be directly involved, rather than merely being the object of report. এ প্রথায় যার সম্বন্ধে P.E.R. লেখা হবে ফরমের নির্ধারিত অংশে কি কি কার্য তিনি সম্পাদন করে থাকেন (describes his own duties or job description) তা লিপিবদ্ধ করবেন, আর রিপোর্টিং কর্মকর্তা তার বিশুদ্ধতা (accuracy) সত্যায়িত এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। যার ফলে প্রতিবেদনকারী অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করে মনগড়া মন্তব্য আরোপ করার সুযোগ পায় না।

আলোচিত খোলাখুলি ব্যবস্থার (open and frank system) ফলে শত্রুতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ থাকে না। উর্ধতন মানুষ কর্মকর্তা সম্পর্কে অধস্তন কর্মকর্তা মনখোলা অকপট অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার পেয়ে থাকেন, যা আমাদের মানসিক জটিলতা (complex) পরিবেশে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, তবে এটাই সঠিক ও সুষ্ঠু প্রশাসন নীতি। এ পদ্ধতিতে মূল্যায়নকারী উর্ধ্বতন কর্তা অধীনস্থ কর্মচারীর কার্যনির্বাহে ঘনিষ্ঠ তদারক করার তাগিদ অনুভব করেন, ফলে পরিমিত সতর্ক অথচ সদোদ্দেশ্যের মনোভাব নিয়ে ন্যায় ও পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন করতে বাধ্য হন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাঝে শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বস্ত, পরিপূরক সহযোগিতা ও আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে দক্ষ প্রশাসন চালু থাকে।

উন্নত দেশসমূহ ও জাতিসংঘের প্রশাসননীতি ও পদ্ধতিতে কর্মচারীর কার্যনির্বাহের প্রচলিত মূল্যায়ন/প্রথা জেনে নিয়ে এবং পর্যালোচনা করে আমাদের প্রশাসনেও তা অনুসরণ করা যায় কি না বিবেচনার দাবী রাখে।

www.pathagar.com

১২শ পরিচ্ছেদ

১২.৬১ প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার নমুনা চিত্র

(ক)

(ইহা একটি নমুনা চিত্র (a case study)। বৃত্তান্ত সত্য ঘটনাভিত্তিক তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মকর্তার পরিচয় এবং ঘটনার মাস ও সাল প্রকাশ করা হয়নি। সরকারী দপ্তরে কোন বিষয় নিষ্পত্তি হতে কেন সময়ক্ষেপণ হয় ও কিভাবে হয় এবং প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী অনুসরণের পথ কত দীর্ঘ ও ঘোরালো তা অনুসন্ধান এবং উন্মোচন করাই এই সমীক্ষার লক্ষ্য)

এক সময়কালে উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের এক সমাবেশে তদানীন্তন মাননীয় রাষ্ট্রপতি দুঃখ করে বলেছিলেন যে সরকারী কর্মকর্তাগণের পর্যাপ্ত আর্থিক ও আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা দেয়া সত্বেও প্রশাসন আশানুরূপ গতিশীল ও কার্যকরী নহে। তিনি দীর্ঘসূত্রিতা অপসারণ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের মাঝে দৃঢ় যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রশাসনকে যুগোপযোগী ও কল্যাণমূলক করে তোলার আহবান জানান।

এ প্রসঙ্গে প্রশাসনের প্রচলিত কার্যপদ্ধতিতে জটিলতা ও উহার মূল গলদ কোথায় তা অনুধাবন ও নিরসনের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী চিন্তাধারায় অবদান রাখাই এ সমীক্ষণের উদ্দেশ্য। সরকারী বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত মহলে মাঝে মাঝে অনেকে আমার কাছে জানতে চাইতেন যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকুরীক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের স্থান বা হিস্যা কোথায়, বাংলাদেশীর নিয়োগলাভে সুযোগ সুবিধা বা পদ্ধতি কেমন অথবা বাধা বিপত্তি কি? এই জিজ্ঞাসার সাথে প্রাসঙ্গিক এমন একটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

বিষয়টি ও তার বাস্তবায়নসূচী

বিষয়ঃ কোন একটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সংস্থায় জনৈক বাংলাদেশী কর্মকর্তার উপদেষ্টা পদে নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন।

মাসের ১৩ তারিখঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত পদে কাজ করতে সম্মত আছেন কি না জানতে চেয়ে এই মর্মে টেলেকস পান।

১৯ তারিখঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে টেলেক্স দেখানো হলে তিনি অনুমতি চেয়ে নিয়মমাফিক নথিতে পেশ করতে উপদেশ দেন

২৫ তারিখঃ ক) সংশ্লিষ্ট বর্ণনা দিয়ে অনুমতি চেয়ে সচিবের কাছে নথি পেশ করা হয়।

খ) সচিব যুগ্মসচিবকে সার সংক্ষেপ পেশ করতে নির্দেশ দেন।

গ) যুগ্মসচিব যথাকর্তব্য পালনের জন্য উপসচিবকে নির্দেশ দেন।

২৮ তারিখঃ উপসচিব সার সংক্ষেপ পেশ না করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার জন্য যুগ্মসচিবকে পাল্টা পরামর্শ দেন।

৩০ তারিখঃ যুগ্মসচিব উপসচিবের পাল্টা পরামর্শ সচিবকে অবহিত করা সমীচীন মনে করলেন, কিন্তু সচিব ইতোমধ্যে বিদেশে চলে গেছেন। কাজেই নথি উপসচিবের কাছে ফেরৎ গিয়ে অপেক্ষায় থাকে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট (incumbent) কর্মকর্তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংস্থাপন বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে এই ব্যাপারে আইন কানুন কি, জানতে চাইলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে যেহেতু ইহা নতুন চাকুরীতে নিয়োগ নহে সেহেতু ইহাতে সংস্থাপনের সম্মতির প্রয়োজন নেই এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ই অনুমতি দিতে পারে।

www.pathagar.com

২য় মাস ৩ তারিখঃ ক) সংস্থাপন বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের উপদেশ ও আলোচনার ভিত্তিতে একটা স্মারক তাগিদ নোট উপসচিবকে দেওয়া হয়।

খ) উপসচিব আপন পূর্ব অভিমতে অটল থেকে সংস্থাপনকে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়ে নথি পুনরায় যুগ্মসচিবকে দেন।

গ) যুগ্মসচিব আইন বা বিধান কী জানবার উদ্দেশ্যে ইআরডি ও সম্ভাব্য অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেন।

২য় মাস ৪ তারিখঃ ইতোমধ্যে সচিব দেশে ফিরে আসেন। তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে তিনি মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য সার সংক্ষেপ পেশ করতে যুগ্মসচিবকে নির্দেশ দেন, কাজেই নথিটি উপসচিবের কাছে তৃতীয়বার ফিরে আসে।

৮ তারিখ ঃ উপসচিব নতুন করে সার সংক্ষেপ রচনা করে যুগ্মসচিবকে দেন।

৯ তারিখ ঃ যুগ্মসচিব সচিবকে দেন।

১০ তারিখ ঃ সচিব অনুমোদনের জন্য মন্ত্রীকে দিলেন বটে কিন্তু মন্ত্রী তখন বিদেশে, অতএব নথি মন্ত্রীর একান্ত সচিবের কাছে পড়ে রইলো।

১১ তারিখ ঃ মন্ত্রী দেশে ফিরলেন।

১২ তারিখ ঃ ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিবের কাছে এ সম্পর্কে বিধিবদ্ধ নীতি বা আইন সম্বন্ধে উপদেশ চাইলে তিনি পরে যোগাযোগ করবার পরামর্শ দিলেন। পরে বহিঃসম্পদ সচিব জানালেন যে মন্ত্রীর সাথে তাঁর আলাপ হয়েছে, মন্ত্রী মনে করেন বিষয়টি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো উচিত।

১৩ তারিখঃ ক) নিয়োগকারী সংস্থা হতে আর একটি তারবার্তায় জানানো হয় যে উপদেষ্টাকে মাসের ২০ তারিখ কাজে যোগদান করতে হবে। অথচ

www.pathagar.com

তখন পর্যন্ত সিদ্ধান্তের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। সিদ্ধান্ত কে দিবেন বা দিতে পারেন তাও কেউ জানে না।

খ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার নির্দেশমতে নথি মন্ত্রীর দপ্তর হতে ফেরৎ আসে।

১৫ তারিখঃ ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগত গরজে ও উদ্যোগে রচিত চিঠিতে সচিবের সই নিয়ে স্বহস্তে সংস্থাপন সচিবের কাছে পেশ করেন।

খ) সংস্থাপন সচিব রাষ্ট্রপতির সমীপে পেশ করার জন্য সার সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিবকে দেন।

গ) তিনি আবার "বিধি ও শৃঙ্খলা" বিষয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত যুগ্মসচিবকে দিলেন।

১৬ তারিখঃ যুগ্মসচিব (বিধি ও শৃঙ্খলা) তাঁর উপসচিবকে সার সংক্ষেপ দিতে নির্দেশ দেন। উপসচিব আবার সহকারী সচিবকে নথি প্রস্তুত করতে দেন এবং সার সংক্ষেপ সহ নথি পূর্বোক্ত সকল স্তর ঘুরে সংস্থাপন সচিবের কাছে পৌঁছে। সচিব সই করে রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিবের বরাবরে নথি মার্ক করেন। নথিটি হাতে হাতে যথাস্থানে পৌঁছলেও ঐ দিন সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালক দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন না।

১৭ তারিখঃ মহা পরিচালক প্রস্তাব পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিচালককে দেন। যথারীতি পরীক্ষার পর মহাপরিচালকের কাছে নথি ফেরৎ আসে, ব্যস্ততার কারণে ঐ দিন নথিটি তাঁর দেখবার সময় হয়নি।

১৮ তারিখঃ মহাপরিচালকের সুপারিশ সহ নথি মুখ্যসচিবের কাছে পেশ করা হয়। মুখ্যসচিব সম্মতি সই দিয়ে রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিবকে দেন। নথি রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি অনুমতি দিলেন না। বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

মূল্যায়নঃ

বিষয়টির নিষ্পত্তি ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক হলো তা এই মূল্যায়নের বিবেচ্য নয়। মূল্যায়নের লক্ষ্য হলো বাস্তবায়নে প্রচলিত রীতির যৌক্তিকতা এবং সময়ক্ষেপণের কারণ অনুসন্ধান।

ইহা প্রশাসনে কার্যক্রম পরিচালনার একটা স্বাভাবিক রুটিন চিত্র। বিষয়টি কার্যক্রমের গতি সচরাচর প্রচলিত গতির তুলনায় বেশ দ্রুত বলা যায়। বিষয়টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৮টি স্তরে ১৮ জন কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপিত হয়। কারো কাছে একাধিকবার। কোন স্তরেই অযথা সময় ক্ষেপণ হয়নি। তৎপরতার সাথেই বিবেচিত হয়। এই তৎপরতার একমাত্র কারণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ, তদবির, স্বয়ং নথিবহন এবং সচিবালয়ে তাঁর পরিচিতি। অতএব ইহাকে একটা ব্যতিক্রম কেস বলা যায়। তথাপি সময় লেগেছে এক মাস, যা সরকারী কার্যপ্রণালী সময়তালিকায় অতি দ্রুত বলা যেতে পারে। যাহোক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি নথি হাতে হাতে নিয়ে বিভিন্ন ঘাঁটিতে পৌঁছায়ে না দিতেন এবং যদি প্রচলিত রীতিতে নথি আপন গতিতে ভ্রমণ করতো তাহলে আরো অধিক সময় লাগতো অথবা পথে কোথাও হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। ইহাকে একটা নমুনা মনে করে সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নের দিক নির্দেশিকা বা মাপকাঠি মনে করা যেতে পারে। সরকারী কর্মকর্তা নয় অথবা সচিবালয়ে বা দপ্তরে জানাশোনা নেই এমন ব্যক্তি বা জনের স্বার্থজড়িত অগণিত বিষয়বস্তুর নিষ্পত্তি (dispozal) পেতে কত সময় লাগতে পারে ইহা হতে তা সহজেই অনুমেয়। সরকারী দপ্তরে কোন কর্মকাণ্ডের সুরাহা বা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লাগবার অপবাদ সর্বজনবিদিত। ইহাই দীর্ঘসুত্রিতা (red tapism) নামে অভিহিত, যার প্রতি রাষ্ট্রপতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানের ফলাফল

এ অনুসন্ধানের ফলে যে কয়টি প্রতিরোধক (obstructive) কারণ (factor) পাওয়া গেলো তা হলোঃ (১) জটিল বা ঘোরালো কার্যপ্রণালী (circuitous rules of procedures) (২) কোন স্থায়ী আদেশ (standing order) বা বিধান না থাকা অথবা থাকলে দায়িত্ব পালনকারীর সে সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা এবং (৩) সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার সম্বন্ধে ক্ষমতাধারীর মনে অনিশ্চয়তা ও তার ফলে যার ক্ষমতা নেই ক্ষমতা প্রয়োগে তার (উপ-সচিব) প্রভাব আরোপণ। গতিশীল, সহজ ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক কার্যপরিচালনে এই কারণগুলি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে থাকে।

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিধিগত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন পর্যায়ক্রমে সচিব, ক্ষমতা প্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা কিংবা বিভাগীয় প্রধান। আলোচ্য সমীক্ষায় দেখা গেলো সচিব বা যুগ্মসচিব কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন নি, তাঁদের নির্ভর করতে হয় অধস্তন কর্মকর্তার ওপর যার ক্ষমতা প্রয়োগের বিধিবদ্ধ এখতেয়ার থাকার কথা নয়। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তিনিই স্থির করেন এবং উপরওয়ালাকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন কি করা উচিত বা উচিত নয়। ইহার কারণ এই নয় যে একমাত্র তিনিই সঠিক বিধান বা আইন কি তা জানেন। প্রকৃত কারণ হলো তাঁর ওপর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ভরশীলতা, যার ফলেই সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি পাঠাবার স্বপক্ষে কোন প্রচলিত আইনের উল্লেখ না করেই সারমর্ম পেশ করার পরিবর্তে পাল্টা পরামর্শ দেয়ার এখতেয়ার তিনি গ্রহণ করেন। এমন একটা নীতি প্রচলিত থাকলে হয়তো ভাল হতো যার ফলে কোন সচিব বা বিভাগীয় প্রধানের কাছে বিচার্য বিষয় পেশ করা হলে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান তাঁর জানা থাকলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিবেন আর নিম্নস্তন কার্যকারক কর্মকর্তা তা পালন

www.pathagar.com

করবেন। অথবা আইন জানা না থাকলে শর্তসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন যে পরিপন্থী কোন আইন বা আপত্তি না থাকলে আদেশ কার্যকর হোক। অবশ্য এমন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারী সিদ্ধান্তদাতা এবং কার্যকরকারী, উভয় কর্মকর্তার সংশ্লিষ্ট বিধান জানা থাকতে হবে। প্রকৃতক্ষেত্রে দেখা গেলো আলোচ্য বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন কি এবং সিদ্ধান্ত নেয়া কার কর্তৃত্বাধীন তা কারো জানা ছিল না। অতএব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীর কাছেই উপস্থাপিত করা হোক। কোন বিধিবদ্ধ নীতি বা বিধি আছে কি নেই তা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর জানার প্রয়োজন নেই। তিনি লিখিত অলিখিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যে কোন বিষয় তাঁর সমীপে পেশ হলে তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তবে কোন বিষয়বস্তু নিষ্পত্তি সম্পর্কে পূর্বে কোন নীতি নির্ধারিত থাকলে অথবা পূর্বোক্ত ১৮ স্তরে কারো জানা থাকলে বিষয়টি হয়ত রাষ্ট্রপতি বা সরকার প্রধান পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন হতো না এবং তাঁর সময় অপচয় হতো না। অবস্থা মনে হয় এই যে কোন বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারিত না থাকলে বা নীতি কি কারো জানা না থাকলে সরকারপ্রধান ছাড়া ইহার সদগতি করার আর কোন প্রশাসনিক উপায় নেই।

আরও দেখা গেলো অনুমোদন প্রার্থী কর্মকর্তা বিষয়বস্তুর যে সারমর্ম পেশ করেছেন পরবর্তী প্রতিটি স্তরে পৃথক পৃথক সার সংক্ষেপ রচিত হয়েছে একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করে, কারণ ইহাই কার্যপ্রণালী। এমন ভাবে সময়, কালি-কলমকাগজ ও কর্মশক্তির অপচয়কারী কার্যপ্রণালী নীতির আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা ভেবে দেখার দাবী রাখে।

সংস্থাপন সচিব রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য নথি পাঠালেন অথচ আগেরবার একই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এতে বুঝা গেলো কোন নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা বা লিপিবদ্ধ সংজ্ঞা না থাকলে একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন অর্থবহন করতে পারে। একে বলা হয় প্রশাসনে

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত মানসিক বিশেষত্ব (administrative idiocyncracy)। এ ধরনের মানসিক বিশেষত্ব রোধকল্পে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির প্রশাসন যন্ত্র ফরমুলা বা নির্দিষ্ট কাঠামোর মাঝে ঢেলে প্রণালীবদ্ধ (systematised) করা হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত মত আরোপের সুযোগ থাকে না। বিষয় যত জটিলই হোক না কেন, লিপিবদ্ধ ছকে আপন গতিতে গন্তব্যপথে চলে নির্দিষ্ট স্থানে যেয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। যাহোক, বিধিবদ্ধ নীতি না থাকলে কর্মকর্তাদের অপবাদ দেয়া সমীচীন হবে না। অধিকন্তু, যার যার দায়িত্ব ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সম্যক জানা এবং আয়ত্ব করার আগ্রহ ও সুযোগ হয় তখনই যখন কর্মকর্তা নিজপদে পর্যাপ্ত বা পরিমিত সময়কাল বহাল থাকেন। যেমন এককালে নিয়ম ছিল জরুরী কারণ ছাড়া কোন গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ পদে তিন বৎসরের পূর্বে বদলি না করা। এখনকার সময়কালে একই পদে একজনকে বেশীদিন থাকতে বড় দেখা যায় না। কাজেই দায়িত্বকর্মে ও কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের আগ্রহ জাগে না, সুযোগও পাওয়া যায় না। বেশীদিন থাকেন না তাই ঝুঁকিও নিতে চান না। অধিষ্ঠিত পদে কতদিন থাকবেন বা আপন কার্যকালের ন্যূনতম সময়কাল সম্বন্ধেও কোন ধারণা থাকে না। উপরন্তু, এমনও দেখা যায় কর্মকর্তা তাঁর বিধিবদ্ধ দায়িত্ব (statutory responsibility) পালন করার সুযোগ বা স্বাধীনতা সব সময় পান না। সাময়িক ও সুবিধাজনক প্রয়োজনের (expediency) তাগিদে বিশেষমহলের ইচ্ছায় দায়িত্ব পালন করতঃ চাকুরী বা পদে টিকে থেকে সময় পার করে দেয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

উপসংহার

আলোচ্য বিষয়বস্তুটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিস্বার্থজড়িত এবং পরোক্ষভাবে দেশের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিস্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে বটে তবে বাংলাদেশ একটি প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংস্থায় এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভে বঞ্চিত হলো। আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের ন্যায্য স্থান লাভ সম্পর্কে মূল অনুসন্ধিৎসার উত্তরে বলা যায় যে জাতিসংঘ ও উহার ১০-১২ টি অঙ্গ সংস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, কমনওয়েলথ সচিবালয়, ও আই সি প্রভৃতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশীর চাকুরী পাওয়ার অধিকার এবং প্রবেশের পথ খোলা আছে। তা সত্ত্বেও এসকল সংস্থায় বাংলাদেশের হিস্যা ও স্থান অতি নগণ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্য। বিবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) বিশ্বসংস্থা পরিবারে বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠতা (২) সরকারী উদ্যোগ (sponsorship) ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রত্যক্ষ সমর্থনের অভাব (৩) নিয়োগকারী সংস্থার চিঠিপত্রের তাৎক্ষণিক ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর না দেয়া অথবা আদৌ সাড়া না দেয়া (৪) একটি পদের জন্য একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন দান (৫) যোগাযোগ মাধ্যমের অভাবে কোন প্রার্থী কর্তৃক সঠিক তথ্য না জানা (৬) দুই একটি সংস্থায় কোন বাংলাদেশী থাকলেও আপন দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল সহযোগিতা ও সহায়তাদানে অনীহা বা এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পূরণ করা হয় এমন পদের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার হতে প্রাপ্ত মনোনীত প্রার্থীগণকে একত্রে কম্পিউটারের মাধ্যমে বাছাই করা হয়। এই পদ্ধতির আওতায় একটি পদের জন্য নিয়োগকারী সংস্থার পত্রে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়নের কথা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে

www.pathagar.com

কোন সরকার একাধিক নাম যদি পাঠায় তবে সেই মনোনয়নপত্র বাতিলযোগ্য হয়ে থাকে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট সরকার তাদের যোগ্যতম প্রার্থী কে তারা নিজেরাই স্থির করতে পারে না বলে একটা বিরূপ ধারণাও জন্মে থাকে। যাহোক, তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন বিশ্ব সংস্থায় উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ভারত ও শ্রীলংকার অবস্থান ঈর্ষা উদ্রেকভাবে সন্তোষজনক এবং এ সম্পর্কে উভয় সরকার ও উহাদের কর্মকর্তাগণের ভূমিকা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

নিয়োগকারী বিশ্ব সংস্থার চিঠিপত্রের সময়মত সাড়া না দেয়া অথবা কূটনৈতিক আদব কায়দা (protocol) পালন না করার ফলে দেশের ভাবমূর্তি কিভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন একটা উদাহরণ দেয়া প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি। ১৯৮২ সালে নেপাল সরকারের সহযোগিতায় 'আনকটাড/গ্যাট/আইটিসি' কর্তৃক কাঠমুণ্ডুতে আন্তর্জাতিক আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনুন্নত দেশসমূহের সরকারী কর্মকর্তাগণ তাতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকারও একজন উপসচিব সহ চারজন সরকারী প্রতিনিধিকে এই সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য পূর্বাহ্নে মনোনয়ন দান করেন। সপ্তাহব্যাপী সমাবেশের অনুষ্ঠানসূচীতে অংশগ্রহণকারীগণের নির্দিষ্ট ভূমিকা, বিষয়বস্তু, দিন, তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে সমাবেশের পূর্বেই প্রচার করা হয়। এমতাবস্থায় বিনা নোটিশে কেউ অনুপস্থিত থাকলে সম্মেলনের সমগ্র কার্যসূচীতে কি প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। লজ্জার বিষয় হলো বাংলাদেশ হতে কেউই উপস্থিত হননি এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহার কারণ সম্পর্কে সেমিনার কর্তৃপক্ষ কিংবা কাঠমুণ্ডুস্থ বাংলাদেশ মিশনকেও কিছু জানানো হয়নি। অংশগ্রহণকারিগণের অভ্যর্থনা ও আনয়নের জন্য সেমিনারের পক্ষে নেপাল সরকার ও বাংলাদেশ মিশনের লোকজন ও

www.pathagar.com

গাড়ী প্রতিদিন বিমান বন্দরে যেয়ে ফেরত আসতো এবং নেপথ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে অপ্রিয় মন্তব্য শোনা যেতো।

সেমিনার উদ্যোক্তা সংস্থার (আঙটাডের) পক্ষে অন্যতম কর্মকর্তা/বক্তা হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। ঘটনাক্রমে আমার আগমন জেনেভার পরিবর্তে ঢাকা হতে হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা আমি নই কাজেই বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারিগণ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা ছিলনা। যেহেতু আমি ঢাকা হতে আগমন করেছি, আমার কাছেও অনুসন্ধান করা হতো। অজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। সব চাইতে লজ্জাস্কর ব্যাপার ছিল বাংলাদেশ মিশনের জন্য। কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতির হেতু সম্বন্ধে মিশনকেও কিছু জানান হয়নি। যে জন্য তাদিগকে কূটনৈতিক বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঢাকায় ফিরে জানতে পারি সরকারের অনুমতি মিলেনি বলে বাংলাদেশী কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণে ব্যর্থ হন, অথচ তাঁদের চূড়ান্ত নির্বাচন সরকারের মনোনয়ন ও অনুমোদনের ভিত্তিতেই হয়েছিল। সরকারের মত পরিবর্তনের কথাটা সময়মত জানিয়ে দেয়া কূটনৈতিক শিষ্টাচারের আওতায় পড়ে এবং তা পালন করলে এবং বাংলাদেশ মিশনকে জানিয়ে দিলে একটা অস্বস্তিকর ও অসম্মানজনক পরিস্থিতি এড়ানো যেতো। এর ফলে আমাদের প্রশাসন সম্পর্কে কি প্রকার অপ্রিয় ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তা কারোরই উপলব্ধি হয়েছে বলে মনে হয় নি।

পরিশেষে বিশ্ব সংস্থাসমূহে চাকুরীতে প্রবেশ লাভের উপায় (avenues) সম্বন্ধে কিছু আভাস দেয়া প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। উল্লেখযোগ্য পন্থা বিবিধ, যেমন (১) সরকারী প্রণালী (official channel) এর মাধ্যমে নিয়োগকারী সংস্থা সদস্য দেশসমূহের সরকারের কাছে মনোনয়ন চেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের অধিকার ও দায়িত্ব একমাত্র সংশ্লিষ্ট সরকারের এবং এই পন্থায় প্রধানতঃ উচ্চপদ পূরণ করা হয়, যেমন এডিবি,

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাংক, এফএও, ইউনিসেফ, কমনওয়েলথ সচিবালয় প্রভৃতি সহ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার পরিচালকের পদ (২) বেসরকারী তবে স্বীকৃত ও প্রচলিত চ্যানেল, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কোন সেমিনার অনুষ্ঠান বা প্রশিক্ষণে বিভিন্ন দেশের অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কিংবা নিয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ববান ভ্রাম্যমান কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞ প্রকল্প তদারক বা পর্যালোচনাকালে প্রতিভা অন্বেষণ (talent searching) করে থাকেন। বিদেশ হতে আগত তদারককারী বা বিশেষজ্ঞ অতিথি কাজের ফাঁকে স্থানীয় কর্মকর্তার অজান্তে তাঁর কর্তব্যসম্পাদনে দক্ষতা, কৃতিত্ব ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করে একটা জীবনচিত্র (resume) রচনা এঁকে নেন। পরবর্তীতে যথাসময়ে প্রয়োজনবোধে নির্বাচিত কর্মকর্তাকে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। তিনি নিজ সরকার বা নিয়োগকর্তার সম্মতি পেলে, অন্যথায় চলতি কর্মত্যাগ করলে তবেই নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এই পন্থাতেই বেশীরভাগ উচ্চ-মধ্য এবং মধ্যস্তরের পদ পূরণ করা হয়ে থাকে (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বসংস্থায় কর্মরত কোন কর্মকর্তা আপন দেশীয় যোগ্য প্রার্থীকে সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা, নিয়মাবলী ও উদ্যোগ নেয়ার সময় অবহিত করে থাকেন এবং যোগাযোগেও সহায়তা করে থাকেন। সাধারণত মধ্য ও নিম্ন মধ্যস্তরের পদ পূরণের বেলায় এ পন্থা কার্যকর হয়ে থাকে। ভারত ও শ্রীলংকা এ নিয়মের মাধ্যমে যথেষ্ট সুযোগ ভোগ করে আসছে। এ ছাড়া প্রচার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদনপত্র আহবানেরও রীতি প্রচলিত আছে। এ সকল বিজ্ঞপ্তি সচরাচর নিয়োগকারী বিশ্বসংস্থা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত তাদের মিশনের মাধ্যমেই করে থাকে।

প্রমাণিত হয়েছে যে মেধা, দক্ষতা বা যোগ্যতায় বাংলাদেশী অন্য দেশীয় কর্মকর্তার তুলনায় কোন ক্ষেত্রেই নিম্নস্তরের (inferior) নহেন এবং সুনাম অর্জন করেছেন। ফলে বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশীর প্রতি সংবেদনশীল সমর্থন রয়েছে। তবে প্রয়োজন আছে ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ে সরকারী উদ্যোগ ও

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা, নীতিগতভাবে দুতাবাস ও কূটনৈতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রত্যাশা অবহিত করণ ও ওয়াকিবহাল থেকে অনুসরণ করণ। দেশে অভিজ্ঞতার ও বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন আছে বটে তবে কারো কর্মক্ষমতা অপরিহার্য নয়, দক্ষ কর্মপ্রার্থীরও অভাব নেই। একজন কর্মকর্তা কোন আন্তর্জাতিক পদ লাভের সুযোগ পেলে দেশ দূভাবে উপকৃত হতে পারেঃ দেশ একটি বিশ্বসংস্থায় আপন অধিষ্ঠান লাভ করলো এবং শূন্যপদে অন্যজনে পূরণ করায় বেকারের সংখ্যা হ্রাস পেলো। এই দর্শনের আলোকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশী কর্মকর্তাকে কোন বিশ্বসংস্থায় চাকুরীলাভে সুযোগ সৃষ্টি ও উৎসাহিত করাটাই সরকারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করি।

www.pathagar.com

"বৃটিশ-পাকিস্তান-বাংলাদেশ আমলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক বাস্তবায়নধারা" নামক গবেষণাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হতে উধৃত একটি নমুনাচিত্র

(খ)

সময়ের আবর্তনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিষয় নিয়ে আমার গবেষণা কার্যক্রমটি এখন সমাপ্তি পর্যায়ে। প্রচলিত কার্যপদ্ধতি ও সংগৃহিত তথ্যভিত্তিক এবং গবেষণাগ্রন্থে সঙ্কলিত কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক বাস্তব নমুনা (case study) সংশ্লিষ্ট মহলের অবগতির উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে প্রকাশ করে থাকি। ইহা তারই অপ্রকাশিত একটিঃ

প্রসঙ্গঃ ভূমি জরিপ ও রেকর্ডঃ খতিয়ানে (record of rights) পরলোকগত স্বত্বাধিকারীর পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের নাম রেকর্ড না থাকায় মুসলিম ফরায়েজ বিধিমতে কন্যার উত্তরাধিকারিত্ব প্রশ্ন।

২৪-১২-৯৬ঃ জেলা ভূমি ও রাজস্ব শাখায় একটি শালিস পর্যায়ে উদ্ভূত বিতর্ক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জোনাল সেটেলমেন্ট কর্মকর্তা এবং ভূমি জরিপ ও রেকর্ড মহাপরিচালকের সমীপে অভিমত/দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়।

www.pathagar.com

অনুলিপি

মহাপরিচালক

ভূমি জরিপ ও রেকর্ড

বাংলাদেশ সরকার

সার্ভে ভবন

তেজগাঁও শিল্প এলাকা

ঢাকা।

মহোদয়,

নোয়াখালী অঞ্চলে বৃটিশ আমলে (১৯১৭) অনুষ্ঠিত সি এস জরিপ খতিয়ানে পরলোকগত স্বত্ত্বাধিকারীর উত্তরাধিকারী স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানের নামের সাথে কন্যা সন্তানের নাম মুদ্রিত নাই (সংযুক্ত নমুনা সি এস খতিয়ান ২৪৬ দ্রষ্টব্য)। অন্য কোন অঞ্চলের পরিস্থিতি জানা নাই। তবে ১৯৬০ সনের এম আর আর এবং চলমান আর এস জরিপে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকারীত্ব রেকর্ড করা হইয়াছে। সি এস খতিয়ানে নাম উল্লেখ না থাকার অজুহাতে কখনও কখনও মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানকে পিতার পরিত্যক্ত ভূ সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিবার নজিরও প্রচলিত দেখা যায়। অতি সম্প্রতি এই প্রশ্নে একটি জটিল বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত সি এস খতিয়ান ২৪৬ সহ আরো ৫টি সি এস খতিয়ানে কন্যা সন্তানের নাম না থাকা সত্বেও খতিয়ানভুক্ত স্বত্ত্বাধিকারীর পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে তাহার পরিত্যক্ত ভূ সম্পত্তি মুসলিম উত্তরাধিকার আইন (ফরায়েজ) বিধান ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে আপস বন্টন হয় এবং বন্টন কার্যকর করিয়া অধিকার গ্রহণ, নির্বিঘ্নে ভোগদখল, এমনকি খরিদ বিক্রি

www.pathagar.com

হস্তান্তরও হইয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি একটি প্রশাসনিক শালিস (Adjudication) বৈঠকে একজন আইনজীবী "সি এস খতিয়ানে নাম নাই সুতরাং কন্যা সন্তান পিতার পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না" বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন এবং দায়িত্বরত এ ডি সি (রাজস্ব) সেই অভিমতের সমর্থনে ৩৫ বৎসর পূর্বে মুসলিম উত্তরাধিকারী আইনের ভিত্তিতে আপস বন্টনে প্রতিষ্ঠিত কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার ও স্বত্বাধিকার বাতিল এবং কন্যা সন্তানকে বাদ দিয়া পুত্র সন্তানের উত্তরাধিকারীর মধ্যে পুনর্বন্টনের উদ্যোগ নেন। ফলে উল্লিখিত বিতর্কিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার মারাত্মক পরিণতি সহজেই অনুমেয়।

সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর অভিমত আইনসিদ্ধ কি না এবং উহার সমর্থনে এ ডি সি (রাজস্ব) এর পুনর্বন্টন উদ্যোগ বৈধ কি না তা নির্ধারণ সাপেক্ষে বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। একমাত্র দেওয়ানী আদালতের বিচারেই উদ্ভূত প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইতে পারে। তবে যেহেতু প্রশ্নটির সূত্র সি এস জরিপ রেকর্ড, ইতোমধ্যে জরিপ বিভাগের মন্তব্য বা অভিমত আদালতের বাইরে এবং নির্বাহী পর্যায়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে পারে মনে করিয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

সি এস খতিয়ানে পুত্র সন্তান ও স্ত্রীর সাথে কন্যা সন্তানের নাম রেকর্ড নাই কেন এবং না থাকায় কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকারিত্ব অস্বীকৃত বা স্বীকৃত হয় কি না ও আইনজীবীর অভিমত আইনসিদ্ধ কি না প্রশ্নে জরিপ বিভাগের সুস্পষ্ট অভিমত বা মন্তব্য ব্যক্ত করিয়া উদ্ভূত জটিলতা নিরসনে সাহায্য করিতে সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি। ইহার ফলে হয়ত আইনের বিচারের উদ্দেশ্যে আদালতের সম্ভাব্য আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

বিনীত নিবেদক

স্বাক্ষর

৯/২/৯৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কোন সাড়া না পেয়ে নিম্ন মর্মে মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়ঃ

www.pathagar.com

অনুলিপি

জনাব ডি জি সাহেব

আচ্ছালামু আলাইকুম।

একজন অপরিচিত ব্যক্তির এই ব্যক্তিগত পত্রের জন্য বিনীত ক্ষমা ভিক্ষা চাই। বার্ধক্য এবং হৃদপীড়াজনিত কারণে স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থী হইতে অপারগ বিধায় এই ধৃষ্টতা। ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নই বলিয়া টেলিফোনে তথ্য জানিতে চাওয়া সৌজন্যশীলতা নয় বলিয়া মনে করি।

প্রায় দেড়মাস পূর্বে অত্র সঙ্গে সংযোজিত পত্রখানা আপনার সমীপে নিবেদন করিয়াছিলাম। সি এস/ ডি এস খতিয়ানে কন্যা সন্তানের নাম কেন নাই এবং তার ফলে কন্যা সন্তান পরলোকগত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না বলিয়া আইনজীবীর অভিমত সঠিক কি না জানিতে চাহিয়াছিলাম। সরকারী অভিমত প্রদান করিতে আপনি বিধিমতে (constitutionally) বাধ্য কি না আমার জানা নাই। তবে যে কোন নাগরিকের সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সংশ্লিষ্ট তথ্য /পরামর্শ/উপদেশ বা প্রতিকার চাওয়ার অধিকার আছে বিশ্বাস রাখিয়াই এই নিবেদন করিয়াছিলাম।

ভূমি জরিপ কার্যে উত্তরাধিকার প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয়। কোন ভূমির মালিকের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশানগণের নাম ভূমি রেকর্ড করার বিধান রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তির ধর্মীয় আইনের বিধান মতে (ফরায়েজ) ওয়ারিশদের অংশ স্বত্ত্বলিপিতে

www.pathagar.com

(খতিয়ানে) রেকর্ড হওয়ার কথা। তাই বিষয়টি আইনগত গুরুত্ব বহন করে এবং জরিপ কর্তৃপক্ষই এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত ব্যক্ত করিতে যোগ্য কর্তৃপক্ষ বলিয়া আপনি স্বীকার করেন আশা করি।

পুনরায় সশ্রদ্ধ ক্ষমা চাহিয়া আমার উপস্থাপিত প্রশ্নে জরিপ বিভাগের একটা অভিমত জানাইলে কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকিব।

স্বাক্ষর

বিনীত প্রার্থী

৪.৪.৯৬ স্মারক নং ৬০/৯৩ ভূঃ রেঃ (গোঃ) -২ তাং ৪/৪/৯৬ ইং ভূমি রেকর্ড পরিচালকের আশাপ্রদ প্রতিক্রিয়া।

www.pathagar.com

অনুলিপি

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে লিখা আপনার পত্র ও সংযুক্তি যথাসময়ে তাঁর হস্তগত হয়েছে। আপনার বক্তব্যের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিস কক্ষে যে কোন দিন (অফিস চলাকালীন) ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সাক্ষাতের পূর্বে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে ভাল হয়।

ধন্যবাদান্তে

স্বাক্ষর

পরিচালক (ভূমি রেকর্ড)

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

৯/৪/৯৬ উক্ত নির্দেশমতে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ২০/৪/৯৬ সাক্ষাতের তারিখ নির্ধারিত হয়।

২০/৪/৯৬ সাক্ষাৎ, সৌজন্য, কুশলবার্তা, সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা, দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (O/c CRR), অফিসে উপস্থিত না থাকায় পর্যালোচনা স্থগিত।

২৫/৫/৯৬ ফোনে যোগাযোগের পুনরাবৃত্তি ।

www.pathagar.com

২৯/৬/৯৬ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, নীতিগত মতৈক্য এবং যথাশীঘ্র দস্তুরমাফিক লিখিত অভিমত জানাবার আশ্বাস প্রদান।

দু'মাস সময় গড়ায়ে যায়, আশ্বাস প্রদত্ত লিখিত অভিমত পাওয়া যায় না।

৯/৯/৯৬ তাই একটি স্মারক নোট DLR সমীপে পাঠান হয়।

১৯/১০/৯৬ ফোনে যোগাযোগ ও কথা হয় এবং আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করা হয়।

১০/১২/৯৬ ফোনে যোগাযোগ করে জানা গেল ডি এল আর সাহেব বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন, তাঁর উত্তরসূরী (successor) মিটিং এ রয়েছেন।

একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। নিবেদন, যোগাযোগ, আলাপ/আলোচনা এবং একাধিকবার আশ্বাসের পরেও উত্থাপিত বিষয়ের ওপর কোন মতামত পাওয়া গেল না, নিষ্পত্তিও হলো না। সদ্য আগত ডি-এল-আর এর সাথে de-novo প্রচেষ্টায় উৎসাহ থাকলো না, বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেল।

মূল্যায়নঃ বিষয়টি উত্থাপনকারী একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ডি এল আর এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন বিধায় সৌজন্যসূচক আচরণ এবং টেলিফোনে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি কৃতজ্ঞ। তা সত্ত্বেও আলোচ্য বিষয়টি যে বিধিবদ্ধ এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যারূপে বিবেচিত হতে পারে তা উপলব্ধি পরিলক্ষিত হয়নি। মামুলী রুটিন কর্মসূচীরূপেই বিবেচিত হয়েছে। সুতরাং যার বিচার অধিকার

www.pathagar.com

নাই (has no discretionary authority) তারই মর্জির ওপর ন্যস্ত হয়েছে। ইহাই প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচলিত রীতি না নীতি। যিনি বিধিবদ্ধ কর্তৃত্বের অধিকারী, তিনি কর্তব্য করেন না, করেন যাঁর কর্তৃত্বের অধিকার নাই সেই সহায়তাকারীজন, তাঁর সময় সুযোগ এবং মর্জি মোতাবেক (descretion)। ঊর্ধতন কর্তার অধঃস্তনের ওপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ অধঃস্তনের সহায়তা ছাড়া ঊর্ধতনের অসহায়তা বা নিষ্ক্রিয়তা প্রশাসন বাস্তবায়নে প্রচলিত অন্যতম গুরুতর দুর্বলতা।

স্বত্বলিপিতে (খতিয়ানে) কন্যা সন্তানের নাম না থাকার হেতু এবং সেহেতু উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠলে তার ব্যাখ্যা প্রদানে প্রাথমিক কর্তৃপক্ষরূপে জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তরে গড়িমসি কেন জানবার অধিকার না থাকলেও একটা মতামত পাওয়া গেলে জেলা ভূমি/রাজস্ব শাখা পর্যায়ে বিতর্কিত প্রশ্নটি আপস নিষ্পত্তি হতে পারতো এবং উচ্চ আদালতে মামলা মোকদ্দমা এড়ানো যেতো। সে পরিস্থিতিতে মামলা হলে অধিদপ্তরকে পক্ষ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়ে গেল।

www.pathagar.com

১২.৬২ জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ আন্দোলন

জনসংখ্যা সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম একটি জাতীয় জনকল্যাণমূলক আন্দোলন। এ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তায় দ্বিমত নেই এবং কারো আপত্তি থাকারও কারণ নেই। লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে সময় সময় অনেক মতামত ব্যক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সার্বজনীন সমর্থন এবং আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। শহরে বসে এবং সংখ্যার যোগফল দেখিয়ে যাই বলা হোক না কেন পল্লী অঞ্চলে এ আন্দোলনের প্রভাব তেমন প্রতিফলিত হয়নি। বরঞ্চ, উদাসীনতা, উপেক্ষা এমনকি বিরোধিতাও বিরাজমান। এর অন্যতম কারণ কোন কোন নীতি বা পদ্ধতি, যা কখনো কার্যক্রম পর্যালোচনায়, বক্তৃতায় বা ব্যবস্থা গ্রহণকালে বিবেচনায় স্থান পেতে শোনা যায়নি। জনসংখ্যা সীমিত রাখা একটা আদর্শবাদও বটে। উদ্দেশ্য, পরিকল্পিতভাবে ছোট পরিবার গড়ে তোলা এবং মাতা ও নবজাত মানব সন্তানের স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি তথা সার্থক জীবন ধারণের উপযোগী করে তোলা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে 'মাখলুকাত' বা জীবজন্তু মানব সৃষ্টি বিধানে এবং সৃষ্টিকর্তার মানব সৃষ্টি 'হেকমতে' মানবজন্ম স্বাভাবিক। সৃষ্টিকে রক্ষা ও চলমান রাখার প্রয়োজনেই মানবজন্ম অবধারিত। সুতরাং জনসংখ্যা আদতে একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে দারিদ্র্য, ভূমির স্বল্পতা, খাদ্য ঘাটতি, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, অকাল শিশুমৃত্যু ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা আমাদের দেশে সমস্যা হয়ে পড়েছে। এ কারণেই জনসংখ্যা সীমিত রাখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয়। সন্তান জন্মদান করার নৈতিক অধিকার একমাত্র বিবাহিত দম্পতির। স্বভাবতঃই জনসংখ্যা সীমিত রাখা কার্যক্রমের লক্ষ্যও (target) হলো একমাত্র বিবাহিত সক্ষম দম্পতি এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম ও পদ্ধতি বিবাহিত জনসমাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা বাধ্যতামূলক হওয়া চাই। প্রজনন ক্ষমতারহিত বয়োবৃদ্ধ অথবা অবিবাহিত যুব ও তরুণ সমাজ এর

www.pathagar.com

আওতার বাইরে থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে কার্যক্রমের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়েছে বিবাহিত, অবিবাহিত, বৃদ্ধ, যুবা নির্বিশেষে সমগ্র সমাজ এবং কোন কোন কার্যপদ্ধতির আওতায় সমগ্র অবিবাহিত যুব ও তরুণ সমাজ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এ ভ্রান্ত ও নীতিবিরুদ্ধ (immoral) পদ্ধতিই আপত্তি ও বিরোধিতা সৃষ্টি করেছে। বাস্তবায়নরত মাঠ কর্মী কর্মকর্তাগণ হয় উচ্চস্তরে এ পরিস্থিতি জ্ঞাপন করেন নি অথবা করে থাকলেও উপেক্ষিত হয়ে আসছে। ফলে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার পরিবর্তে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। উল্লিখিত নিন্দিত ও অকেজো (useless) পদ্ধতি হচ্ছে জন্মনিরোধক উপকরণ এবং ঔষধ সহজে প্রাপ্তির ব্যবস্থা ও অবাধ বিতরণ, ব্যবহার প্রণালী প্রচার, যা কার্যকরী ও রুচিসম্মত পন্থা নয়।

কার্যক্রমের আর একটি ত্রুটি হচ্ছে উপকরণ বিতরণের তুলনায় কার্যক্রমে জ্ঞানদানের অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। ইহা সর্বজনবিদিত যে শিক্ষিত পরিবারে জন্মহার অশিক্ষিত দম্পতি ও অজ্ঞ পরিবারের তুলনায় অনেক কম। কারণ, পরিমিত সংখ্যক সন্তান থাকার সুফল আর অধিক সংখ্যক সন্তানের অশুভ ও ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে শিক্ষিত দম্পতি সজাগ, যা একটি অশিক্ষিত দম্পতি অবহিত নয়। বরঞ্চ দারিদ্র্যের কারণে সে দম্পতি একাধিক পুত্র সন্তানকে পরিবারের অধিক উপার্জনের উৎস মনে করে। তাহলে বলা যায় যে, সমাজে শিক্ষা প্রসার এবং শিক্ষা প্রচারই জনসংখ্যা সীমিত রাখা কার্যক্রমের মুখ্য ও প্রথম পদ্ধতি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা বলতে শুধু বিদ্যালয়ে অর্জিত পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, উহার সাথে ছোট পরিবারের সার্বিক মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞানদান ও সেই সঙ্গে পরিকল্পিত ছোট পরিবার গঠনের পদ্ধতি অবলম্বনে কার্যকরী শিক্ষাদান কার্যক্রমে জোর দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিত দম্পতির কাছে প্রচারের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন রয়েছে শহরের বস্তিতে, পল্লী গ্রামে অশিক্ষিত দরিদ্র বিবাহিত জন গোষ্ঠীর কাছে, রেডিও টেলিভিশনের

www.pathagar.com

সুযোগ সুবিধা যাদের নাগালের বাইরে এবং প্রচার বিজ্ঞপ্তি যাদের বোধগম্য নয়।

জন্মনিরোধক উপকরণ বিতরণ/বিক্রয়ের পরিমাণকে কার্যক্রম সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়ে থাকে। যতবেশী উপকরণ বিক্রয় হলো অর্থাৎ যত বেশী পরিমাণ উপকরণ সমাজে ছড়িয়ে পড়লো ততবেশী দম্পতি পদ্ধতি গ্রহণ করছে বলে হিসেব করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে কি পরিমাণ সক্ষম দম্পতি গ্রহণ করলো, কি পরিমাণ অবিবাহিত জনগণের কবলে গেলো এবং কত পরিমাণ খেলনার বেলুনরূপে অপচয় হলো তা ভেবে দেখা হয় না। শহর ও নগর তো বটেই পল্লীগ্রামেও প্রতিটি মুদি মনোহারী ও চায়ের দোকানে জন্ম নিরোধক উপকরণ ও সামগ্রী পাওয়া যায়। অজ্ঞ সক্ষম পিতা বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কনডমকে খেলনার বেলুন মনে করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কিনে দিতে দেখেছি। অজ্ঞতার কারণে তিনি জানেন না ওটা তাঁরই জন্য একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং শিশুর খেলনা নয়। এমন এক সময়কাল ছিল যখন বিয়ে ছাড়া যৌনমিলনে গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে একটা আতংক ছিল যা স্বাভাবিকভাবে যুবসমাজকে নৈতিক পদস্খলন হতে বিরত রাখতো। বিবাহের মাধ্যম ছাড়া নারী পুরুষে যৌনমিলন ইসলামিক সংজ্ঞায় জ্বেনা বা ব্যভিচার। কোরআনের অনুশাসনে ব্যভিচার 'কবীরা গোনা' বা মহাপাপ আর সামাজিক বিধান ও আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। কোরআনের অনুশাসন বিশ্বাসীদের পালনীয় কিন্তু সামাজিক বিধান সবাইর বেলায় প্রযোজ্য। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় উপকরণের সহজে প্রাপ্তি ও অবাধ বিতরণের ফলে সামাজিক ও আইনের চোখে অপরাধ ধরা পড়ে শাস্তির ভয়ের কারণ উবে গিয়েছে। আর ধর্মভয় তো ইতোমধ্যে ধর্মহীন শিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তি প্রসারের প্রভাবে বিলুপ্ত হতে চলেছে। পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের নিরিখে বিচার করলে অনুধাবন করা যাবে যে, যে পরিমাণ উপকরণ অবিবাহিতদের

www.pathagar.com

কবলে এবং খেলনারূপে বিতরিত হয়েছে তা একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে অপচয় হলো অন্যদিকে যুবসমাজকে অবৈধ যৌন পাপে লিপ্ত হতে সহায়তা ও উৎসাহিত করলো। একবার ভেবে দেখুন সমাজের মঙ্গল করতে গিয়ে ভাবী জনসমাজকে কিভাবে নৈতিক অধঃপাতে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলের বীজ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা করা হচ্ছে সরকারী ছত্রছায়ায়।

এ পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে কার্যক্রম জনপ্রিয় হচ্ছে না ও জনসমর্থন লাভ করছে না এবং অভীষ্ট সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের জন্য এ কার্যক্রম তারা সুফল পাচ্ছে না। অর্থ ও উপকরণ বেশিরভাগই অপচয় হচ্ছে। এ প্রকল্পের মুখ্য অংশগ্রহণকারী তিন পক্ষ সরকার, বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো এবং বিদেশী উপকরণ প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কিছুকাল পূর্বে RU-486 নামক গর্ভপাতের এক বটিকা আমদানি ও বিতরণকল্পে মাতৃগর্ভে ভ্রূণহত্যাকারী আর এক দল আবির্ভূত হয়েছিল বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকরণ প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী তৃতীয় পক্ষই একমাত্র লাভবান হচ্ছে। অপর দুই পক্ষ–সরকার এবং সাহায্যদাতা সংস্থার-প্রাপ্তি বেশিরভাগই ব্যর্থতা ও অপচয়, আর দেশের জন্য জুটছে উঠতি বংশধরদের নৈতিক অধঃপতন, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ রয়ে যাচ্ছে সুদূর পরাহত। ভ্রূণ হত্যাকারক ওষুধ আমদানির বিরুদ্ধে নারী সমাজের প্রতিবাদের ফলে মূল প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর আরো প্রতিকূল প্রভাব পড়তে বাধ্য। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রতি গণঅনীহা বা বিরূপ মনোভাবের উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হচ্ছেঃ

১. গর্ভনিরোধক উপকরণের নির্বিচার ও অবাধ বিতরণ।

২. অবাধ বিতরণের বিরুদ্ধে (কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নয়) আলেম সমাজের একাংশের প্রচার (মাওলানা সাঈদীর জোরালো বক্তৃতার ক্যাসেট গ্রামে গঞ্জে যত্রতত্র বাজানো ও তৎপ্রতি জনপ্রিয়তা)।

www.pathagar.com

৩. কোন কোন উপকরণের খেলনারূপে ব্যবহার করার ফলে অপচয়হেতু জনমনে ঘৃণা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি।

৪. অবিবাহিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও কর্মী নিয়োগ।

৫. উপকরণ ব্যবহার বিধি, উপকারিতা রেডিওর মাধ্যমে নিঃসঙ্কোচে ও খোলাখুলি প্রচারের দরুণ প্রৌঢ় ও বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক এবং তরুণ শ্রোতা সমাজের মাঝে বিব্রতকর পরিবেশ ও ঘৃণা সৃষ্টি, ফলে রেডিও প্রোগ্রাম পরিহার।

নামমাত্র মূল্যে অবাধে উপকরণগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে যত্রতত্র পাওয়া যায়। ক্রেতার শ্রেণীবিচার নেই। বিক্রি/বিতরণের ওপর কোন নীতি বিধিনিষেধ নেই। কখনও বলা হয় না অবিবাহিতের জন্য এটা নিষিদ্ধ। জেনে শুনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যাদের জন্য ইহা মারাত্মক বিষতুল্য, তারাই ব্যবহার করছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সচেতন জনসমাজের একটা বিরাট অংশ কেবলমাত্র উপকরণ নির্বিচার বিতরণ ও অশালীন প্রচারণার কারণেই এমনটি জাতীয় কল্যাণকর কার্যক্রমের প্রতি বিরূপ মত পোষণ করে থাকেন। জাতীয় পর্যায়ে যাঁরা প্রকল্পের নীতি নির্ধারণ করেন এবং যাঁরা বাস্তবায়ন করেন তাঁরা হয় জনগণের মনের খবর রাখেন না বা জানেন না অথবা জানলেও উটপাখীর মত উপেক্ষা করে আত্মশ্লাঘাবোধ ও আত্মতৃপ্তি ভোগ করেন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের পর প্রকল্প চালু করা হয়, লাখ লাখ টাকা ব্যয়ের অংক ও লক্ষ্যবস্তুর হিসাব করে সমাপ্তি প্রতিবেদন রচনা করা হয়, সফলতা ঘোষণা করা হয়। আসলে ২/১ টি ব্যতিক্রম ছাড়া যাদের জন্য কর্মসূচী নেয়া হয় উহা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো কি না, তাদের মতামত কি এবং তারা কতটুকু উপকৃত হলো সরেজমিনে তার কোন যাচাই (end use evaluation)করা হয় না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের একটা

www.pathagar.com

গণসমীক্ষা বা জনমত যাচাই পরিচালনা করলেই আমার বক্তব্যের সারবত্তা আবিস্কৃত হবে।

মানবজন্ম নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কারো নেই, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া। ইহা তাঁরই বিশেষ একচ্ছত্র অধিকার। (prerogative) এবং তাঁরই বিবেচনার আয়ত্তাধীন (exclusive descretion) । তিনি যে কোন দম্পতিকে সন্তান দান করতে পারেন, যে কোন প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন দম্পতিকে সন্তান জন্ম দানে বঞ্চিত করতে পারেন, আবার প্রজনন সামর্থের বয়স অতিক্রম করার পরেও কাউকে সন্তান দান করে মানুষের জ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার ওপর তাঁর কর্তৃত্বের প্রমাণ দেখাতে পারেন। অতএব "জন্ম নিয়ন্ত্রণ" করার অনধিকার ধারণা ও প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা হোক, উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অবাধ বিতরণ পদ্ধতি/কার্যক্রম পরিহার করে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে সকল পদ্ধতি, প্রক্রিয়া কেবলমাত্র বিবাহিত দম্পতির মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে কেবলমাত্র বিবাহিত কর্মকর্তা ও কর্মী দ্বারাই শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালিত হোক। ইসলামে পরিকল্পিত এবং বৈধ উপায়ে সন্তান জন্মদান সীমিত রাখার ব্যবস্থা আছে এবং তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যেমন "আজল" বা স্তম্ভন, নিরাপদ সময়কাল (safe period) বিধি পালন ইত্যাদি। ডিএনসি, বন্ধ্যাকরণ, গর্ভপাত প্রভৃতি নরহত্যাকারক ও সৃষ্টিদ্রোহী পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন অভীষ্ট লক্ষ্যে আন্তরিক বিশ্বাস, গৃহীত পন্থায় নিষ্ঠা এবং কার্যকরণে সততা। সেই লক্ষ্য অর্জনে চলমান পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ কার্যক্রম অক্ষুণ্ন রেখে উহার বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঢেলে সাজানো হোক। সুচিন্তিত বিবেচনার জন্য কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপিত করা হলো।

(১) পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানদানকে প্রাধান্য (priority) দিয়ে কার্যক্রমকে পরিবর্ধনকরণ, অনুদানে প্রাপ্ত অর্থের বেশির ভাগ ব্যবহারিক শিক্ষা কর্মে খাটানো, সম্ভব হলে প্রতি ইউনিয়নে কিংবা একাধিক ইউনিয়ন

www.pathagar.com

সমন্বয়ে কার্যক্ষেত্র ইউনিট করে বিবাহিত দম্পতিকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োগকরণ।

(২) গর্ভনিরোধক যাবতীয় উপকরণ ও ঔষধ বিষ সদৃশ জ্ঞানে দেশব্যাপী উহার অবাধ নির্বিচার বিতরণ, বিক্রয় ও ব্যবহার প্রচার নিষিদ্ধ ও বন্ধকরণ, উহার আমদানী, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিতরণ অনুমোদিত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্তকরণ এবং বাণিজ্যিক আমদানী ও সরবরাহ নিষিদ্ধকরণ। ফলে ঔষধ ও উপকরণের প্রকৃত প্রয়োজনের পরিমাণ জানা যাবে, যত জন সক্ষম দম্পতি সামগ্রী গ্রহণ ও ব্যবহার করবে আমদানি ও সরবরাহ পরিমাণ ও বিতরণের পরিমাণ তার উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ প্রয়োজনের বাস্তব পরিমাণ জানা যাবে। ফলে বর্তমানের তুলনায় প্রয়োজনের পরিমাণ কমে যাবে। পরিমিত পরিমাণ উপকরণ আমদানির ফলে এ খাতে বৈদশিক সাহায্যের যে অর্থ সাশ্রয় হবে তা শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান কার্যক্রম প্রসারে লাগানো যাবে।

১নং প্রস্তাবনার ভিত্তিতে নিয়োজিত বিবাহিত কর্মীগণের কর্মসফলতার ওপর নির্ভর করবে পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী দম্পতির সংখ্যা বৃদ্ধি ও সামগ্রীর ব্যবহার ও পরিমাণ বৃদ্ধি।

ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত বা নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা, নারী কল্যাণ বা পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপকরণ ও সামগ্রী ঔষধ সংরক্ষিত থাকবে এবং কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার জিম্মাদার (custodian) থাকবেন। কেবলমাত্র বিবাহিত মাঠকর্মীগণ প্রয়োজনীয় পরিমাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজ নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট দম্পতির কাছে হস্তান্তর করবেন। উপকরণ প্রাপ্তির অপর সকল উৎস বা পন্থা অবৈধকরণ ও নিষিদ্ধ করণ, যাতে অবিবাহিতরা তার নাগাল না পায়। যে সকল সাহায্যদাতা সংস্থার অর্থানুকুল্যে এবং যে সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (তৃতীয় পক্ষ) ঐ সকল উপকরণ অতিরিক্ত পরিমাণে আমদানী, সরবরাহ ও বিতরণ করে থাকে এ প্রস্তাবনা তাদের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে। বোধগম্য হলেও মনঃপূত না হতে পারে। কারণ,

www.pathagar.com

আমদানী/সরবরাহকারী তৃতীয়পক্ষই এ ব্যাপারে প্রকৃত উপকারভোগী (beneficiary)। তবে আমরা যদি জাতীয় কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজেরা যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করি এবং কার্যকর করতে দৃঢ় সংকল্প হই তাদেরকে অনুধাবন করাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

(৩) একই সাথে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী কর্মী নিয়োগ বন্ধ ও নিষিদ্ধকরণ এবং বর্তমানে কর্মে নিয়োজিত অবিবাহিতদের বিবাহে উৎসাহিত ও সহায়তাকরণ, অন্যথায় অন্য কার্যক্রমে স্থানান্তরিত করণ। প্রস্তাবটি অভিনব বা অবাস্তব মনে হতে পারে। তবু নৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে এটা বাস্তব বিবেচিত হবে।

(৪) স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া বন্ধ্যাকরণ, ডিএনসি বা গর্ভপাত নিষিদ্ধকরণ। একই সঙ্গে "প্রতিরোধ নেটওয়ার্ক" নামক নারীকর্মী সংস্থা কর্তৃক আপত্তিকর RU-486 নামক গর্ভপাতক ঔষধও প্রবর্তন এবং আমদানী নিষিদ্ধ করা চাই।

উপসংহারঃ মানব কল্যাণ স্বার্থে প্রচলিত ধারণার বিপরীতে প্রস্তাবিত কোন অভিনব কর্মপন্থাও যে বাস্তবে কার্যকর হতে পারে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনা এবং অপর দুটি প্রশাসনিক অভিনব ও প্রশংসনীয় কার্যক্রমের উল্লেখ করে আলোচনার সমাপ্তি টানছি।

ক) বৃটিশ আমলে মরহুম একে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আবদুল করীমের সমীপে কয়জন অভিভাবক উপস্থিত হয়ে অভিযোগ জানালেন যে (কলকাতার) সাখাওয়াত মেমোরিয়েল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন অবিবাহিতা মুসলিম শিক্ষিকা তাঁদের বয়স্কা কন্যা ছাত্রীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশা করার সুযোগ করে দিয়ে তাদের বিপথগামীনী করছে। মন্ত্রী বাহাদুর তাঁর দপ্তরের কাছে শিক্ষিকাত্রয়ের নাম চেয়ে পাঠালেন। নাম সরবরাহ করা হলো। নোটশীটে

www.pathagar.com

নামের নিচে মন্ত্রী সাহেব লিখিত নির্দেশ দিলেন মহিলারা যেন তিন মাসের মধ্যে বিবাহ করেন অন্যথায় যেন চাকুরী ছেড়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এ অভূতপূর্ব নির্দেশে সচিবালয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হলো। সরকারী চাকুরী বিধানে অমন বাধ্যবাধকতা আরোপের অবকাশ বা অধিকার নেই। কিন্তু মন্ত্রী অটল। নির্দেশ জারি হলো। অবাস্তব নির্দেশে বাস্তব ফল পাওয়া গেলোঃ দুজন বিবাহ করলেন, অপরজন চাকুরী ছেড়ে চলে গেলেন। নির্দেশের পেছনে ছিল মন্ত্রীর নৈতিক মনোবল এবং কার্যকারণের যৌক্তিকতা।

খ) আর্থিক ও সামাজিক কারণে নারী শিক্ষার্থীগণের বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ এবং বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিত করতঃ পরিণত বয়সে বিবাহে উদ্বুদ্ধকরণকল্পে আর্থিক বৃত্তিদান করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় স্বাবলম্বী করে তোলা ও পরবর্তীকালে যারা বিবাহ করেন তাদের সন্তানধারণে আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলার কার্যক্রম। ইউ এস এইড এবং এশিয়া ফাউণ্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এশিয়া ফাউণ্ডেশন এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে বলে জানতাম (১৯৮৬)।

গ) ইউ, এস, এইড-এর পপুলেশন এণ্ড হেলথ বিভাগের প্রধান, ম্যাডাম শেরণ ইপসটীনের সাথে আলোচনাকালে আমি জানতে পেরেছিলাম যে তাঁরা মহিলা কর্মীর মাধ্যমে কেবলমাত্র আগ্রহী দম্পতির হাতে সরাসরি জন্মনিরোধক উপকরণ বিতরণ করার চিন্তাভাবনা করছিলেন। এটাও কয়েক বছর আগের কথা। ঐ চিন্তাভাবনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল কি না তা জানবার আর সুযোগ হয়নি। তবে আলোচনা হতে বুঝতে পেরেছিলাম চলমান বাণিজ্যিক প্রথায় উপকরণের অবাধ বিতরণে অভীষ্ট ফল অর্জিত হচ্ছিল না বলে দাতা কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি জন্মেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

লক্ষীপুর জেলা সদর থানা হাসন্দী কাজী বাড়ীতে ১৯১৯ সালে ১লা এপ্রিল। পিতৃ ও মাতৃবংশ প্রাচীনপন্থী আলেম ও ধর্মীয় পরিবার। পিতা মরহুম কাজী মোহাম্মদ মুসলিম ছিলেন একাধারে আলেম, ধর্মীয় শিক্ষক এবং সুফী সাধক ব্যক্তি। বাল্যকালের শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয় শুদ্ধাচার ও নীতি-নিষ্ঠতা পরিবেশে। বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বেই আরবী -ফারসি উর্দূ ভাষার মাধ্যমে জনাব সাখাওয়াতের নৈতিক জীবন শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে অধ্যয়ন করে কলিকাতা ইসলামিয়া সরকারী কলেজ থেকে ১৯৪০ সালে অর্থনীতি শাস্ত্রে 'ডিস্‌টিংশন' নিয়ে ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রচনা ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হত। কলকাতায় "ছাত্রশক্তি" নামে একটি স্বল্পকালস্থায়ী মাসিকীর সম্পাদনাও তিনি করেছেন। বিভিন্ন সরকারী পদ ছাড়া তিনি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এবং টিসিবি-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা "আনকটাডের" কনসালট্যান্টরূপেও কাজ করেন। দেশে-বিদেশে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর কর্মজীবনকালে আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক এবং শিল্প-বাণিজ্য উন্নয়ন সমস্যার ওপর প্রণীত তাঁর অনেক নিবন্ধ ও গবেষণা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের শিল্প বাণিজ্যনীতি নির্ধারণী গবেষণা প্রকল্প টি-আই-পি এবং ইউএস এ-এর পক্ষে বাংলাদেশ প্রাইভেট সেক্টর উন্নয়নের ওপরও তাঁর গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বৃটিশ ও পাকিস্তানী আমল এবং যুক্তরাষ্ট্র এ তিন প্রশাসননীতির তুলনাভিত্তিক রচিত প্রশাসন সংস্কারের ওপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ১৯৫৯ সালে দৈনিক ডন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে তৎকালীন সামরিক প্রশাসনিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং পুনর্গঠিত প্রশাসননীতি প্রণয়নেও প্রতিফলিত হয়েছিল। আরো পরে ১৯৬৭ সালে জাতীয় প্রশাসনিক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট-নীপা-কর্তৃক ট্রেনিং রেফারেন্স মেটেরিয়ালরূপে পুনমুদ্রণ ও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল।

জনাব সাখাওয়াতউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর আন্তর্জাতিক সেবাসংস্থা লায়ন্‌স ইন্টারন্যাশনালের সদস্য, ঢাকা লায়ন্‌স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ লায়ন্‌স-এর জোন চেয়ারম্যান, ডেপুটি জেলা গভর্ণর ছিলেন।